স্মৃতির সৈকতে

মুহম্মদ মতিউর রহমান

লেখক পরিচিতি

জন্ম ঃ ৩ পৌষ, ১৩৪৪(১৯৩৭ ইং) সন, সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত শাহজাদপুর থানার চর নরিনা গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস উক্ত একই উপজেলার চর বেলতৈল গ্রামে। পিতা মরহুম আবু মুহম্মদ গোলাম রব্বানী, মাতা মরহুমা মোছাম্মৎ আছুদা খাতুন।

শিক্ষা জীবন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ সনে এম.এ. (বাংলা) ডিগ্রী লাভ।

কর্মজীবন

অধ্যাপক, উপাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, সিদ্ধেশ্বরী কলেজ, ঢাকা। অধ্যাপক, সা'দৎ কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল। সহকারী সম্পাদক, নিয়মিত বিভাগ এবং সম্পাদক, বাংলা বিশ্বকোষ প্রকল্প, ফ্রাংকলিন বুক প্রোগ্রামস, ঢাকা। সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা। সম্পাদক, প্রকাশনা বিভাগ, দুবাই চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, দুবাই, ইউ.এ.ই.-তে সর্বমোট ৩৪ বছর কর্মরত থাকেন। বর্তমানে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।

সংগঠক

ঢাকাস্থ "ফররুখ একাডেমীর" প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। বাংলা একাডেমীর জীবন সদস্য। বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুল, দুবাই-এর প্রতিষ্ঠাতা। আবুধাবীস্থ ইউ.এ.ই. ইসলামিক কালচারাল সেন্টারের (বাংলা বিভাগ) প্রাক্তন সহ-সভাপতি। ঢাকাস্থ স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ, শাহজাদপুর-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। উপদেষ্টা, হিলফুল ফুজুল, সিরাজগঞ্জ। প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, আহম্মদ নগর ইসলামী পাঠাগার ও সমাজ কল্যাণ পরিষদ, ঢাকা, ও অন্যান্য সাহিত্য-সাংস্কৃতিক-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ও লেখালেখির মধ্যে বর্তমানে ব্যস্ত জীবন অতিবাহিত করছেন।

www.pathagar.com

প্রকাশিত গ্রন্থ

সাহিত্য কথা (১৯৭০),
ভাষা ও সাহিত্য (১৯৭০),
সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি (১৯৭১),
মহৎ যাদের জীবন কথা (১৯৮৯),
ইবাদতের মূলভিত্তি ও তার তাৎপর্য (১৯৯০),
ফররুখ প্রতিভা (১৯৯১),
বাংলা সাহিত্যের ধারা (১৯৯১),
বাংলা ভাষা ও ঐতিহাসিক ভাষা
আন্দোলন (১৯৯২), ইবাদত (১৯৯৩),
মহানবী (স) (১৯৯৪), ইসলামের দৃষ্টিতে
ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি (১৯৯৫),
মহানবীর (স) আদর্শ সমাজ (১৯৯৭),
ছোটদের গল্প (১৯৯৭)
Freedom of Writer (১৯৯৭)
বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য (২০০২)
মানবাধিকার ও ইসলাম (২০০২)
ইসলামে নারীর মর্যাদা (২০০৪)
মাতা-পিতা ও সন্তানের হক (২০০৪)
রবীন্দ্রনাথ (২০০৪)
স্মৃতির সৈকতে (২০০৪)

অনুবাদ

ইরান (১৯৬৯),
ইরাক (১৯৬৯),
আমার সাক্ষ্য (১৯৭১)।

সম্পাদনা

প্রবাসী কবিকণ্ঠ (১৯৯৩)
প্রবাসকণ্ঠ (১৯৯৪)
ভাষা সৈনিক সংবর্ধনা স্মারক (২০০০)
ফররুখ একাডেমী পত্রিকা (২০০০-)

প্রকাশিতব্য গ্রন্থ

সাহিত্য-চিন্তা, সংস্কৃতি
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম
মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন
বাংলাদেশ প্রভৃতি।

পুরস্কার

শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে
উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ
১৯৯৬ সনে "বাংলাদেশ ইসলামিক
ইংলিশ স্কুল", দুবাই কর্তৃক
স্বর্ণপদক প্রাপ্ত

www.pathagar.com

স্মৃতির সৈকতে

মুহম্মদ মতিউর রহমান

প্রকাশনায়
বাংলা সাহিত্য পরিষদ

www.pathagar.com

স্মৃতির সৈকতে
মুহম্মদ মতিউর রহমান

প্রকাশনায়
বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১৭১ বড় মগবাজার
ঢাকা- ১২১৭
টেলিফোন ঃ ৯৩৩২৪১০

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৪১১
রবিউল আউয়াল ১৪২৫
মে ২০০৪
বাসাপপ্র-১১১

গ্রন্থস্বত্ব
বেগম খালেদা রহমান
২৬/এ, পূর্ব আহম্মদ নগর
মিরপুর, ঢাকা- ১২১৬
টেলিফোন ঃ ৯০০৫৩৮২

ISBN—984-485-081—9
BSP-111-2004

প্রচ্ছদ
রফিকুল্লাহ গাযালী

বর্ণ বিন্যাস
চৌকস প্রিন্টার্স লিমিটেড, ঢাকা

মুদ্রণ
নাবীল কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স, ঢাকা

মূল্য
একশত টাকা মাত্র

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার নিজ গ্রাম চর বেলতৈলের অমর কথা-সাহিত্যিক
মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন
মুনশী ওয়াহেদ আলী পণ্ডিত
মোছাম্মৎ রমিছা খাতুন
ও
আবু মুহম্মদ গোলাম রব্বানী

শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যাঁদের অসামান্য
অবদানে সমৃদ্ধ ও অনুপ্রাণিত গ্রামের ও
বাংলাদেশের এক প্রত্যন্ত এলাকার অগণিত মানুষ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

বহু উচ্চারিত বাণী দিয়েই শুরু করছি ঃ পৃথিবী একটি রঙ্গমঞ্চ, আমরা সেখানে সকলে অভিনয় করে চলেছি। নাট্যমঞ্চ ও তার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাথে এর পার্থক্য হলো এই যে, পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ ও এর অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে কোথাও কোন রকম কৃত্রিমতা নেই। পৃথিবীর বিচিত্র সীমাহীন রঙ্গমঞ্চে আমরা যে যার মত অভিনয় করে চলেছি, অথবা বলা যায়, এক অদৃশ্য মহাশক্তিধর নিয়ন্ত্রকের অমোঘ নিয়ন্ত্রণে জীবন পরিচালনা করছি। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, সাফল্য-ব্যর্থতা, আশা-অভীপ্সার ক্ষান্তিহীন তরঙ্গমালার অভিঘাতে আমাদের জীবন-তরী ভেসে চলেছে কখনো লক্ষ্যহীন, কখনো লক্ষ্যের অভ্রভেদী মাস্তুল ধরে। এ চলার শুরু আদিকাল থেকে মহাকালের পথ ধরে অন্তহীন কালের দিক চক্রবালে।

এ মহাকালের ছায়াচ্ছন্ন নিবিড় গাত্রে আমরা এক একটি বিন্দু বিশেষ। এমনি শত সহস্র কোটি বিন্দুর মাঝে কোন একটি বিন্দুকে শনাক্ত করা দুঃসাধ্য বটে। তবু অনেকেই এমন আছেন, যাঁরা বিন্দু হয়েও অনেকটা সিন্ধুর অবয়বে অন্য সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন লোকের সংখ্যা কম নয়। প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক কালেই এ রকম লোকের সন্ধান পাওয়া যায়। আমাদের সমকালেও আমাদের চারপাশে এমন দু'একজন লোকের অস্তিত্ব একেবারে দুর্নিরীক্ষ নয়। এমনি কয়েকজন গুণী ব্যক্তি যাঁরা তাঁদের প্রতিভা ও কর্ম-প্রচেষ্টার দ্বারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, অথবা কোন না কোন ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন, তাঁদের সাথে আমার যৎসামান্য যে সম্পর্কসূত্র তা-ই এ স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছি।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। নানা কার্য-কারণসূত্রে একজন আরেকজনের সাথে অন্বিষ্ট। বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক সময় অনেক কিছুর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ঘটনা ও বিষয়গুলো স্বতন্ত্রভাবে দেখলে অসঙ্গত মনে হবে না, কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে যখন সবগুলো একত্র সন্নিবেশিত

www.pathagar.com

হয়, তখন পুনরাবৃত্তিদোষে তা দুষ্ট বলে পাঠকের নিকট দৃষ্টিকটু এবং কিছুটা বিরক্তিকর মনে হতে পারে। এখানে সে রকম দৃষ্টিকটু ও বিরক্তি উৎপাদনের মত কিছু কিছু বিষয় আছে বলে পূর্বাহ্নেই সুধি পাঠকের নিকট ক্ষমা চেয়ে নিলাম।

এটা সম্পূর্ণ আত্মকথন বা স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ নয়। কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে বলতে গিয়েই নিজের প্রসঙ্গও এসেছে অনেকটা অনিবার্যভাবে, অবলীলাক্রমে। কেবল গ্রন্থভুক্ত প্রথম দুটো নিবন্ধই এর ব্যতিক্রম বলা যায়। আমার জীবনের এক অতি স্মরণীয় অধ্যায়ের বর্ণনা আছে এতে। এ রকম স্মরণীয় অধ্যায় জীবনে আরো অনেক আছে। পর্যায়ক্রমে তার বর্ণনাও হয়তো কখনো উঠে আসবে, কোনভাবে অন্য কোন গ্রন্থে।

গ্রন্থভুক্ত আলোচিত সম্মানীত ব্যক্তিবর্গ সকলেই মরহুম, কেবলমাত্র একজন ব্যতীত, যার সম্পর্কে আমি কোন এক সময় কোন এক প্রসঙ্গে এ নিবন্ধটি লিখেছিলাম, বিষয়বস্তুর দিক থেকে একই রকম হওয়ায় পরিমার্জিত আকারে ওটা সন্নিবেশিত হয়েছে এখানে।

গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্য পরিষদ প্রকাশের দায়িত্ব নেয়ায় ঐ প্রতিষ্ঠান ও তার কর্মকর্তাদের নিকট আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

মুহম্মদ মতিউর রহমান

www.pathagar.com

সূচী

১১ গ্রামের নাম চর বেলতৈল

২১ সংগ্রামের দিনগুলি

৩০ কবি বে-নজীর আহমদ স্মরণে

৩৭ মনীষী দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ স্মরণে

৪৬ আমার স্মৃতিতে ফররুখ

৫৬ আমার দেখা কবি তালিম হোসেন

৬৪ সৈয়দ আলী আহসান স্মরণে

৭২ অম্লান স্মৃতিতে স্নিগ্ধোজ্জ্বল দুটি মুখ

৮০ শহীদ অধ্যাপক আনোয়ার পাশার স্মৃতি

৯২ অন্তরঙ্গ আলোকে শাহেদ আলী

১০১ আমার স্মৃতিতে সানাউল্লাহ্ নূরী

১০৯ একান্ত অনুভবে আবদুল মান্নাব তালিব

১১৬ কবি আফজাল চৌধুরী স্মরণে

১২৫ প্রত্যয়দীপ্ত এক অসাধারণ তরুণের উজ্জ্বল জীবনালেখ্য

১৩৩ বুলবুল ইসলামের স্মৃতি

১৩৮ ফররুখ বিষয়ক সেমিনার ও একদিনের চট্টগ্রাম সফর

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গ্রামের নাম চর বেলতৈল

ছায়া-ঢাকা, পাখি-ডাকা, সবুজে-শ্যামলে ঘেরা একটি গ্রাম–নাম চর বেলতৈল, সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার অন্তঃর্গত। বাংলাদেশের আটষট্টি হাজার গ্রামের মধ্যে এটিও একটি। আলাদা তেমন কোন বৈচিত্র্য নেই। বাংলাদেশের সবগুলো গ্রামই তো সুন্দর, সবুজে-শ্যামলে অপরূপ, মধুময়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও চর বেলতৈল গ্রামটি আমার কাছে অনন্য। এ গ্রামেই কেটেছে আমার শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের এক স্মৃতিময়, মধুর আনন্দঘন-মুখর অধ্যায়। আজ প্রৌঢ়ত্বের উপকূলে দাঁড়িয়ে মনের দুয়ার খুলে যখন পেছন ফিরে তাকাই তখন শৈশব-কৈশোর ও যৌবনের মধুময় স্মৃতিরা এসে ভীড় করে দাঁড়ায় আর সেই সাথে মনে পড়ে আমার ছোটবেলার আনন্দময় খেলাঘর মাতৃস্নেহের মতই ঘন-নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন চর বেলতৈল গ্রাম। শীতের সকালে সোনালী রোদ্দুরের গায়ে ঠৈস্ দিয়ে দুধ-পিঠা খাওয়ার সেই হরিণ-চপল দিনগুলোর কথা এখনো আমার অলস মুহূর্তে মনের অলিন্দে তারুণ্যের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। পুরনো স্মৃতির নিবিড় অরণ্যে হারিয়ে যায় মন। কিছুক্ষণের জন্য আমি বিহ্বল হয়ে পড়ি, আনন্দ-বিষাদের এক মিশ্র অনুভূতিতে আমি চঞ্চল হয়ে উঠি।

চর বেলতৈল থেকে তিন মাইল দূরে চর নরিনা গ্রামে আমার নানার বাড়ি। বাংলা ১৩৪৪ সনের ৩রা পৌষ (১৯৩৭ সনের ১৮ ডিসেম্বর) রোজ সোমবার মধ্য-রাত্রির পর এ বাড়িতেই আমার জন্ম। জন্মের পর নাকি কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের অন্ধকার রাত্রিতে আমার নানার বাড়িতে জ্বীন-পরী, ভূত-প্রেত জাতীয় অপশক্তির সশব্দ আনাগোনা শুরু হয়। আমার নানা মরহুম আব্দুল করিম ছিলেন খুব আল্লাহওয়ালা, পরহেজগার লোক। তিনি অজু করে লাঠি হাতে উঁচু স্বরে দোয়া-কালাম-দরূদ পড়ে বাড়ির চার আঙ্গিনা টহল দিতে থাকেন। আমার মা ছিলেন নানার প্রথম সন্তান। আমার মার পর পর ছয় কন্যা-সন্তানের পর আমার জন্ম। তাই আমি যে কত দীর্ঘ প্রত্যাশিত আদরের পুত্র ছিলাম তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমার জন্মের পর তাই পিতৃ-কুল, মাতৃ-কুল উভয় পরিবারেই আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়।

আমার গ্রাম থেকে নানার বাড়ির দূরত্ব তিন মাইল। ছোটবেলায় এ তিন মাইল পথ অসংখ্য বার অতিক্রম করেছি। বাবা-মায়ের আদর-স্নেহ আর নানা-নানীর আদর-যত্নের মধ্যে কখনো কোন পার্থক্য চোখে পড়েনি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে দু'টি গ্রাম যদি পাশাপাশি হতো তাহলে কত না মজা হতো! তিন মাইল অতিক্রম করতে করতে কত কিছু যে কল্পনা করতাম তার ইয়ত্তা নেই। আমার জীবনের সব পরিকল্পনা, ভবিষ্যতের সব রঙিন চিত্রগুলো মনের ইজেলে সাজাতে সাজাতে এক

www.pathagar.com

সময় আমার গন্তব্য-স্থলে পৌঁছে যেতাম। ছোটবেলায় আমি ছিলাম খুবই কল্পনাপ্রবণ। কল্পনার বিচিত্র ভুবন তৈরি ও স্বপ্নের মায়াবী বর্ণাঢ্য জগত নির্মাণে আমার আনন্দের অবধি ছিল না। এ জন্যে আমি নির্জনতা পছন্দ করতাম। তবে সমবয়সীদের সাথে মাঝে-মধ্যে খেলাধুলায়ও আমার অনীহা ছিল না। অবশ্য অহেতুক আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠাও ছিল আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ।

আমাদের গ্রামটি পূর্বে-পশ্চিমে লম্বা। সমান্তরালভাবে লম্বা-লম্বি তিন সারি বাড়ি। মাঝখানের সারিটি দীর্ঘ। সামনের এবং পেছনের সারি দুটি ছোট। প্রত্যেক সারির মাঝখানে খানিকটা জায়গা। ফলে আলো-হাওয়ার অবারিত খেলা চলে। গ্রামটি দীর্ঘ এবং বড়। গ্রামের সামনে ও পেছনে দীর্ঘ লম্বা বিল। সামনে দক্ষিণ পাশের বিলের পশ্চিমাংশকে বলা হতো ছোট বিল, পূর্বের অংশটা খানিকটা বড়, তাই ওর নাম ছিল বড় বিল। এখন বিলের অস্তিত্ব নাই বললেই চলে। বিল জুড়ে এখন ইরি ধানের চাষ হয়। পেছনের বিলেরও দুটো নাম। পশ্চিমাংশকে বলা হতো কাটাখালি আর পূর্বের অংশকে বলা হতো গাবগাছি। বহুকাল আগে এ দুটি বিল একত্রে একটি শাখা নদী ছিল। পরে নদী শুকিয়ে হয় বিল এখন সেটা হয়েছে শষ্য-শ্যামল মাঠ।

আমার ছোটবেলায় সারা বছর বিলে পানি থাকতো। কত অসংখ্য ধরনের মাছ ছিল বিলে। আমরা বিলে গোছল করতাম, সাঁতার কাটতাম আর ধরতাম কত ধরনের মাছ। রুই, বোয়াল, পাঙ্গাস, চিতল, ফলি, কাতল, শোল, কই, মাগুর, চিংড়ি, পুটি, টেংরা, জিয়াল, সরপুটি, মৃগেল, চাপিলা, বাইম ইত্যাদি কত রকম মাছ। সারা বছর ধরে মাছ পাওয়া যেত। মাছ ধরার ছিল বিভিন্ন ধরনের জাল, বশী, পোলো, জুতি, কোচ, ট্যাটা ইত্যাদি। সারা বছরই বিলে পানি থাকতো, তাই মাছেরও কোন অভাব হতো না। শীত এবং গ্রীষ্মে বিলের পানি কমে গেলে সেখানে মাছ ধরার ধূম পড়ে যেত। বিভিন্ন রকমের জাল ও পোলো নিয়ে সবাই মাছ ধরতো। এক সাথে সবাই যখন মাছ ধরতো তখন সেটাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হতো 'বাউত'। বাউত নামলে ছোট-বড় সকলেই সেখানে মাছ ধরার উৎসবে মেতে উঠত। পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকেও দলে দলে লোকেরা এসে বাউতে যোগ দিত। মাছ মারা হলে সে মাছ শুধু গ্রামের লোকেরাই খেত না, ভিন্ গ্রামে আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতেও পাঠাতো। অনেকে উদ্বৃত্ত মাছ রোদে শুকিয়ে শুট্‌কি বানিয়ে মওজুত করে সারা বছর ধরে খেত।

বর্ষার মৌসুমে কত বিচিত্র রঙের পাল তুলে ছোট-বড় অসংখ্য নৌকা চলাচল করতো। আমরা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সেগুলো দেখতাম আর দল বেঁধে নানা রকম ছড়া কাটতাম, গান গাইতাম নৌকো আর তার আরোহীদের উদ্দেশ্যে। লম্বা এক ধরনের পান্‌সি নৌকা যাবার সময় মাঝে মাঝে ঢোল বাজাতো, এগুলোকে বলা হতো 'গয়নার নৌকো'। দূরের যাত্রী পারাপার করতো ঐ নৌকাগুলো। যাত্রীদের উদ্দেশ্যে ঢোল বাজিয়ে নৌকাগুলো তাদের আগমন-নির্গমন-বার্তা ঘোষণা করতো। কোন যাত্রী তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ইশারা করলে বা ডাকলে গয়নার মাঝিরা পাল নামিয়ে কিনারায় এসে যাত্রীকে তুলে নিত। ছোটরা তখন দল বেঁধে সবাই সেখানে গিয়ে ভিড় জমাতো।

বর্ষার দিনে দোকানীরা আসতো নৌকায় বিচিত্র পণ্যের পশরা নিয়ে। এর মধ্যে বেদেনীদের নৌকা ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়। পাড়ার সকলে এসে তাদের ঘিরে ভীড় করতো। রেশমী কাচের চুড়ি, ছোটদের লজেন্স (বন বন), চিরুনী, আয়না, খেলনা

www.pathagar.com

ইত্যাদি বিক্রি করতো তারা। তাদের অনেকে সিঙ্গা লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের বাতের বা বিষ-ব্যথার চিকিৎসা করতো। অনেকে দূর-দূরান্ত থেকে নৌকো ভরে নিয়ে আসতো নারিকেল, আম, কাঠাল ইত্যাদি। কেউ নিয়ে আসতো চাল, ডাল, তেল, লবণ, মরিচ, সাবান, সোডা, কেরোসিন, দিয়াসলাই, বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি নানা রকম মুদি সামগ্রী। আবার অনেকে কিনতে আসতো ধান, পাট, তিল, সরিষা ইত্যাদি কৃষি-পণ্য। এভাবে সারা বর্ষাকালটাই নানা প্রকার নৌকোর আনাগোনায় গ্রাম-জনপদ মুখরিত হয়ে উঠতো। গ্রামবাসীও ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে পড়তো। ছোটদের আনন্দ-কৌতূহলের সীমা থাকতো না। তারা দল বেঁধে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সর্বত্র হৈচৈ করে বেড়াতো। বর্ষাকালটা ছিল বাইরের জগতের সাথে গ্রামবাসীদের মেলামেশা, আদান-প্রদানের এক মাহেন্দ্রক্ষণ।

বর্ষাকালে আর একটি বড় আকর্ষণ হলো নৌকা বাইচ। আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি, নির্দিষ্ট দিনে অসংখ্য পানসি নৌকা আসতো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে। আমাদের বাড়ির সামনের বিলটা আনন্দ-কোলাহল আর নৌকা চলার ছপাৎ ছপাৎ শব্দে মুখর হয়ে উঠতো। বাদ্য-বাজনা সহকারে সারি গান, জারি গান হতো। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে থেকেই নৌকা আসা শুরু হতো। বাইচ শুরু হবার পূর্বে তারা মহড়া দিতে থাকতো। বাইচে যারা জিততো, তাদের আনন্দ দেখে কে? সামান্য একটি কাপ বা মেডেল প্রাপ্তিকে উপলক্ষ করে অনেক সময় গরু-ছাগল জবাই করে ভোজের ব্যবস্থা হতো। অনেক সময় বাইচকে কেন্দ্র করে ছোট্-খাট দুর্ঘটনা-সংঘর্ষও ঘটে যেত।

বর্ষাকালে নাইওরের ধূম পড়ে যেত। জামাই-মেয়ে আনা-নেয়া, নতুন বিয়ের আয়োজন, দই-দুধ-আম-কাঠালের পরব পাঠানো, কুটুম্বিতা, নতুন আউস ধান-আম-কাঠাল খাওয়ার সুবাদে মোল্লা-মুন্শীর জিয়াফত, আত্মীয়-প্রতিবেশীদের দাওয়াত, মিলাদ, হরেক রকম পিঠা, চিড়া, মোয়া-মুড়কি-খই-মুড়ি খাওয়ার ধূম পড়ে যেত। একমাত্র অর্থকরী ফসল পাট বিক্রি করে (সম্পন্ন কৃষকেরা ধান, তিল ও অন্যান্য কৃষি-পণ্যও বিক্রি করে) পরিবারের সবাইর নতুন শাড়ী, জামা-কাপড়, গামছা-লুঙ্গি কিনে আনতো। পাড়ায় পাড়ায় ছোটদের মার্বেল খেলা, লাটিম খেলা, সাঁতার-প্রতিযোগিতা, বড়দের হাডু ডু , কুস্তি, লাঠিখেলা ইত্যাদিতে মেতে উঠতো সারা গ্রাম। রাতের বেলায় উঠোনে পাটি বিছিয়ে কুটি জ্বালিয়ে পুঁথি পড়ার আসর বসতো। একজন মাঝখানে তেলের কুপির সামনে বসে উঁচু স্বরে গজলের সুরে পুঁথির কেচ্ছা বয়ান করতো আর ছেলেমেয়ে, নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ সকলে চারপাশে গোল হয়ে বসে গভীর মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করতো। পুঁথির কাহিনী শুনে নিবিষ্ট শ্রোতারা কখনো হাসতো, কখনো বীর রসের আতিশয্যে জোশে ফেটে পড়তো আবার কখনো বেদনায় ম্লান হয়ে নীরবে অশ্রুপাত করতো। গভীর রাতে একসময় পুঁথি পাঠ সাঙ্গ করে শ্রোতারা যার যার ঘরে ফিরে যেত, কিন্তু তখনো কাহিনীর রেশ সবাইর কল্পনা ও মনের অলিন্দে আনাগোনা করতো।

ভাদ্র মাসে তাল পাকলে আর এক দফা পিঠা খাওয়ার ধূম পড়ে যেত। কদম্ব ফুলে তখন বন-বীথি হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠতো। অদূরে নদীর দীর্ঘ পাড় ঘেঁষে কাশফুলের শ্বেত-শুভ্র হাসি বাতাসে দোল খেয়ে যেত। গ্রামের সামনের মাঠ জুড়ে জোৎস্নার মত শুভ্রতা নিয়ে ফুটে থাকতো শাপলা ফুল। আশ্বিনে পানি কিছুটা কমে এলে শাপলা-শালুক কুড়াবার ধূম পড়ে যেত। নানা ধরনের মাছ ধরার সময় ছিল এটা। গ্রামের সামনে মাঠ

www.pathagar.com

জুড়ে অল্প পানিতে ছেলেমেয়েদের সে কী লুটোপুটি খেলা ! কেউ পাকা শাপলা কুড়াতো, কেউ শালুক অথবা ঢ্যাপ কুড়াতো আবার কেউ ধরতো মাছ। মাঝে মাঝে শ্যাওলা পানিতে ডুব-সাঁতার খেলতো ছেলেমেয়েরা। মাথার উপর দিয়ে কিচির-মিচির শব্দে উড়ে বেড়াতো পাঁতিহাঁস, রাজহাঁস, বক, গাঙচিল, মাছরাঙা, আরো নানা জাতের জলচর পাখি। আশ্বিনের শিরশিরে ঢেউ তোলা হিমেল বাতাসে নেচে উঠতো আমন ধানের লিকলিকে সবুজ ফসল ভরা হেমন্তের মাঠ। ঝিঝি পোকার কলকূজন, নানা রঙ-বেরঙের পাখি ও ফড়িং-এর আনাগোনায় মাঠ-প্রান্তর মুখরিত হতো।

বর্ষায় গ্রামের অনেকে বাঁশ ও বেত দিয়ে নানা ধরনের সামগ্রী তৈরী করতো। অনেকে পাট দিয়ে দড়ি-রশি পাকাতো, শীতল পাটি, নলসন্ধ্যার পাটি, তালের পাখা, বাঁশের পাখা, বাঁশ দিয়ে মাছ ধরার নানা রকম দোয়ার, খাঁচা, পোলো ইত্যাদি তৈরী করতো। মেয়েরা পাটের শিকে, কাঁথা সেলাই ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকতো। কখনো সারা দিন ঝর ঝর বৃষ্টিতে ঘরের বাইরে যাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়লে তখন ঘরের ভিতরে এসব কাজ করে অনেকে সময় অতিবাহিত করতো, আবার অনেকের নিকট এটা ছিল জীবিকার্জনের মাধ্যম।

গ্রামের সামনে বিলের দক্ষিণে দীর্ঘ বিস্তৃত মাঠ। বিভিন্ন ঋতুতে বিচিত্র শষ্যের সওগাতে ভরে দেয় গ্রামবাসীদের গোলা। গ্রামের কৃষকেরা সারা বছর নানা কাজে ব্যস্ত থাকে এই মাঠে। কখনো লাঙ্গল চালানো, কখনো বীজ বপন, কখনো চারা গাছের যত্ন নেয়া, কখনো শষ্য কেটে ঘরে তোলা, এক শষ্যের পর আরেক শষ্যের চাষ, গরু নিয়ে, কাস্তে-পাচুনী নিয়ে মাঠে যাওয়া-সব মিলিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ততার শেষ নেই। দক্ষিণে মাঠের শেষে এক কালে একটি নদী প্রবাহিত হতো–নাম হুড়াসাগর। এটা যমুনার একটি শাখা নদী–পূর্ব পাশে কয়েক মাইল দূরে যমুনা থেকে উঠে এসে আমাদের গ্রামের সামনে দিয়ে কৈজুরী, চরকৈজরী, উল্টাডাব, রাণীখোলা, মহারাজপুর, চর কাদাই ধূলাউড়ি, ঝিগাতলা প্রভৃতি গ্রামের পাশ দিয়ে শাহজাদপুরের নিকট করতোয়া নদীতে মিশে গেছে। এখন এটাকে দেখে আর নদী বলে চেনার উপায় নেই, অনেকটা নদীর কংকালের মত হয়ে এক কালে তার অস্তিত্বের কথা ঘোষণা দিয়ে চলেছে।

আমাদের গ্রামের উত্তর পাশেও কৃষি-মাঠ। মাঠের পরে মুলকান্দি, বেলতৈল, গোপীনাথপুর গ্রাম এবং পশ্চিম পাশে কাদাই বাদলা গ্রাম। বেলতৈলে একটি বাজার, শনি, মঙ্গলবার সপ্তাহে দু'দিন এখানে হাট বসে। এখানে একটি ডাকঘর এবং একটি হাইস্কুল রয়েছে। বেলতৈলের পাশেই ঘোড়াশাল গ্রাম। এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন প্রখ্যাত 'পারস্য-প্রতিভা'র লেখক সুসাহিত্যিক মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ, যিনি শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী হিসাবে অবসর গ্রহণের পর বাংলা একাডেমীর যাত্রারম্ভে প্রথম স্পেশাল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর স্মরণে, তাঁর গ্রামের সন্নিকটে বেতকান্দি হাটখোলায় এখন একটি কলেজ হয়েছে। নাম "মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ কলেজ"। কাদাই বাদলার পাশে শ্রীফলতলা গ্রামে আর এক স্বনামখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক ও বাংলাদেশের প্রাক্তন উপ-প্রধান মন্ত্রী ডক্টর এম. এ. মতীনের জন্মস্থান। তিনি মন্ত্রী থাকাকালে নিজগ্রামে একটি হাসপাতাল ও মায়ের নামে একটি স্কুল করেন।

গ্রামের উত্তর পাশে বিলের ধারে ঈদগাহ-এর মাঠ। পার্শ্ববর্তী সাত গ্রামের লোক এখানে দুই ঈদে বিশাল জামাত করে নামাজ পড়ে। নামাজ শুরুর অনেক আগে থেকে

www.pathagar.com

বক্তৃতা শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই যখনই বাড়িতে ঈদ করতে গেছি, তখনি এ মাঠে বিশাল জামাতের সামনে আমি বক্তৃতা দিয়েছি। এখন আর বাড়িতে গিয়ে ঈদ করার সুযোগই হয় না। ঈদের দিনে গ্রামের চেহারা বদলে যেত। দলবদ্ধভাবে আমরা গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দেখা-সাক্ষাত করে ঘুরে বেড়াতাম, পোলাও, কোর্মা, খিচুড়ী, ফির্‌নি খেতাম। আনন্দ-ফূর্তি করে ঈদের সারা দিন কাটাতাম। বড়দের সালাম, সমবয়সীদের শুভেচ্ছা আর ছোটদের আদর করে, হৈচৈ করে কাটত ঈদের দিন। বেশ রাত করে সেদিন ঘুমাতে যেতাম।

ছেলেবেলায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে আব্দুল মজিদ মিঞা রচিত "পাবনা জেলার ভূগোল" বইটি আমাদের পাঠ্য ছিল। তাতে পাবনা জেলার প্রসিদ্ধ স্থানগুলোর বর্ণনায় এক জায়গায় উল্লেখ ছিল ঃ "চর বেলতৈল গ্রাম স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিখ্যাত"। এছাড়া, প্রবাদ বাক্যের মত এলাকায় আর একটি কথা প্রচলিত ছিল ঃ "যদি শিক্ষিতা কনে পেতে চান, চর বেলতৈল গ্রামে চলে যান।"। এগুলো পড়ে এবং শুনে বুকটা আনন্দ-গর্বে ফুলে উঠতো। এমন নিভৃত, অনন্য গৌরব ও বৈশিষ্ট্যে দীপ্ত একটি গ্রামে আমার জন্ম একথা ভাবতে বেশ ভালই লাগে। এ গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আজ অনেকেই ভুলতে বসেছে। ইতিহাস বদলাতে থাকে। তবু ইতিহাসের গুরুত্ব রয়েছে। কথায় বলে, 'ইতিহাসের একটি বড় শিক্ষা হলো, ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষাগ্রহণ করে না'। তবু মনে হয়, ইতিহাস থেকে আমরা অনেকেই শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা গ্রহণ করি কখনো জান্তে, কখনো অজান্তে।

আমাদের গ্রামের এ গৌরবময় ঐতিহ্যের জন্য যাঁর অবদান ছিল অনেকটা একক ও কিংবদন্তীতুল্য তিনি হলেন আমার দাদা মরহুম পণ্ডিত ওয়াহেদ আলী মুনশী। আমার দাদার বড় ভাই পণ্ডিত জহিরউদ্দীন মুন্‌শী ১৮৯২ সনে আমাদের বাড়ির আঙিনায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৯৪ সন থেকে আমার দাদা উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন এবং একটানা সুদীর্ঘ ষাট বছর উক্ত পদে বহাল থাকেন। আমার দাদী মরহুমা রমিছা খাতুনও উক্ত বিদ্যালয়ে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে সমগ্র জীবন বিলিয়ে দেন। বিদ্যালয়টিতে এক সময় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদান করা হতো। শিক্ষাদান পদ্ধতিও ছিল কিছুটা স্বতন্ত্র ধরনের। এখানে বাংলার সাথে আরবীও পড়ানো হতো। আমপারা, কুরআন শরীফ যেমন পড়ানো হতো আবার তেমনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ কাব্য'ও এখানে পাঠ্য ছিল। ১৯৬৭ সনে আমার এক বৃদ্ধা দাদীর (দাদার বোন) মুখে 'মেদনাদ বধ কাব্যে'র দীর্ঘ একটি অধ্যায়ের মুখস্ত আবৃত্তি শুনে আমি বিস্ময়-পুলকে অভিভূত হয়েছি। তিনি এই বিদ্যালয়েই আমার দাদার ছাত্রী ছিলেন। তাঁর মুখে বিদ্যালয়ের আরো অনেক কাহিনী শুনেছি।

গ্রামের প্রায় সব মেয়েই বিদ্যালয়ে পড়তে আসতো। শিক্ষাদান ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক। মেয়েরা সকাল বেলা নাস্তা খেয়ে আসতো, দুপুরে খাবার জন্য ছুটী পেত। দুপুরের খাবার ও জোহরের নামাযের পর আবার ক্লাস শুরু হতো। আছরের নামায পড়ে সকলে বিদায় নিত। । বিদ্যালয়ের পশ্চিম পাশে আমাদের বাড়ির সামনে একটি শান বাঁধা বড় ইন্দারা (পাকা কূয়ো) তা থেকে পানি তুলে ছাত্রীরা পান করতো, অজু বানাতো। সেকালে ঐ কূয়োর পানিই পাড়ার সকল বাসিন্দার পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত

www.pathagar.com

হতো। প্রধানত ছাত্রীদের ব্যবহারের জন্যই সরকারীভাবে কূয়োটি স্থাপন করা হয়েছিল।

আমি শুনেছি, আমি যখন খুব ছোট তখন এ বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাই প্রায় সারাক্ষণ আমাকে আদর করে, কোলে-পিঠে করে রাখতো। আমার দুধ খাওয়ার জন্য একটি সুদৃশ্য ছোট পিতলের নলওয়ালা ঘটি ছিল। মেয়েরা টানাটানি করে ঐ ঘটিতে আমাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো। আমার দাদা-দাদীর সুবাদে আমার আদর-যত্ন ছিল সীমাহীন। বলাবাহুল্য, অন্য কোন শিশুর প্রবেশাধিকার বিদ্যালয়ে ছিল না। আমার দাদী স্কুলে যাবার সময় প্রায়ই আমাকে কোলে করে সাথে নিতেন, আবার কখনো ছাত্রীরাই আমার মার কোল থেকে আমাকে তুলে নিয়ে আসতো। শৈশবের সে স্মৃতিগুলো মনের মুকুরে এখনো উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আমার দাদা-দাদী শুধু নিজেদের স্কুল নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন না। যেসব ছাত্রী পাশ করে বিয়ের পর স্বামী গৃহে যেত, তাদের অনেকের মাধ্যমেই তাদের স্বামীর গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে আমার দাদা-দাদী সাহায্য করতেন বা উৎসাহ দিতেন। এভাবে এলাকার বিভিন্ন গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে আমার দাদা-দাদী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান রেখেছেন।

এরূপ একটি বিদ্যালয় দেখেছি আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় ১৫/১৬ মাইল দূরে কামারখন্দ থানার তামাই গ্রামে। আমার ফুফু মরহুমা আফলাতুন খাতুনের (পণ্ডিত জহিরউদ্দীন মুন্‌শীর কন্যা) চেষ্টায় এ স্কুলটি গড়ে ওঠে। আমার ফুফু এবং ফুফা খোন্দকার ছবদের আলী এখানে আজীবন শিক্ষকতা করেন। আমার ফুফু আফলাতুন খাতুন ওরফে জমিলা খাতুন পাকিস্তান আমলে প্রেসিডেন্ট আউয়ুব খাঁর সময়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষয়িত্রী হিসাবে 'প্রাইড অব পারফরম্যান্স' পুরস্কার লাভ করেন।

আমার দাদা মনে করতেন, একটি ছেলেকে শিক্ষিত করার অর্থ সমাজের একজন মানুষকে শিক্ষিত করা আর একজন মেয়েকে শিক্ষাদানের অর্থ একটি পরিবারকে শিক্ষিত করা। এ দর্শনে বিশ্বাসী হয়েই তিনি স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে অধিক উৎসাহী ছিলেন। সে কারণেই আমাদের গ্রামে কোন অশিক্ষিতা মেয়ে ছিল না বললেই চলে। কিন্তু এজন্য তাঁকে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। পর্যাপ্ত অর্থকরী, ধন-সম্পত্তি তিনি করতে পারেননি। গ্রামের অনেকেই তাঁর কাজে বিভিন্নভাবে বাধা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালাতো। অবশ্য তাদের অপচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। এলাকায় আমার দাদার ইজ্জত ছিল ঈর্ষাযোগ্য। তাই সামনা-সামনি তাঁর কাজে বাধা দিতে কেউ এগিয়ে আসতো না। আর তাঁর কাজ বা ব্রত ছিল একটাই–স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, যে কোন ভাবেই হোক, গ্রামের সব মেয়েকে শিক্ষিতা করে তোলা।

একটি নিভৃত গ্রামে এই কাজটি যে কত দুরূহ ছিল তা কেবল ইতিহাস-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরাই উপলব্ধি করতে পারবেন। অপরিমেয় ত্যাগ, ধৈর্য ও নিরলস সাধনায় আমার দাদা ও দাদী দুরূহ বাধার বিন্ধ্যাচল পেরিয়ে সুদীর্ঘ ষাট বছর পর্যন্ত একটি অশিক্ষিত-কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিভৃত গ্রাম তথা এলাকায় শিক্ষার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে রেখেছিলেন তা আমাদের সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে ক্ষুদ্র হলেও এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসে এর গুরুত্ব মোটেই উপেক্ষনীয় নয়। অনেক মহৎ ব্যক্তির কথা আমরা জানি, তাঁদের অবদানের কথাও আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে থাকি, কিন্তু এ শিক্ষাব্রতী দম্পতির কথা, যাঁরা তাঁদের সারা জীবন উৎসর্গ করেছেন স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে,

www.pathagar.com

তাঁদের বিরল অবদানের কথা স্মরণ করার কোন ব্যবস্থাই নেই আমাদের সমাজে। সমাজে তাঁদের যথোপযুক্ত কোন স্বীকৃতিদানেরও ব্যবস্থা নেই।

গ্রামে স্ত্রীশিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করার পর ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার পরিকল্পনাও হাতে নেয়া হয়। আমাদের বাড়ির সামনের আঙ্গিনায় বিশাল চৌচালা টিনের ঘরটি ছিল 'খাশ চরবেলতৈল বালিকা বিদ্যালয়' আর তার পাশেই (পণ্ডিত জহিরউদ্দীন মুন্‌শীর বাড়ির সামনে) ছনের চৌচালা টিনের ঘরে প্রতিষ্ঠিত হয় 'চর বেলতৈল বালক বিদ্যালয়।' সেখানে আমার আব্বা মরহুম আবু মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী প্রধান শিক্ষক এবং আমার এক চাচা মরহুম শফিউদ্দিন (পণ্ডিত জহিরউদ্দীনের ছেলে) সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। আমার আব্বা সেখানে মোট তেত্রিশ বছর শিক্ষকতার পর অবসর গ্রহণ করেন। আমার যখন ছয় বছর বয়স তখন আব্বা আমাকে এ স্কুলেই ভর্তি করে দেন। সেকালে কাগজ ছিল খুব দুষ্প্রাপ্য। কলাপাতার কাগজ, নলখাগড়ার ডাল কেটে কলম আর চাল পুড়িয়ে তা বেটে কালি বানিয়ে আমার লেখালেখির চর্চা শুরু হলো এই বালক বিদ্যালয়ে। তখনো পাকিস্তান হয়নি। ১৯৪৭ সনে যখন পাকিস্তান হয় তখন আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। ততদিনে অবশ্য আমরা শ্লেটে লেখা শুরু করেছি।

বালক এবং বালিকা দু'টো বিদ্যালয়ের অবস্থান পাশাপাশি হলেও বয়সে এবং কৌলিন্যে বালিকা বিদ্যালয়টির মর্যাদা ছিল স্বভাবতই অনেক বেশি। থানা তো বটেই, মহকুমা, জেলা এমন কি বিভাগীয় পর্যায়ের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসতেন। সিরাজগঞ্জের এক সময়কার জাঁদরেল মহকুমা অফিসার জনাব ইসহাক, আই সি এস একবার এ বিদ্যালয় পরিদর্শনে এসেছিলেন। তিনি সিরাজগঞ্জ জেলায় শিক্ষা-বিস্তার ও সমাজসেবামূলক বহুবিধ কাজে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখেন। মনে আছে, আমার ছোটবেলায় একবার বর্ষায় বিরাট বজ্‌রা নৌকায় করে তৎকালীন রাজশাহী বিভাগের ইন্সপেক্ট্রেস অব স্কুল্‌স বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। সে কী হুলস্থুল কাণ্ড। দীর্ঘক্ষণ তিনি স্কুল পরিদর্শন করে পরিদর্শন-খাতায় ইংরেজীতে চমৎকার মন্তব্য লিখেছিলেন। আরো অনেক নামকরা ব্যক্তির মন্তব্যসহ উক্ত পরিদর্শন-খাতাটি আমি আমার কিশোর বয়সে পড়ে দেখেছি। দীর্ঘ দিন যাবৎ উক্ত খাতাটি আমার আব্বা সযত্নে সংরক্ষণ করে আসছিলেন। ১৯৭২ সনে আমার আব্বার মৃত্যুর পর ওটা কীভাবে কোথায় উধাও হয়েছে তা আল্লাহই ভাল জানেন।

আমাদের বাড়ির উত্তর সীমানায় আমাদের একটি আম বাগান ছিল। সেটির সংলগ্ন বাড়িতে বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত ব্যক্তির বাস ছিল। তিনি হলেন বাংলা কথা-সাহিত্যের প্রথম সফল এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় মুসলিম ঔপন্যাসিক পণ্ডিত মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন (১৮৬০-১৯২৩)। প্রখ্যাত 'আনোয়ারা' 'প্রেমের সমাধি,' 'হাসন-গঙ্গা বাহমণি', 'গরীবের মেয়ে', প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা মোহাম্মদ নজিবর রহমান সম্পর্কে আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখেছি, রেডিও-টিভিতেও আলোচনা করেছি। তাই বাংলা সাহিত্যের এই অমর কথাশিল্পী সম্পর্কে এখানে বিশেষ কিছু আলোচনা না করে তাঁর পরিবারের সাথে আমাদের পরিবারের যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল সে কথাটিই এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করতে চাই।

নজিবর রহমান বিয়ে করেছিলেন আমার দাদার চাচাতো বোন মুন্‌শী ইসমাইল হোসেনের কন্যা সাবান বিবিকে। তাঁর এক ভাইও আমার দাদার আরেক চাচাতো ভাই

www.pathagar.com

হাজী মাহতাব উদ্দীনের এক বোনকে বিয়ে করেছিলেন। আর নজিবর রহমানের একমাত্র বোন নূরজাহান বেগমের বিয়ে হয়েছিল আমার দাদার আপন বড় ভাই পূর্বোক্ত মুন্‌শী জহীরউদ্দীন পণ্ডিতের সাথে। চর বেলতৈলের ঐতিহাসিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নজিবর রহমান তাঁর ভগ্নীপতি জহীরউদ্দীনকে যথেষ্ঠ সহযোগিতা করেন। পরবর্তীতে উক্ত বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষয়িত্রী আমার দাদী রমিছা খাতুনকেও তিনি বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে নানারূপ পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করতেন।

আমার বড় দাদী অর্থাৎ নজিবর রহমানের বোন নূরজাহান বেগম ছিলেন অত্যন্ত রসিক প্রকৃতির মহিলা। কথায় কথায় তিনি নানা রকম ছড়া কাটতেন, খনার বচন ও নানা রূপ প্রবাদ-প্রবচন আওড়াতেন। কত রকম গল্প যে তিনি জানতেন, তার কোন ইয়ত্তা ছিল না। রূপকথার কাহিনী, রাক্ষস-খোক্কস, ভূত-প্রেত থেকে শুরু করে আরব্য রজনীর অনেক কাহিনী তিনি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকরভাবে অনায়াসে বলে যেতেন। প্রায় সন্ধ্যাতেই আমরা তাঁর দক্ষিণ-দুয়ারী বৃহৎ ঘরের দাওয়ায় বসে তাঁর গল্প শুনতাম। কখনো অন্ধকার রজনী অথবা চন্দ্রালোকিত রূপোলী আলোর অবসন্ন মুহূর্তে আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর গল্প শুনতে শুনতে আনন্দে-পুলকে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠতাম, কখনো বিস্ময়-কৌতূহলে তাঁকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতাম, আবার কখনো ভয়ে-আতংকে গুঁটিশুটি মেরে দাদীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য খুঁজে পাবার চেষ্টা করতাম।

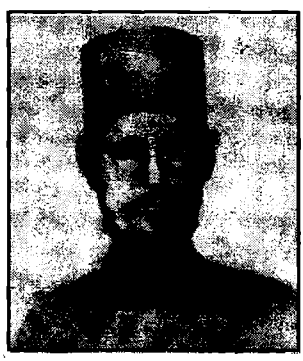

মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন (জন্ম ঃ ১৮৬০ মৃত্যু ঃ ১৯২৩)

পণ্ডিত নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্নের সাথে আমার দাদার খুব হৃদ্যতা ছিল। নিকট প্রতিবেশী এবং আত্মীয়তা ছাড়াও তাঁরা ছিলেন অভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। দু'জনেই সারা জীবন শিক্ষকতা করেছেন এবং শিক্ষার প্রসারে বিশেষতঃ অনুন্নত মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষার প্রসারে তাঁরা দু'জনেই সারা জীবন অতিশয় নিষ্ঠার সাথে কাজ করে গেছেন। নজিবর রহমান বিভিন্ন স্থানে পেশাগত দায়িত্ব পালন করলেও ছুটী উপলক্ষে গ্রামের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপ-জেলার ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামের কবি রজনীকান্ত সেনের (১৮৬৫-১৯১০) স্কুলে তিনি যখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তখন কান্তকবির বিশেষ অনুরোধে তিনি কয়েক বছর সপরিবারে কবির বাড়িতে তাঁর জন্য নির্মিত বাসায় অবস্থান করেছেন। শুনেছি, আমার দাদা সে সময় দশ/বার মাইল পথ অতিক্রম করে ভাঙ্গাবাড়ি গিয়ে মাঝে-মধ্যে সাহিত্য-রত্নের সঙ্গে দেখা করতেন এবং অনেক সময় বিভিন্ন কঠিন প্রশ্ন বিশেষতঃ 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র উপর বিভিন্ন জটীল প্রশ্নের জবাব জেনে আসতেন। আমার দাদা সেকালে গুরু-ট্রেনিং (জি.টি) পাশ ছিলেন। এখনকার মত সেকালে তো কোন অভিধান বা সহায়ক গ্রন্থ ছিল না। সেকালে বহু শ্রম স্বীকার করে দূরবর্তী কোন বিশিষ্ট বিদ্বান ব্যক্তির নিকট গিয়ে এভাবে জ্ঞানার্জনের নিয়ম ছিল। বিদ্যার্জন ছিল তখন একটি দুরূহ কর্ম। বিদ্যাদান

www.pathagar.com

ছিল দুরূহতম। কঠিন পরিশ্রম আর একান্ত নিষ্ঠার দ্বারা তখন শিক্ষকগণ তাঁদের দায়িত্ব পালন করতেন।

নজিবর রহমান ছুটীতে প্রায়ই আসতেন চর বেলতৈল তাঁর বাড়ি তথা শ্বশুর বাড়িতেও। চর বেলতৈল এলে, শুনেছি, তিনি যথারীতি বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করতেন এবং আমার দাদা-দাদীকে শিক্ষাদান ও অন্যান্য ব্যাপারে নানা মূল্যবান পরামর্শ দিতেন। আমার দাদার চেয়ে বয়সে তিনি কিছুটা বড় ছিলেন। চর বেলতৈল এবং তার আশে-পাশে অনেক উল্লেখযোগ্য স্থান, পরিবেশ ও ঘটনা তাঁর বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে স্থান লাভ করেছে। তিনি ছিলেন বাস্তব জীবনশিল্পী, এটা তারই পরিচয়।

জীবনের শেষ দিকে তিনি একবার চর বেলতৈল এসে যথারীতি বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ বা তদুর্ধ এবং বিপত্নীক ছিলেন। বিদ্যালয় পরিদর্শন কালে স্কুলের একজন ছাত্রীকে তাঁর পছন্দ হয়। বলাবাহুল্য, ছাত্রীটি ছিলেন আমার দাদার এক চাচাত বোন, ধনাঢ্য বানু মুন্‌শীর কন্যা (হাজী মাহতাব উদ্দীনের বোন) নূরজাহান বেগম ওরফে আংরেজ। রূপ-লাবণ্যে তিনি ছিলেন অপরূপা। নজিবর রহমান আমার দাদার মাধ্যমে মেয়েটির সাথে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু বয়সের পার্থক্য খুব বেশি হওয়ায় কন্যা পক্ষ স্বভাবতই এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এতে নজিবর রহমানের আত্মাভিমানে দারুণ আঘাত লাগে। অবশেষে তিনি আমাদের গ্রামেরই উত্তর পাড়ার দরিদ্র বদরুদ্দিনের কন্যা রহিমা খাতুনকে বিয়ে করে এ অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। রহিমা খাতুন নূরজাহানের সহপাঠিনী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত গুণবতী ও পতি-পরায়ণা ছিলেন এবং সাহিত্য-রত্নের বার্ধক্যাবস্থায় আন্তরিকভাবে তাঁর সেবা-যত্ন করেন। তাঁর 'গরীবের মেয়ে' উপন্যাসের পটভূমি এটাই। এ উপন্যাসের নায়ক স্বয়ং নজিবর রহমান, নায়িকা তাঁর স্ত্রী রহিমা খাতুন। অন্যান্য পাত্র-পাত্রী, স্থান, পরিবেশ, ঘটনা প্রায় সবকিছুর সাথেই বাস্তব অবস্থার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তবে কিছুটা অতিরঞ্জন বা অতিশয়োক্তি ঘটেছে উপন্যাসের খাতিরে বা লেখকের আবেগানুভূতির কারণে। সেখানে আমার দাদার চরিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। নজিবর রহমানের ধারণা ছিল, আমার দাদা ইচ্ছা করলেই নূরজাহানের সাথে তাঁর বিয়েটা হতে পারতো। বিয়ে না হওয়াতে তিনি আমার দাদার উপর রুষ্ট হন এবং সে প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত হয়েছে 'গরীবের মেয়ে' উপন্যাসে আমার দাদার চরিত্রাংকনে।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণে নজিবর রহমান চর বেলতৈলে আর আসেননি। অবশেষে ১৯১৭ সনে তাঁর নিজ কর্মস্থল হাটিকুমরুলে তিনি বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানে তাঁর বিদ্যালয়ের পাশেই একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। স্ত্রী রহিমা খাতুনকে তার শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন। মৃত্যুর পর তাঁর বাসস্থানের পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। নজিবর রহমানের মৃত্যু হয় বাংলা ১৩৩০ সনের পয়লা কার্তিক (১৯২৩ সনের ১৮ অক্টোবর)। তার প্রায় পনের বছর পর আমার জন্ম। অতএব, তাঁকে স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি, কিন্তু তাঁর মত খ্যাতিমান ব্যক্তির জন্মস্থান চর বেলতৈল গ্রামে আমার জন্ম বলে নিজেকে যথার্থই ধন্য মনে করি। যদিও জানি, মানুষ নিজ কর্মের দ্বারাই পরিচিত এবং পরিণামে নিজ কর্মের ফলই সে নিশ্চিতভাবে ভোগ করে। তবু এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, ইতিহাস-ঐতিহ্য মানুষের মনে সর্বদাই

www.pathagar.com

অনুপ্রেরণা সৃষ্টিতে সহায়ক। আমার পরম প্রিয় গ্রামের বর্ণাঢ্য ঐতিহ্য ও জমকালো অতীতের স্মৃতি আমাকে সর্বদাই দীপ্ত-অনুপ্রাণিত করে।

নানা দিক দিয়ে চর বেলতৈলের এখন আরো অনেক উন্নতি হয়েছে। শিক্ষিতের হার বহু গুণে বেড়েছে। উচ্চ শিক্ষিতের হারও অনেক বেড়েছে। গ্রামের বহু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উচ্চ সরকারী কর্মচারী, অধ্যাপক এখন চর বেলতৈলের মুখ উজ্জ্বল করেছে। বেশ কয়েকজন ইংল্যান্ড, আমেরিকায়ও উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছে। গ্রামে রাস্তা-ঘাট হয়েছে। বেশ কয়েকটি ব্রীজ-কালভার্টসহ সড়ক নির্মিত হয়েছে। গ্রামের মসজিদটি দ্বিতল হয়েছে। পূর্ব পাড়ায় একটি মাদ্রাসা, এতিমখানা এবং নজিবর রহমানের নামে পাঠাগার নির্মিত হয়েছে। পশ্চিম পাড়ায় আরো একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মেয়েদের হাইস্কুল, স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, খেলার মাঠ, ক্লাব ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। গ্রামের শিক্ষিত লোকেরা অনেকেই দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এভাবে একটি অজ পাড়া-গাঁ চর বেলতৈল এখন নানা কার্য-কারণে বিশ্বজনপদের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

আমরা অনেকেই এখন আর গ্রামে থাকি না। তবু মাতৃস্নেহের মতই মায়াবী মুগ্ধতা আর অপত্য স্নেহের আকিঞ্চন নিয়ে আমার গ্রামের স্মৃতি জেগে রয়েছে আমার মনের মুকুরে। ইতোমধ্যে দীর্ঘ বিশ বছর আমি বিদেশে প্রবাস-জীবন কাটানোর সময় প্রতি বছর বাৎসরিক ছুটী উপলক্ষে দেশে এলে অন্ততঃ একদিনের জন্য হলেও গ্রামে যেতাম এক অদৃশ্য, অনিবার্য আকর্ষণে। আমার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের এক মুখর অধ্যায় অতিবাহিত হয়েছে এই নিভৃত, শ্যামলীম পল্লীর ছায়া ঢাকা, পাখি ডাকা স্বপ্নময় দুরন্ত ভুবনে। কালের আবর্তনে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে, পরিবর্তন হয়েছে আমার গ্রামেরও, আমার নিজ বাড়িটি, যেখানে এক সময় অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর কল-কোলাহলে মুখর থাকতো, আমার দাদা-দাদী, আব্বা-আম্মা, আমার আট বোন, তিন ভাইয়ের আনন্দ-চঞ্চল পদচারণায় যে বাড়িটি ছিল সদা কল্লোলিত, সে বাড়িটিও আজ শূন্য ভিটায় পর্যবসিত। তবু অতীতের সে স্মৃতিময়, মধুময়, চিত্র-বিচিত্র শ্যামল-সুন্দর গ্রামের অকৃত্রিম ছবিটিই চিরকাল আমার মনের অতন্দ্র, স্বপ্নাচ্ছন্ন ভুবনকে সর্বদা আন্দোলিত করে।

www.pathagar.com

সংগ্রামের দিনগুলি

চৌত্রিশ বছর সময় একজন মানুষের জীবনে কম নয়। সবকথা অবিকল এখন আর মনে থাকারও কথা নয়। তবু কালচক্রে যখন আবার সেই স্মরণীয় দিনটি ফিরে এল তখন স্মৃতিপটে তার যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা লিখে রাখবার তাগিদ অনুভব করলাম। এর মধ্যে জগৎ-সংসারে অনেক কিছু সংঘটিত হয়েছে, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বিপুল জলরাশি, ফরাক্কা বাঁধের কারণে খরস্রোতা পদ্মাও হয়েছে মন্থর-স্থবির। পাকিস্তান দু'ভাগ হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। ইতোমধ্যে আমি নিজেও দীর্ঘ বিশ বছর জীবিকার্জনের তাগিদে আরব সাগরের তীরবর্তী তেলসমৃদ্ধ উপসাগরীয় নগরী দুবাইতে প্রবাস-জীবন যাপন করেছি। পবিত্র হজ্ব উপলক্ষে দু'বার সৌদী আরব ভ্রমণসহ পৃথিবীর প্রায় উনিশটি দেশ পরিভ্রমণের সুযোগ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেছি। প্রৌঢ়ত্বের এ ম্লান গোধূলি লগ্নে স্মৃতির পাতায় আজ অসংখ্য মুখ, ঘটনা ও কাহিনী জোনাকী পোকার ক্ষীণ আলোকরশ্মি হয়ে ক্রমাগত আসা-যাওয়া করে। আমি অবাক বিস্ময়ে তা অবলোকন করি।

বলছিলাম' দৈনিক সংগ্রামে'র সাথে আমার সংলগ্নতার দিনগুলি আজ কেবলই স্মৃতি। সে স্মৃতি একান্ত অনুজ্জ্বল নয়। দৈনিক সংগ্রাম প্রকাশনার সাথে আমরা জড়িত ছিলাম যারা, তারা রীতিমত সংগ্রাম করেছি বলা যায়। এ সংগ্রাম শুধু একটি নতুন পত্রিকা প্রকাশের জন্য ছিল না, একটি সত্যনিষ্ঠ সংবাদবাহন হিসাবে, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠতার মশালবাহী হিসাবে সর্বোপরি এক শাশ্বত আদর্শের পতাকাবাহী হিসাবে দৈনিক সংগ্রামের আবির্ভাব ছিল আমাদের সংবাদপত্র জগতে এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে এটা ছিল এক অবিস্মরণীয় মাইল ফলক।

১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি ছিল ইসলাম। উপমহাদেশের মুসলমানদের আত্মপ্রতিষ্ঠার অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফল হল পাকিস্তান। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতা ইসলামের কথা মুখে উচ্চারণ করলেও তাদের কাজ ও আচরণ ছিল ইসলামের বিপরীত। ফলে অন্যায়, জুলুম, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের কারণে বিভিন্ন অঞ্চল ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বিভেদ ও অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। স্বার্থান্বেষী মহল জনগণের ধর্মীয় আবেগ কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত, দলীয় ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধারের প্রয়াসে লিপ্ত হয়। এতে ইসলাম, ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও ব্যক্তিত্বের প্রতি অনেকের বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। বামপন্থী, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও ভারতপন্থীরা এ সুযোগ

www.pathagar.com

কাজে লাগায়। প্রকৃত ইসলামপন্থীগণ যাঁরা সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের সকল সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে কাজ করছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে নানারূপ ভিত্তিহীন, মনগড়া বিরূপ প্রচার-প্রপাগাণ্ডা, মিথ্যা রটনা ও বিকৃত খবর প্রচার করে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে লাগলো। এগুলোর জবাব দেয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তখনকার পত্রিকাগুলো ছিল একচোখা হরিণের মত, সেগুলো প্রকৃত ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী আন্দোলনের কোন খবর এমন কি, তাঁদের বিরুদ্ধে অন্যদের দেয়া কোন মিথ্যা বক্তৃতা-বিবৃতি বা খবরের প্রতিবাদও ঐসব পত্রিকা ছাপতো না। সে ছিল এক দুঃসহ, শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। এমতাবস্থায় একটি নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠ শক্তিশালী প্রচার-মাধ্যমের প্রয়োজন অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। এ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যেই দৈনিক সংগ্রাম প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কিন্তু একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য যেসব উপকরণ দরকার তার কোনটিই উদ্যোক্তাদের নিকট বিদ্যমান ছিল না। একটি দক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিষদ, পত্রিকা ছাপানোর মত প্রেস, উপযুক্ত পুঁজি এবং অভিজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান একদল সাংবাদিক-এর কোনটাই ছিল না। তাই একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে সেটা পরিচালনার জন্য তখনকার তরুণ ব্যারিস্টার মোহাম্মদ কোরবান আলীকে চেয়ারম্যান করে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করে তার মাধ্যমে ফান্ড সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। তবে সবকিছুর মূল চালিকা শক্তি ছিলেন তৎকালীন জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীর আমীর ইঞ্জিনীয়ার খুররমজাহ্ মুরাদ। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ কঠিন হয়ে পড়ে। অতঃপর ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ও ইসলামী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে প্রতিটি দশ টাকা মূল্যের শেয়ার বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। যদিও এটাকে 'শেয়ার' বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল 'করজে হাসনা'র মত। ইসলামী আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে একটি দৈনিক প্রকাশিত হবে সেজন্য ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ও ইসলাম-প্রিয় ব্যক্তিদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। আমার মত অনেকেই সাধ্যমত শেয়ার ক্রয় করে। ফলে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হতে বেশী সময় লাগে না। অবশ্য এ ধরনের লগ্নী ছিল বেশ ঝুঁকিপূর্ণ এবং লাভের আশাও ছিল অনিশ্চিত। তাই অন্যদের নিকট শেয়ার বিক্রি না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা জেনে-বুঝে, ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তার পরওয়া না করে ইসলামকে একটি বিজয়ী আদর্শ হিসাবে দেখার অদম্য প্রত্যাশা নিয়ে এ ধরনের লগ্নীতে উদ্বুদ্ধ হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এ ধরনের শেয়ার বিক্রির টাকায় দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের নজীর এ দেশে এটাই প্রথম।

এরপর পত্রিকা বের করার জন্যে একটি উপযুক্ত বাড়ী, প্রয়োজনীয় প্রিন্টিং মেশিনারিজ ও একদল যোগ্য সাংবাদিকের প্রয়োজন দেখা দেয়। পুরনো ঢাকার অভিজাত এলাকা র‍্যংকিন স্ট্রীটে একটি উপযুক্ত বাড়ী ভাড়া নেয়া হয়। ধীরে ধীরে সেখানে দৈনিক পত্রিকার জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনপত্র স্থাপন করা হয়। এরপর স্টাফের সমস্যাই সবচে' বড় হয়ে দেখা দেয়। আমাদের মধ্যে যোগ্য ও অভিজ্ঞ সাংবাদিকের নিতান্ত অভাব ছিল। পত্রিকার সম্পাদক করার জন্য প্রথমে ইসলামী রেনেসাঁর কালজয়ী কবি ফররুখ আহমদকে প্রস্তাব দেয়া হয়। তিনি সরাসরি সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন এ বলে যে, দৈনিক পত্রিকা সম্পাদনা করার অভিজ্ঞতা, আগ্রহ ও মেজাজ তাঁর নেই। এরপর তৎকালীন কায়দে আজম কলেজের (বর্তমানে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ) বাংলার

www.pathagar.com

অধ্যাপক খ্যাতনামা লেখক ও অনুবাদক আখতার ফারুককে প্রস্তাব দিলে তিনি সানন্দে সম্পাদক হতে সম্মত হন। সহকারী সম্পাদক হিসাবে তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে সদ্য এম.এ. পাশ জনাব আবুল আসাদ, সালেহ উদ্দীন আহমদ (জহুরী) ও মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীকে নিয়োগ দেয়া হয়। সম্পাদকসহ এঁদের কারোই দৈনিক পত্রিকায় কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। আমি তখন ঢাকাস্থ সিদ্ধেশ্বরী ডিগ্রী কলেজে (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ) অধ্যাপনা করতাম। আমাকে সাহিত্য সম্পাদক করা হলো। মাওলানা আবদুল মান্নান তালিবকে ছোটদের পাতা 'শাহিন শিবির' দেখার দায়িত্ব দেয়া হয়। এছাড়া কয়েকজন প্রতিশ্রুতিশীল তরুণকে বিভিন্ন ফিচার ও বিভাগে শিক্ষানবীস হিসাবে নিয়োগ করা হয়।

সবচে' বড় সমস্যা দেখা দেয় বার্তা বিভাগ নিয়ে। অভিজ্ঞ ও সুযোগ্য দু'জন সাংবাদিক মীর নূরুল ইসলাম (বর্তমানে মরহুম) ও জনাব সুলতান আহমদকে (বর্তমানে দৈনিক ইনকিলাবের বার্তা সম্পাদক) যথাক্রমে বার্তা সম্পাদক ও সহকারী বার্তা সম্পাদক হিসাবে নিয়োগ করা হয়। তাঁদের তত্ত্বাবধানে একদল তরুণ, উৎসাহী ও প্রতিশ্রুতিশীল যুবককে বাছাই করে তাদেরকে ছ'মাস ধরে প্রশিক্ষণ দিয়ে উপযুক্ত সাংবাদিক বানাবার চেষ্টা করা হয়। এসব তরুণদের মধ্যে কয়েকজনের নাম মনে পড়ছে ঃ আব্দুস শহীদ (বর্তমানে 'মহাজাতক' হিসাবে বিশেষভাবে খ্যাত), মোহাম্মদ মুসা, ডাক্তার শামসুদ্দৌলা (বর্তমানে বিদেশে কর্মরত দন্ত-বিশেষজ্ঞ), সানাউল্লাহ আখুঞ্জী, আব্দুল কাদের মিয়া, এনামুল হক, মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান প্রমুখ। পত্রিকা বের করার পূর্বে কয়েকটি ট্রায়্যাল ইস্যূ বের করা হয়। এভাবে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, আত্মনিবেদিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একদল লোক নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে দৈনিক সংগ্রাম বের করার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর ঠিক হয় ১৯৭০ সনের ১৭ জানুয়ারী পত্রিকার উদ্বোধনী সংখ্যা প্রকাশিত হবে।

সাহিত্য সম্পাদক হিসাবে নিয়মিত সাপ্তাহিক সাহিত্য বিভাগ ছাড়া বিশেষ সংখ্যার দায়িত্ব পূর্বাপর আমার উপর ন্যাস্ত ছিল। উদ্বোধনী সংখ্যার সাথে অতিরিক্ত ষোল পৃষ্ঠার একটি বিশেষ সংখ্যা বের করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তখন কম্পিউটারের প্রচলন ছিল না। শীশার টাইপে হাতে কম্পোজ করে একটি কাঠের উপর তা রেখে তার উপর কাগজ বিছিয়ে আরেকটি কাঠ দিয়ে তা জোরে ঠেসে প্রুফ কপি বের করা হতো। দৈনিক সংগ্রামের নিজস্ব প্রেসে নিয়মিত সংখ্যা ছাড়া ষোল পৃষ্ঠার বিশেষ সংখ্যা কম্পোজ করার মত ব্যবস্থা তখনও সম্পন্ন হয়নি। তাই ওটি কম্পোজ ও ছাপার জন্য ওয়াইজঘাটের একটি প্রেস ঠিক করা হয়।

ষোল পৃষ্ঠার রঙিন, আকর্ষণীয় এবং মানসম্মত একটি বিশেষ সংখ্যার পরিকল্পনা, তার জন্য নামকরা সব লেখকদের নিকট থেকে লেখা সংগ্রহ করা, সম্পাদনা করা, প্রতিটি লেখার অন্তত: তিনটি করে প্রুফ দেখা এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ এককভাবে আমাকে সম্পন্ন করতে হয়। এজন্য আমাকে যে অমানুষিক পরিশ্রম ও পেরেশানী ভোগ করতে হয়েছে তা পত্রিকার অন্যান্য সহকর্মীরাও জানতেন না। কারণ লেখা সংগ্রহের জন্য আমাকে প্রায়ই বাইরে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে হতো, পত্রিকার অফিস থেকে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত প্রেসে বসে আমাকে কাজ করতে হতো। তবে মাঝে-মধ্যে পত্রিকা অফিসে যেতাম। অফিসের ঠিকানায় কোন লেখা এলে তা সংগ্রহ করা, বিশেষ সংখ্যার বিজ্ঞাপনের ম্যাটার সংগ্রহ ও শিল্পীর সহযোগিতা লাভের

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে সেখানে যেতে হতো। সেখানে গেলে সবাইর সাথে দেখা হতো। তখন সবাইর মধ্যে এমন চাঞ্চল্য, ব্যস্ততা ও উত্তেজনা লক্ষ্য করতাম যে মনে হতো সকলেই যেন এক আসন্ন যুদ্ধ-জয়ের নেশায় আত্মনিমগ্ন। কারো সঙ্গে বেশী কথা বলার ফুরসুৎ ছিল না, তবে সকলের মধ্যেই ছিল অসম্ভব টীম-স্পিরিট ও সহযোগিতার মনোভাব।

এদিকে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। প্রেসের কর্মচারী, কম্পোজিটর, প্রুফম্যান, মেকআপম্যান এরাই ছিল আমার সঙ্গী। কয়েক দিনে তাদের সাথে আমার বেশ খানিকটা অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। আমি কলেজে অধ্যাপনা করতাম তাই আমাকে সবাই সমীহ করতো, 'স্যার' বলে ডাকতো। শেষের দিকে কাজের চাপে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, আমার ধানমন্ডি সার্কুলার রোডের বাসায় যাওয়ার আর ফুরসতই হয়ে উঠতো না। হোটেলের চা-নাস্তা খেয়ে প্রেসেই শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিয়েছি। এভাবে দু'রাত আমাকে প্রেসে কাটাতে হয়েছে। যতদূর মনে পড়ে, লেখা সংগ্রহের জন্য এখানে সেখানে যাতায়াত, পত্রিকা অফিস ও প্রেসে যাতায়াত, চা-নাস্তা খাওয়া ও খাওয়ানো এর কোন কিছুর জন্যই আমি কখনো কোন বিল করিনি, সম্পূর্ণ মনের টানে, নিজের কাজ মনে করে পকেটের পয়সা খরচ করে এসব করেছি। হয়তো আমার মত অনেকেই এরূপ করেছেন। আবার কেউ কেউ এর ব্যতিক্রম যে ছিলেন না তাই বা বলি কী করে!

এভাবে চরম নিষ্ঠার সাথে রাত-দিন পরিশ্রম করে যখন বিশেষ সংখ্যাটি ছাপার উপযুক্ত করি তখন অকস্মাৎ দেখা দেয় যান্ত্রিক গোলযোগ। সারা রাত অপেক্ষা করেও ছাপা সম্ভব হলো না। মেশিনম্যানরাও যথাসাধ্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। ষোলই জানুয়ারীর দিন ও দিবাগত রাত্রিটি যে কী উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে অতিবাহিত হলো তা বলে বুঝানো যাবে না।

ফলে বিশেষ সংখ্যাটি ১৭ জানুয়ারী উদ্বোধনী সংখ্যার সাথে প্রকাশিত না হওয়ায় দুঃসহ বেদনা ও হতাশায় আমার মন ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। পরের দিন ১৮ জানুয়ারীর সাধারণ সংখ্যার সাথে বিশেষ সংখ্যাটি বের হয়। ঐদিনটি একটি বিশেষ কারণে ছিল এক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দিন। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর সেদিন জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত পল্টন ময়দানের জনসভায় ভাষণ দেয়ার কথা। তাই ঐদিনটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ঐদিন দুপুরের পরই গেলাম পল্টন ময়দানে। বিকেল তিনটার দিকে জনসভা যথারীতি শুরু হয়। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই বামপন্থী-ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ইসলাম-বিরোধী চক্রের সুপরিকল্পিত পাশবিক হামলায় মুহূর্তের মধ্যে বিশাল জনসভা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। আক্রমণকারীদের বেপরোয়া হামলায় বহু লোক আহত হয়। সেদিন আমিও কিছুটা আহত হয়েছিলাম। নিক্ষিপ্ত পাথরের টুকরায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে আমার কপাল থেকে রক্ত ঝরেছিল। তবু সেদিন জনসভায় উপস্থিত বহু লোকের হাতে দৈনিক সংগ্রামের সাধারণ সংখ্যার সাথে ১৬ পৃষ্ঠার বিশেষ সংখ্যাটি দেখে আমার হৃদয়-মন এক অনাবিল আনন্দে পূর্ণ হয়।

১৮ জানুয়ারী সাধারণ সংখ্যার সাথে ১৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত বিশেষ সংখ্যাটি একদিন দেরীতে বের হলেও সমৃদ্ধ সে সংখ্যাটি সবাইকে আনন্দ দিয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই আমাকে বাহবা দেয়। কেননা এর পুরো দায়িত্বটা ছিল এককভাবে শুধু আমার। ফলে আমার আগের দিনের বেদনাতুর মুখে প্রশান্তির স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়ে। কবি ফররুখ আহমদের 'সংগ্রাম' শীর্ষক কবিতাটি বিশেষ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষদেশে স্থান পেয়েছিল। আমি তখন প্রায় দিনই তাঁর বাসায় যাতায়াত করতাম। সেদিন সকাল বেলায়ই তাঁর কপিটি পিয়ন মারফত তাঁর বাসায় পৌঁছে দেয়া হয়। তবু একটি কপি সঙ্গে

www.pathagar.com

নিয়ে পরের দিন সন্ধ্যার দিকে তাঁর ইস্কাটন গার্ডেনের সরকারী ফ্লাটে গিয়ে যখন তাঁর হাতে দিলাম তখন তিনি এমনভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন যেন এই মাত্র আমি এক রাজ্য-জয়ের কৃতিত্ব নিয়ে তাঁর সঙ্গে মোলাকাত করতে এলাম। এমনিতেই তাঁর বাসা থেকে কখনো চা-নাস্তা না খেয়ে আসতে পারিনি। কিন্তু সেদিনের সমাদর ছিল অনেকটা ভিন্ন। আনন্দ, উত্তেজনা ও উচ্ছ্বাসে ভরপুর। আগামীর জন্য তিনি কত যে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে বিদায় করলেন তা বলে শেষ করার মত নয়। এমন শিশুসুলভ সারল্য আর ইসলামের প্রতি সুগভীর অনুরাগ আমি আর কারো মধ্যে দেখিনি।

কবি ফররুখ আহমদ, কবি তালিম হোসেন, কবি সুফিয়া কামাল, কবি আহসান হাবীব, কবি বেনজীর আহমদ, কবি আব্দুস সাত্তার, কবি আব্দুর রশীদ, কাজী গোলাম আহমদ, কবি মঈনুদ্দীন, কবি আজিজুর রহমান, প্রিন্সিপাল ইবরাহিম খাঁ, আবুল মনসুর আহমদ, ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, ডক্টর হাসান জামান, অধ্যাপক শাহেদ আলী, জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, এ জেড. এম. শামসুল আলম প্রমুখ প্রবীণ লেখকদের লেখা সংগ্রহ করে সংগ্রামের সাহিত্য পাতাকে উন্নত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। উপরে উল্লিখিত খ্যাতনামা ব্যক্তিদের ছাড়াও আরো অনেক প্রবীণ লেখকের লেখা সংগ্রহে আমি সর্বদা নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছি, তাঁদের সকলের নাম আমার এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। কিন্তু শুধু প্রবীণদের নয়, নতুন লেখক তৈরীর দিকেও আমার খেয়াল ও প্রচেষ্টা ছিল আন্তরিক। ডাকযোগে যাদের লেখা পেতাম তাদের অধিকাংশই ছিল তরুণ ও নতুন। কত প্রত্যাশা, আশা ও স্বপ্ন নিয়ে যে তারা লেখা পাঠাতো, তা আমার চেয়ে আর কে বেশী উপলব্ধি করেছে ! লেখার সাথে প্রায়ই থাকতো আবদার-অনুরোধ, কাকুতি-মিনতি ভরা একটি চিঠি। তাই প্রকৃতপক্ষে আমি তাদের লেখা ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দিতাম না। অনেক কষ্ট করে, পর্যাপ্ত সংশোধনীর পর যখন তা ছাপা হতো, তখন অনেক ক্ষেত্রে লেখক নিজেই হয়তো তার নামে মুদ্রিত লেখাটি পড়ে বিস্ময়ে হতবাক হতো। এজন্য আমার বিরুদ্ধে কেউ কখনো অভিযোগ তোলেনি। আমি উপলব্ধি করতাম তারা এতে হয়তো খুশীই হতো। কেননা লেখা ছাপা হওয়াটা তখন তাদের নিকট ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আমার বিশ্বাস এতে উৎসাহী হয়ে পরবর্তীতে তারা অনেকেই ভাল লেখক হতে পেরেছে। আঁকিয়েদেরকে যেমন প্রথম প্রথম হাতে কলম ধরিয়ে আঁক শিখাতে হয়, লিখিয়েদেরকেও তেমনি শুরুতে কিছু অনুপ্রেরণা দিতে হয়। আমি তাই করেছি। এবং এতে নিজের বাগানে সযত্নে নতুন কুঁড়ি ফোটাবার অনাবিল আনন্দ পেয়েছি। নতুন কুঁড়িরাও হয়ত প্রথম ফোটার আনন্দে অলক্ষ্যে সাফল্যের হাসি হেসেছে।

অবশ্য এ রকম কাটাছাটার কাজটা নবীনরা সহজভাবে গ্রহণ করলেও প্রবীণরা সব সময় ভাল চোখে দেখেন না। এ রকম একটা ঘটনা বা দুর্ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়।

একবার এক ডাক সাইটে আমলা ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক একটি লেখা সম্পাদকের নিকট জমা দিলেন ছাপার জন্য। সম্পাদক আখতার ফারূক সেটি আমাকে দিলেন ছাপাতে। লেখকের ইসলামী বিশ্বাস, আচরণ, সততা ও চাল-চলনের জন্যে তাঁর প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল এবং এখনো আছে। কিন্তু তাঁর লেখাটি পড়ে আমার মনে হলো, ইসলামী অর্থনীতি বলতে তিনি সম্ভবত: সমাজতন্ত্রের কথাই বলতে চান। তাঁর ধারণা, নাস্তিক্যবাদী সমাজতন্ত্রের মাথার উপর কোন প্রকারে আল্লাহর অস্তিত্ব চাপিয়ে দিতে পারলেই তা পরিপূর্ণ ইসলামী সমাজতন্ত্র বা ইসলামী অথনীতিতে পরিণত হতে পারে। লেখাটি পড়ে আমি সম্পাদকের হাতে ফেরত দিলাম এই বলে যে, এটা আমার

www.pathagar.com

পক্ষে ছাপা সম্ভব নয়, কারণও অবশ্যই উল্লেখ করলাম। সম্পাদক সাহেব বললেন, 'এমন বিশিষ্ট লোকের লেখা, কোন মতে ছেপে দিন'। আমি বললাম, 'ছাপাতে পারি পর্যাপ্ত সংশোধনী সাপেক্ষে'। তিনি সম্মতি দিলেন। তারপর লেখাটি যখন ছাপা হলো, তখন হোমরা-চোমরা, বিশিষ্ট এবং শ্রদ্ধেয়ও বটে, ব্যক্তিটি অগ্নি-শর্মা হয়ে সম্পাদকের নিকট ছুটে এসে বললেন, 'আমার নামে আপনি এ কার লেখা ছেপেছেন ?' সোজা-সরল, হাস্য-তরল সম্পাদক মহোদয় তো হতভম্ব ! কোন মতে বুঝিয়ে সুজিয়ে তাঁকে বিদায় করলেন। আমি তখন অফিসে ছিলাম না। পরে যখন অফিসে গেলাম, সম্পাদক সাহেব তখন তাঁর বিব্রতকর অবস্থার কথা আমাকে জানালেন। এরপর তাঁর আর কোন লেখা ছাপার জন্য আমার হাতে আসেনি।

লেখা ছাপা নিয়ে অন্য ধরনের আর একটি বিড়ম্বনার সম্মুখীন হই একবার। কার মাধ্যমে কীভাবে একবার কবি আহসান হাবীবের স্বহস্তে লিখিত একটি কবিতা আমার হাতে আসে। আমি নির্দ্বিধায় তা যথাযোগ্যভাবে ছেপে দেই। লেখাটি দেখে নাকি কবি সাহেব খুব রুষ্ট হয়েছিলেন। কারণ দৈনিক সংগ্রামের মত পত্রিকায় তাঁর লেখা ছাপায় আপত্তি ছিল। এ রকম আপত্তি অনেকেরই ছিল। কবি সাহেবের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাই তাঁর অসন্তুষ্ট হবার খবরটি আমার শ্রুতিগোচর হবার পর আমি একদিন তাঁর বাসায় গিয়ে দেখা করি। কথায় কথায় তাঁর কবিতাটি কীভাবে আমার হস্তগত হয় এবং আমি তা যথাযোগ্য স্থানে ছেপে দেই, সে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলাম। দেখলাম তিনি খুব ক্ষুব্ধ। স্বভাব-বিনয়ী, মৃদুভাষী কবি তাঁর ক্ষোভ চাপা রেখে শুধু বললেন, 'এরূপ কাজ আর কখনো করবেন না।' আমি তাঁর সাথে কোন বিতর্কে অবতীর্ণ না হয়ে চা-নাস্তা খেয়ে ক্ষুণ্ন মনে বাসায় ফিরে এলাম।

অন্য একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। কবি সুফিয়া কামালের ব্যাপারে। তাঁর স্বামী কামাল উদ্দিন ছিলেন অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তি। ঢাকাস্থ ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রাম্‌সে বাংলা বিশ্বকোষ প্রকল্পে আমরা এক সঙ্গে কয়েক বছর কাজ করেছি। তিনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক প্রবীণ ছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত উদার ও মানবিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়ায় তাঁর সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়। তাঁর সাথে অনেক বিষয় নিয়েই আলোচনা হতো। তবে ইসলামী বিষয় নিয়েই তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে অধিক আগ্রহ দেখাতেন। বলে রাখা ভাল যে, তিনি ছিলেন মুক্ত চিন্তার লোক। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে খুব আনন্দ পেতাম। তিনি সবকিছু যুক্তি ও জ্ঞানের আলোকে বিচার করার পক্ষপাতি ছিলেন। একদিন 'ইসলামী সংস্কৃতি' প্রসঙ্গে তাঁর সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে গম্ভীর গলায় তিনি বললেন ঃ 'আজ আপনার সাথে আলোচনা করে এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম যে, ইসলামী সংস্কৃতি বলে একটা জিনিস আছে'- অর্থাৎ ইসলামের ভিত্তিতে একটি সুস্পষ্ট, স্বতন্ত্র সংস্কৃতি আবহমানকাল থেকে চলে আসছে, তা তিনি অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। বলাবাহুল্য, তাঁর এই অকপটতা ও যুক্তিবাদিতার জন্য আমি তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতাম এবং তিনিও আমাকে বিশেষ স্নেহমিশ্রিত সমীহের দৃষ্টিতে দেখতেন।

অতএব, তাঁর মাধ্যমেই আমি কবি সুফিয়া কামালের নিকট একটি কবিতা চাইলাম। তিনি অসংকোচে তাঁর স্ত্রীর সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন, আমার সম্পর্কে কিছু প্রশংসার বাক্য উচ্চারণের পর বললেন, 'উনি তোমার নিকট একটি কবিতা প্রত্যাশা করেন।' স্বভাব-বিনয়ী কবি সুফিয়া কামাল শুধু মৃদু হাসলেন এবং বললেন ঃ

www.pathagar.com

'ঠিক আছে পাবেন।' অতঃপর বিনা তাগাদায় অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই জনাব কামালউদ্দীনের মাধ্যমে একটি চমৎকার কবিতা পেয়েছিলাম এবং তা ছেপেও ছিলাম যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে। কবি ফররুখ আহমদ ছাড়াও কবি তালিম হোসেন, কবি বেনজির আহমদ, কবি আজিজুর রহমান, কবি মুফাখখারুল ইসলাম, ডক্টর হাসান জামান, ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী প্রমুখ ব্যক্তিদের সাথে দৈনিক সংগ্রামের সাহিত্য-সম্পাদক হিসাবে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়। তাঁরা সকলেই আমাকে লেখা দিয়ে এবং নানা মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেন যা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি হলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও লেখক-সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদ। আমি একদিন বিনা খবরেই তাঁর ধানমন্ডির বাসা খুঁজে হাজির হই তাঁর কাছ থেকে একটি লেখা সংগ্রহের জন্য। তাঁর সাক্ষাৎ লাভের জন্য দীর্ঘ সময় ড্রয়িং রুমে বসে থাকলাম। আমি একাই সেখানে অপেক্ষা করছিলাম। আমার নাম এবং পরিচয় সহ স্লীপ পাঠানোর পরও অত সময় অপেক্ষা করতে হবে তা বুঝতে না পেরে প্রায় অধৈর্য হয়ে যখন নিরাশ হয়ে ফিরে আসার উদ্যোগ নিচ্ছি তখন অকস্মাৎ মুখে মিষ্টি হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে তিনি ড্রয়িং রুমের পর্দা উন্মোচন করে আবির্ভূত হয়ে প্রথমেই আমাকে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্য সবিনয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বললেনঃ 'আগে এপয়েন্টমেন্ট করে আসলে আপনাকে এই প্রতীক্ষা করে সময় নষ্ট করতে হতো না। আমি একটি রুটিন মেনে চলি, তাই এপয়েন্টমেন্ট করে এলে আপনারও মূল্যবান সময় বাঁচতো।'

এতক্ষণে আমি আমার ভুল বুঝতে পারলাম এবং সেজন্য মাফ চেয়ে তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার অনুমতি চাইলাম। তিনি সহাস্যে অনুমতি দিলেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হলো। আলোচনার শুরুতেই দৈনিক সংগ্রামের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ করলেন যে, দৈনিক সংগ্রাম কলকাতার বাংলা ভাষা অনুসরণ করে। পাক-বাংলার ভাষা কলকাতার ভাষা থেকে আলাদা। আমাদের বাংলা ভাষাই আসল, আদি ও অকৃত্রিম। সেন-আমলে বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে নিশ্চিহ্ন করে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়। মুসলিম-আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নবজন্ম ঘটে। সে সময় অসংখ্য আরবী, ফার্সী, তুর্কী শব্দ বাংলা ভাষায় স্বী-কৃত (assimilate) হয়ে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে। সেই ভাষায় হিন্দু-মুসলিম সকলেই সাহিত্য চর্চা করে এক বিশাল সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল ভাণ্ডার গড়ে তোলে। সেই ভাষা দীর্ঘকাল আমাদের সাহিত্যের ভাষা ছিল এবং এখনো তা পাক-বাংলার সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায় প্রচলিত রয়েছে। এটাই আমাদের নিজস্ব ভাষা। কিন্তু আপনারা অর্থাৎ দৈনিক সংগ্রাম বৃটিশ আমলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ব্রাহ্মণ সংস্কৃত পণ্ডিতদের ষড়যন্ত্রের ফলে কলকাতায় যে কৃত্রিম বাংলা ভাষার জন্ম হয়, সেই ভাষাই অনুসরণ করে চলেছেন।

তাঁর কথা শুনে আমি তো হতভম্ব! ইতোপূর্বে আমি এ বিষয়টি এভাবে কখনো ভেবে দেখিনি। তিনি আরো বললেনঃ পাক-বাংলার ভাষাই শুধু আলাদা নয়; পাক-বাংলার একটি নিজস্ব, স্বতন্ত্র কালচারও রয়েছে। এই স্বতন্ত্র ভাষা এবং বিশেষভাবে আমাদের নিজস্ব আদর্শ, সহস্র বছরের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ও আলাদা কালচারের জন্য আমরা

www.pathagar.com

দীর্ঘকাল সংগ্রাম করে স্বতন্ত্র, স্বাধীন দেশ সৃষ্টি করেছি। মনে রাখবেন, আমাদের এই স্বতন্ত্র ভাষা, সাহিত্য ও কালচারই আমাদের স্বাধীনতার মূল ভিত্তি। দৈনিক সংগ্রাম এ ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশাস ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে খানিকটা হতাশ হয়েছি। তিনি আমাকে এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করার উপদেশ দিলেন। আমার মাধ্যমে তিনি দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক ও কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করার পরামর্শ দিলেন।

আমি যেন দিব্য-দৃষ্টি ফিরে পেলাম। তাঁর অভিজ্ঞ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য শুধু তখনকার জন্যই নয়; আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও একান্তভাবে সত্য। এ সম্পর্কিত তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য 'পাক-বাংলার কালচার' (পরবর্তীতে যা 'বাংলাদেশের কালচার' হিসাবে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে) বইতে তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। দীর্ঘ আলোচনার পর তাঁর নিকট থেকে লেখা পাওয়ার আশ্বাস নিয়ে বাসায় ফিরলাম। বলাবাহুল্য, পরবর্তীতে এপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কখনো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাইনি।

দৈনিক সংগ্রামের সাহিত্য-সম্পাদক হিসাবে আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করি যে, আমাদের একদল নতুন, তরুণ আদর্শদীপ্ত উজ্জ্বল কলম-সৈনিক গড়ে তোলা দরকার। শুধু গতানুগতিকভাবে সাহিত্য-পাতা বের করে দায়িত্ব সম্পাদনে আমি পরিতৃপ্ত ছিলাম না। তাই সংগ্রাম-কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আমি সংগ্রাম অফিসের সামনে প্রশস্ত চত্বরে একটি নিয়মিত মাসিক সাহিত্য সভার আয়োজন করেছিলাম। তরুণ লেখকেরা তাতে ভীড় করতো। প্রবীণেরাও কেউ কেউ আসতেন। প্রত্যেক সভাতেই দু'একজন বিশিষ্ট খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিককে সভাপতি বা প্রধান অতিথি হিসাবে দাওয়াত দিতাম। তরুণদের লেখা পাঠ হতো, তার উপর আলোচনা-সমালোচনা হতো। মোট কথা, তাদেরকে লেখার কাজে উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় দিক্-নির্দেশনা দেয়াই ছিল ঐ সাহিত্য-সভার লক্ষ্য। তাদের লেখা ছেপেও আমি তাদেরকে অনুপ্রাণিত করার প্রয়াস পেতাম। আজ আমার ভাবতে খুব আনন্দ লাগে যে, সেই সত্তরের দশকের শুরুতে দৈনিক সংগ্রামের সাহিত্য পাতায় প্রথম যাদের লেখায় হাতেখড়ি তাদের অনেকেই পরবর্তীতে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন এবং এখনো রেখে চলেছেন। এঁদের অনেকেই বর্তমান বাংলা সাহিত্যের পরিমন্ডলেও বিশেষ স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে এখানে দুটি ঘটনার উল্লেখ করেই আমার এ নাতিদীর্ঘ স্মৃতি-চারণের পরিসমাপ্তি ঘটাবো।

কয়েক বছর আগের কথা। আমি দুবাই থেকে বাৎসরিক ছুটিতে বাংলাদেশে এসে ঢাকাস্থ 'বাংলা সাহিত্য পরিষদে'র এক সভায় আমন্ত্রিত মেহমান হিসাবে যোগদান করি। আমার পরিচয় শুনে বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক মরহুম জামেদ আলী ছুটে এসে আবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেনঃ "আপনি তো আমার সাহিত্যিক গুরু। মফঃস্বল থেকে আমি তখন সংগ্রামে লেখা পাঠাতাম, আপনি তা পরম যত্নে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে ছাপতেন। আমার প্রথম গল্প আপনার হাতেই ছাপা এবং তারপর আমার অনেকগুলো লেখাই আপনি ছেপেছিলেন।"

মফঃস্বল থেকে তিনি লেখা পাঠাতেন, সে সুবাদে পত্রালাপও হতো। কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয় বহুদিন পরে ঐ প্রথম। তখন তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত কথাশিল্পী। তাঁর অকপট আন্তরিকতায় আমি বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। পরবর্তীকালে তিনি ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন। মগবাজারে দৈনিক সংগ্রামের পাশেই তাঁর হোমিও

www.pathagar.com

সাত জন বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিককে পুরস্কার ও সংবর্ধনা প্রদান উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান

সভাপতির ভাষণ দিচ্ছেন অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান। মঞ্চে উপবিষ্ট (বাম থেকে, প্রথম সারি) : মতিউর রহমান মল্লিক, আতা সরকার, প্রধান অতিথি কবি আল মাহমুদ, বিশেষ অতিথি আব্দুল মান্নান তালিব। (দ্বিতীয় সারি) মুকুল চৌধুরী, সোলায়মান আহসান, হাসান আলীম, আসাদ বিন হাফিজ, মোশাররফ হোসেন খান।

চিকিৎসালয় ছিল। সেখানে তিনি সুনামের সাথে ডাক্তারী পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। ঐ সময় তাঁর কয়েকটি উপন্যাস বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ১৯৯৭ সনের ২রা অক্টোবর। সেদিন আমি বাংলা সাহিত্য পরিষদ মিলনায়তনে আমার উদ্যোগে গঠিত 'বাংলাদেশ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ' কর্তৃক তরুণ বা তরুণোত্তর সাতজন বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিককে পুরস্কার প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছিলাম। পুরস্কার-প্রাপ্ত অন্যতম বিশিষ্ট কথাশিল্পী জনাব আতা সরকার তাঁর বক্তৃতায় বললেনঃ "শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান যখন ১৯৭০-৭১ সালে দৈনিক সংগ্রামের সাহিত্য-সম্পাদক ছিলেন, তখন তাঁর নিপুণ সম্পাদনাতেই আমার প্রথম জীবনের গল্পগুলো ছাপা হয় । তাঁর হাতেই সেকালে আমার প্রথম গল্পের জন্য দশ টাকা সম্মানী পেয়েছিলাম। আমার জীবনের প্রথম সাহিত্য-পুরস্কারও আজ তাঁর হাতেই পেলাম এটা আমার জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে"।

আতা সরকার আধুনিক কথা-সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিক্রমী ব্যক্তিত্ব। তাঁর আবেগ জড়িত বক্তব্যে আমি সেদিন যথার্থই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। পাওয়ার মধ্যে একটা আনন্দ রয়েছে, দেয়ার মধ্যেও যে একটি গভীর পরিতৃপ্তি রয়েছে, নিজেকে উজাড় করে সেই পরিতৃপ্তিই আমি জীবনভর খুঁজে বেড়িয়েছি। সেদিন যে সাত জনকে সাহিত্য পুরস্কার দিয়েছিলাম, আমার বিবেচনায় তারা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় বিকাশমান প্রতিভা। তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্যেই আমি তাদের প্রত্যেককে নগদ দু'হাজার টাকা পুরস্কার ও একটি করে সনদ-পত্র প্রদান করে তাদের সাহিত্য-কর্মের স্বীকৃতি প্রদান করেছিলাম।

এ রকম আরো বহু ঘটনা ও কাহিনীই আছে দৈনিক সংগ্রামের সংগ্রাম-মুখর কর্ম-ব্যস্ত সেই রোমাঞ্চকর দিনগুলো ঘিরে।

দৈনিক সংগ্রামে আমার সেই ব্যস্ত, কর্মমুখর, সংগ্রামময় তেইশটি মাস এখন আমার জীবনের এক অক্ষয় দীপ্তিমান স্মৃতি। প্রৌঢ়ত্বের এ গোধূলি-লগ্নে স্মৃতির উজ্জ্বল পাতাগুলো উল্টে-পাল্টে যখন দেখি তখন কিছুক্ষণের জন্যে হলেও এক অনির্বচনীয় আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় এ অবসাদগ্রস্ত প্রাণে তারুণ্যের চাঞ্চল্য অনুভব করি।

www.pathagar.com

কবি বে-নজীর আহমদ স্মরণে

গরীব-নিঃস্ব-ভাগ্যহত মানুষের একান্ত দরদী, ধনী-জমিদার-পুঁজিপতি-ইংরেজ রাজশক্তির আতংক, ইসলামের ন্যায়-নীতি, সাম্য ও মানবতাদের নিশান-বরদার কবি বে-নজীর আহমদ ছিলেন এক অসম সাহসী কিংবদন্তীতুল্য অসাধারণ মানুষ। গভীর সংবেদনশীল এই মহৎ মানুষটি হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি ব্যক্ত করতে একদিকে যেমন কবিতা লিখতেন, অন্যদিকে দুখী মানুষের দুর্দশা মোচনে অকাতরে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে, পরাধীনতার শৃংখল মুক্তির উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগ দেয়ার মত চরম পন্থা অবলম্বনেও দ্বিধা করেননি।

কবি বে-নজীর আহমদের জন্ম ১৯০৩ সনে ২৯ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জের ধানুয়া গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস ঢাকা জেলার আড়াই হাজার থানার ইলমদী গ্রামে। পিতা সাজেদুর রহমান ওরফে তারা মিয়া, মা মাহমুদা খাতুন। তিনি ১৯৮৩ সনে ১২ ফেব্রুয়ারী শনিবার ৮২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ছোটবেলার নাম বেনু মিয়া। তাঁর কাব্য-প্রতিভা, অসম সাহসিকতা, নিঃস্ব জনগণের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে তাঁর প্রচন্ড আক্রোশ ইত্যাদি লক্ষ্য করে বাংলার বিদ্রোহী ও আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর নাম দিলেন বে-নজীর আহমদ (বে-নজীর অর্থ নজীর -বিহীন, অনন্য)। সেই থেকে তিনি এই নামেই পরিচিতি লাভ করেন।

বে-নজীর আহমদ ছিলেন মানব-দরদী মহৎ হৃদয়ের অধিকারী। বঞ্চিত, দরিদ্র, দুখী মানুষের দুর্দশা তিনি বরদাশ্‌ত করতে পারতেন না। নিজের সব কিছু অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতেন। এছাড়া, শিক্ষিত তরুণদের নিয়ে দল গঠন করে তিনি জমিদার, সূদখোর, দাদন-ব্যবসায়ী মহাজনদের নিকট চিঠি-পত্র দিয়ে টাকা-পয়সা সংগ্রহ করে তা নিঃস্বদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। কারো কারো নিকট এ ধরনের কর্মকাণ্ড সন্ত্রাস বলে মনে হতে পারে। সাধারণ অর্থে এ কাজ অবশ্যই নিন্দার্হ। কিন্তু তিনি এভাবে সংগৃহীত অর্থ-বিত্ত কখনো নিজের জন্য নয়, বঞ্চিত-নিঃস্ব মানুষের জন্য এবং আর্তমানবতার সেবায় ব্যয় করতেন। তাছাড়া, ঐসব জমিদার-মহাজন ছিল শোষক, সাধারণ মানুষকে শোষণ করেই তারা বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়েছে আর এ নিষ্ঠুর শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে সাধারণ মানুষ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়েছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শোষক শ্রেণীও জমিদার-মহাজনদের সপক্ষে, সামাজিক

www.pathagar.com

ব্যবস্থা ও শোষক শ্রেণীর প্রণীত আইন ও বিধি-বিধানও এ অমানবিক শোষণ-ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার পক্ষে। এ অমানবিক ব্যবস্থার মূলে চরমাঘাত করার উদ্দেশ্যেই বে-নজীর আহমদের সংবেদনশীল হৃদয় এ চরমপন্থা অবলম্বনে বাধ্য হয়। এভাবে সংগৃহীত টাকা-পয়সা তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দাতব্য সংস্থা, গরীব-দুখী মানুষ, দরিদ্র ছাত্র– এদেরকে দান করে দিতেন। জানা যায়, কলকাতার বালিগঞ্জ ও খিদিরপুর এলাকাতেই প্রায় ৫০/৬০ জন গরীব ছাত্রের লেখাপড়ার খরচ তিনি বহন করতেন। এ শ্রেণীর গরীব অসহায় মানুষের নিকট তিনি 'দাতা হাতেম তায়ী' বা 'রবিনহুডের' মত কিংবদন্তীতুল্য মহৎ ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তাই এটাকে সন্ত্রাসবাদ না বলে বিদ্যমান বিশেষ রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার বিরুদ্ধে এক প্রবল বিদ্রোহ বলাই যুক্তিযুক্ত। গভীর মানবিক বোধসম্পন্ন কবি বে-নজীর আহমদের বর্ণাঢ্য জীবনের এ এক অসাধারণ দিক।

বে-নজীর আহমদ ছিলেন উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী কর্মী-সংগঠক। ছাত্রাবস্থায় স্কুল ছেড়ে ১৯১৮ সনে তিনি সন্ত্রাসবাদীদের দলে যোগ দেন। কিন্তু চরম হিন্দুবাদী সূর্যসেনের মুসলিম-বিদ্বেষ ও কালীর চরণে রক্ত-শপথ গ্রহণের শির্কী রীতি-পদ্ধতি দেখে তিনি তা ছেড়ে 'আজাদ পার্টি' নামে স্বতন্ত্র দল গঠন করেন। এ দল গঠনের উদ্দেশ্য ছিল দেশকে স্বাধীন করা ও দেশের মানুষকে স্বদেশী-বিদেশী শোষণ-নির্যাতনের কবল থেকে রক্ষা করা। শেষোক্ত কর্মসূচী হিসাবে তাঁর দল ঢাকা ও নোয়াখালীর বিভিন্ন অঞ্চলে অত্যাচারী জমিদার, সূদখোর-মুনাফাখোর-দাদনব্যবসায়ী মহাজনদের বাড়ি-ঘর লুটপাট করে সংগৃহীত অর্থ বিপন্ন মানুষের খেদমতে ব্যয় করেন। এ ধরনের কার্যক্রমের এক পর্যায়ে ১৯২৭ সনে বে-নজীর পুলিশের হাতে ধরা পড়ে নোয়াখালীর জেলে প্রেরিত হন। সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, হত্যা ও ডাকাতির মামলা চলে তিন বছর ধরে। অবশেষে তিনি সমস্ত অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস পান। ঐ জেলে বসেই তিনি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বন্দীর বাঁশী' রচনা করেন। প্রকাশের পর সরকার অবশ্য তা বাজেয়াপ্ত করেন।

বে-নজীর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য একবার ইউরোপ যাত্রা করেন। কিন্তু গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় আলেকজান্দ্রিয়ায় বৃটিশ দূতাবাসে আশ্রয় নেন। তারা তাঁকে দেশে ফেরত পাঠায়। টাকা ছাপানোর মুদ্রণ-কৌশল শেখার জন্য বে-নজীর তাঁর বন্ধু সাংবাদিক ফজলুল হক সেলবর্ষীকে জার্মান পাঠান। কিন্তু তিনি সেখানে কিছু শেখার সুযোগ না পেয়ে দেশে ফিরে আসেন। এভাবে সবদিক থেকে ব্যর্থ হয়ে তাঁর দলের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় এবং তিনি 'দৈনিক আজাদে' সম্পাদকীয় বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন।

কলকাতায় জাহান আরা চৌধুরী নাম্নী এক মহিলার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বর্ষবাণী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশে তিনি সাহায্য করেন। ১৯৩২ সনে 'বঙ্গীয় পরিশীলন সমিতি' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠিত হয়। বে-নজীর ও কবি আব্দুল কাদির এর উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তা ছিলেন বলে জানা যায়। নজরুল ইসলামও এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এভাবে দৈনিক আজাদে কর্মরত অবস্থায় তিনি বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত হন। এক পর্যায়ে তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগঠন ও উপমহাদেশের মুসলমানদের জাতীয় রাজনৈতিক দল 'মুসলিম লীগে' যোগদান করেন। মুসলিম লীগে যোগদানের পর তিনি ক্রমান্বয়ে নিখিল পাকিস্তান

www.pathagar.com

মুসলিম লীগের কাউন্সিলর, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নির্বাহী পরিষদের সদস্য এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিরক্ষা কমিটির (মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নির্বাচিত হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদেরও সদস্য নির্বাচিত হন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে বে-নজীর আহমদ আরাকান যান। সেখানে আরাকানী মুসলমানদের সংগঠিত করে মুসলিম-প্রধান অঞ্চল নিয়ে স্বাধীন মুসলিম আরাকান রাজ্য স্থাপনে সচেষ্ট হন। কক্সবাজারে আপৎকালীন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ছদ্মাবরণে তিনি স্বাধীন মুসলিম আরাকান রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজে সচেষ্ট হন। কিন্তু অচিরেই বৃটিশ গোয়েন্দা বাহিনীর নিকট তাঁর আসল উদ্দেশ্য ধরা পড়ে এবং সেখানে দেড় বছর অবস্থানের পর তাঁর কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়ে কলকাতায় ফিরে এসে তিনি পুনরায় সাংবাদিকতা পেশায় যোগ দেন। তবে এবারে দৈনিক আজাদ পত্রিকার বদলে তিনি শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকায় যোগ দেন। নবযুগের প্রধান সম্পাদক ছিলেন তখন কাজী নজরুল ইসলাম এবং সম্পাদক ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। বে-নজীর আহমদ বার্তা-সম্পাদকের দায়িত্ব লাভ করেন। এ ছাড়া, ১৯২৭ সনে তিনি কলকাতার নওরোজ প্রেস ও নওরোজ মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

বে-নজীর আহমদের দুটি কবিতার বই- 'বন্দীর বাঁশী' ও 'বৈশাখী'। একটি প্রবন্ধ সংকলন 'ইসলাম ও কমিউনিজম'। সম্প্রতি ঢাকাস্থ 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ' তাঁর দু'টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এগুলোর নাম ঃ 'হৈমন্তিকা' (অক্টোবর, ২০০৩) ও 'জিন্দেগী' (অক্টোবর, ২০০৩)।

তাঁর লেখার মধ্যে একাধারে ইসলাম, জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা ও বিশ্ব-মানবতার উচ্চকিত বাণী সোচ্চারিত। ১৯১৮ সন থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত আমাদের রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলন, সাহিত্য-সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বে-নজীর আহমদ ছিলেন এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। নজরুল ইসলামের তিনি ছিলেন অকৃত্রিম অনুরাগী। কাব্য ক্ষেত্রে তিনি নিষ্ঠা ও আবেগের সাথে নজরুলকে অনুসরণ করেছেন। রবীন্দ্র-যুগে জন্মগ্রহণ করলেও নজরুল ভাব, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর ক্ষেত্রে বাংলাকাব্যে যে স্বতন্ত্র মহিমান্বিত উজ্জ্বল ধারার সৃষ্টি করলেন, সমকালীন অনেককেই তা প্রভাবিত করেছে। এমনকি, নজরুলের কিছুটা অগ্রজ কবি শাহাদৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফাও নজরুলের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হন। বে-নজীর আহমদ সজ্ঞানে এবং নিষ্ঠার সাথে নজরুলকে অনুসরণের প্রয়াস পান। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট কবি-সমালোচক সৈয়দ আলী আহসান বলেন ঃ

"কবি কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের পর আমরা কয়েকজন মুসলমান কবিকেও পাই বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে এঁরা হচ্ছেন– গোলাম মোস্তফা, শাহাদৎ হোসেন, জসিম উদ্দীন, বন্দে আলী মিয়া, আব্দুল কাদের, বে-নজীর আহমদ। এঁদের মধ্যে বে-নজীর আহমদই একমাত্র কবি, যিনি নজরুল ইসলামের ছন্দ ও দ্যোতনাকে পুরাপুরি অনুকরণ করে কবিতা লিখেছেন। বে-নজীর আহমদের জীবনের সঙ্গে নজরুল ইসলামের জীবনের অনেকটা মিল আছে। বরঞ্চ বে-নজীর আহমদ জীবনে যতটা দুঃসাহসী, ভয়ংকর ও অস্বাভাবিকত্বের মুখোমুখি যেভাবে হয়েছেন, সেভাবে নজরুল ইসলাম হতে পারেননি। অবশ্য কবি-প্রতিভার দিক থেকে বে-নজীর আহমদ নজরুল ইসলামের অনুসারী হিসাবে পরিচিত থাকবেন। তাঁকে অতিক্রম করা বে-নজীরের সম্ভব হয়নি।"

www.pathagar.com

একাধারে কবি-প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, রাজনীতিক ও প্রবল মানবিকবোধসম্পন্ন এক বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী বে-নজীর আহমদের সাথে আমার পরিচয় ঘটে উনিশ শো ষাটের দশকের শুরুতে। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমরা কতিপয় তরুণ 'পাক-সাহিত্য সংঘ' গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সভা-সমিতি নিয়ে ব্যস্ত। ঐ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সুবাদেই ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কবি গোলাম মোস্তফা, কবি বে-নজীর আহমদ, কবি খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, কবি ফররুখ আহমদ, কবি তালিম হোসেন প্রমুখের সাথে পরিচয় এবং ক্রমান্বয়ে হৃদ্যতা ঘটে। বয়সের বিস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও আদর্শিক কারণে সহজেই তাঁদের নিকট-সান্নিধ্য লাভ ও স্নেহসিক্ত আশ্রয় লাভ করা সম্ভব হয়েছিল আমার পক্ষে।

কবি বে-নজীর আহমদের সাথে পরবর্তীতে 'পাকিস্তান তামদ্দনিক আন্দোলন' এবং ১৯৭০ সনের জানুয়ারিতে প্রকাশিত দৈনিক সংগ্রামের সাহিত্য পাতা সম্পাদনা উপলক্ষে পরিচয় আরো গভীর হয়।

১৯৬৭ সনের জুন মাসে তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় সংসদে তৎকালীন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন সংসদে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার সম্পর্কে এক বিবৃতি দেন। এর ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য সাংস্কৃতিক মহলে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এটাকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী "রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ" বলে দাবি করে পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান করেন। সারা দেশে এ নিয়ে তাঁরা সভা-সমিতি-অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করেন। তাঁদের অপপ্রচারে বাধ্য হয়ে ইসলামী বোধ-বিশ্বাসসম্পন্ন ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীরাও তখন পাল্টা বিবৃতি দিয়ে, সভা-সমিতি করে এ অপপ্রচারের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন। শেষোক্তদের বক্তব্যের মূলকথা হলো ঃ রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা। কিন্তু তাঁর আদর্শ ও প্রধান অনুপ্রেরণার উৎস হলো হিন্দু আদর্শ ও বেদ-বেদান্ত। তাই তিনি কোন মতেই আমাদের 'সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে পারেন না। যদিও তাঁকে আমাদের সাহিত্যের প্রধান কবি হিসাবে স্বীকার করতে বাধা নেই। পৃথিবীর বহু কবি এরকম ভিন্নধর্মী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের সাহিত্য আমাদের নিকট আদরণীয়।

এ ধরনের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য চল্লিশজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর একটি বিবৃতি ২৯ জুন, ১৯৬৭ তারিখে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। এতে স্বাক্ষর দান করেনঃ মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, আব্দুল মওদুদ, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ইব্রাহিম খাঁ, মুজীবুর রহমান খাঁ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, ডক্টর কাজী দ্বীন মুহম্মদ, ডক্টর হাসান জামান, ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, বে-নজীর আহমদ, মঈনুদ্দীন, শেখ শরফুদ্দীন, আ ক ম আদম উদ্দীন, তালিম হোসেন, শাহেদ আলী, আ ন ম বজলুর রশীদ, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্, সানাউল্লাহ নূরী, আব্দুস সাত্তার, কাজী আবুল কাসেম, মুফাখ্‌খারুল ইসলাম, শামসুল হক, ওসমান গনি, মফিজউদ্দিন আহমদ, আনিসুল হক চৌধুরী, মোস্তফা কামাল, মুহম্মদ মতিউর রহমান, জহুরুল হক, ফারুক আহমদ, শরফুদ্দীন আহমদ, হোসনে আরা, মাফরুহা চৌধুরী, মোহাম্মদ নাসির আলী, এ কে এম নূরুল ইসলাম, জাহানারা আরজু, আব্দুল ওয়াদুদ।

www.pathagar.com

উপর্যুক্ত স্বাক্ষরদাতাদের নামের তালিকায় কবি বে-নজীর আহমদের নাম তের নম্বরে এবং আমার নাম তিরিশ নম্বরে ছাপা হয়। রবীন্দ্র-বিতর্ক যখন তুঙ্গে তখন আমি 'পাক-সাহিত্য সংঘে'র সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ঢাকার বাইশটি সাহিত্য-সংস্কৃতি ও যুব সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে এক বৈঠকের আয়োজন করি। পরপর দুটি বৈঠকের পর সর্বসম্মতভাবে 'পাকিস্তান তামদ্দনিক আন্দোলন' নামে একটি জাতীয়-ভিত্তিক সংগঠন কায়েমের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁকে সভাপতি, কবি বে-নজীর আহমদকে সাধারণ সম্পাদক, আমাকে যুগ্ম-সম্পাদক, খ্যাতনামা সাংবাদিক আখতারুল আলমকে সহ-সম্পাদক করে একটি অস্থায়ী কমিটি করা হয়। কমিটিতে বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী আরো অনেকেই যুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন ঃ আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, মুজীবুর রহমান খাঁ, তালিম হোসেন, ফররুখ আহমদ, মুফাখ্খারুল ইসলাম, সানাউল্লাহ নূরী, মওলানা মুহিউদ্দীন খান, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ, আব্দুস সাত্তার, হাফেয হাবিবুর রহমান, আব্দুল মান্নান তালিব প্রমুখ।

ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউটে তামদ্দনিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে জাতীয়-ভিত্তিক এক সেমিনার করা হয়। তাতে সভাপতিত্ব করেন প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁ। আবুল মনসুর আহমদের লেখা একটি দীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন আখতারুল আলম। আবুল কালাম শামসুদ্দীন, বে-নজীর আহমদ, তালিম হোসেন, মোহাম্মদ মাফ্‌ফুজউল্লাহসহ অনেকেই তাতে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান ঘোষণার দায়িত্ব ছিল আমার উপর। বিপুল সংখ্যক শ্রোতার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান সফল হয়।

তামদ্দনিক আন্দোলনের কাজে কবি বে-নজীর আহমদকে রাত-দিন নিরলসভাবে কাজ করতে দেখেছি। তাঁর একটা নিজস্ব ছোট গাড়ি ছিল। সে গাড়িটাও সর্বক্ষণ আন্দোলনের কাজে সচল থাকতো। কখনো কখনো রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত বৈঠকাদি করে, বিভিন্ন স্থানে ঘোরাঘুরি করে কবি সাহেব শাহজাহানপুরস্থ তাঁর বিখ্যাত আমবাগানের বাসায় ফিরতেন। তাঁর প্রায় নিত্য-সহচর হিসাবে তখন কবি তালিম হোসেন, মওলানা মুহিউদ্দীন খান ও আমি ছিলাম। এছাড়া, আরো যাঁদের সাহচর্য ও আন্তরিক সহযোগিতা সব সময় পাওয়া যেত তাঁদের মধ্যে কবি ফররুখ আহমদ, কবি মুফাখ্খারুল ইসলাম, কবি মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ, কবি আব্দুস সাত্তার প্রমুখের নাম করা যায়।

ফররুখ আহমদ নীতিগতভাবে কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকার পক্ষপাতি ছিলেন না। তামদ্দনিক আন্দোলনের সাথেও তাঁর কোন আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু আলাপ-আলোচনা, পরামর্শ ইত্যাদি কাজে তাঁকে সব সময়ই পাওয়া যেত। এমনকি, আমন্ত্রিত হয়ে তিনি আন্দোলনের বৈঠকাদিতেও যোগদান করেছেন। বায়তুল মুকাররমে সীরাত কমিটির অফিসে অনুষ্ঠিত এমনি এক বৈঠকে কোন এক প্রসঙ্গে হঠাৎ করেই কবি বে-নজীর আহমদ ও কবি ফররুখ আহমদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। দুই শ্রদ্ধেয় কবির এরূপ আকস্মিক উত্তেজনা দেখে আমরা উপস্থিত সকলেই হতভম্ব হয়ে

www.pathagar.com

পড়ি। প্রথমে কবি তালিম হোসেন তাঁর স্বভাবসুলভ বিনয়-গম্ভীর বাক্যে উভয়কে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। শেষমেশ মওলানা মুহিউদ্দীন খান তাঁদেরকে নিবৃত্ত করেন। এরপর সভার কাজ স্বভাবতই বন্ধ ঘোষণা করা হয়। তবে ফেরার পথে লক্ষ্য করলাম, কবি বে-নজীর আহমদ কবি ফররুখ আহমদের হাত ধরে তাঁর গাড়ীতে নিয়ে বসালেন। একটু আগেই উভয়ের মধ্যে যে প্রচন্ড বাক-বিতন্ডা হয়েছে তার রেশ তখন আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তাঁদের সাথে কবি তালিম হোসেন ও আমিও গিয়ে গাড়িতে বসলাম। ইস্কাটন গার্ডেনে গিয়ে গাড়ি থামলো। সেখানে কবি ফররুখ আহমদ, কবি তালিম হোসেন ও আমাকে নামিয়ে কবি বে-নজীর আহমদ তাঁর বাসায় চলে গেলেন। আমি চলে এলাম ধানমন্ডি ভূতের গলিতে আমার তখনকার ৯বি সার্কুলার রোডের বাসায়।

সেদিনের পর তামদ্দনিক আন্দোলনের কাজ আর তেমন একটা জমেনি। ইতোমধ্যে তামদ্দনিক আন্দোলনের ঘোষণা-পত্রের খসড়া তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয় আমার উপর। আমি সেটা যথাসময়ে তৈরির কাজ সম্পন্নও করেছিলাম। আমাদের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা-সাহিত্য-তামদ্দনিক ব্যবস্থার সংশোধন ও উন্নয়নে তাতে অনেক ভাল ভাল কথা, কর্মসূচি ও পরিকল্পনার বিষয় এবং তা বাস্তবায়নে আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু আকস্মিকভাবে আমাদের কার্যক্রম বন্ধ হওয়ায় আমাদের পরিকল্পনা-কর্মসূচি কোন কিছুই আর বাস্তবায়িত হলো না। তবে আন্দোলনের কাজে অল্প কয়েক মাস কবি বে-নজীর আহমদ যে কর্ম-ব্যস্ততা, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন তা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তিনি ছিলেন এক নিরলস কর্মী। কাজের নেশায় তিনি তাঁর খাওয়া-দাওয়া-বিশ্রামের কথা পর্যন্ত ভুলে যেতেন। এমনিতেই তিনি ছিলেন অতিশয় সাদাসিধা নিরহংকার প্রকৃতির মানুষ। তাঁর পোষাকাদি ছিল একান্তই সাধারণ। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবীই আমি তাঁকে সব সময় পরতে দেখেছি। সে কাপড়ও ছিল অল্প দামের এবং ধোপ-দুরস্তবিহীন। খাওয়া-দাওয়ার খুব একটা আগ্রহ তাঁর মধ্যে কখনো লক্ষ্য করিনি। বিলাসিতা তাঁকে কখনো স্পর্শ করেছে বলে মনে হয়নি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলিম। দেশ-সমাজ-ইসলাম ও মুসলমানের উন্নতি ও কল্যাণ-চিন্তায় তিনি সর্বদা নিমগ্ন থাকতেন ও সে লক্ষে কাজ করতেন।

কবি বে-নজীর আহমদের সাথে এরপর আর একবার আমার ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ হয়েছিল। আমি তখন 'দৈনিক সংগ্রামে'র সাহিত্য সম্পাদক (জানুয়ারি ১৯৭০ থেকে ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত)। পত্রিকার লেখার জন্য আমি প্রায়ই তাঁর শাহজাহানপুরস্থ আমবাগানের বিশাল 'কবি-ভবনে' যাতায়াত করতাম। শোনা যায়, কলকাতায় থাকতে কনট্রাকটরী কাজে তিনি কয়েক লক্ষ টাকা আয় করেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকায় এসে তিনি সেই টাকা দিয়ে শাহজাহানপুর ও মিরপুরে প্রায় একশো বিঘা সম্পত্তি ক্রয় করেন। ঢাকায় আসার পূর্বে কলকাতায় কন্ট্রাকটরী ব্যবসায়ে তিনি কয়েক লক্ষ টাকা উপার্জন করেছিলেন। সেই টাকা দিয়েই তিনি এ বিষয়-সম্পত্তি ক্রয় করেন। আইয়ুব খাঁর আমলে কমলাপুর রেল স্টেশন নির্মাণে তাঁর সম্পত্তির বিরাট অংশ এ্যাকোয়ার করা হলেও তখনো তাঁর বাড়ি ছিল এগারো বিঘা সম্পত্তির উপর। বড় বড় কয়েকটি চৌচালা ঘর, পাকা গাঁথুনির দেয়াল ও মেঝে। বাড়ির চারপাশে বিশাল আমবাগান। নারায়ণগঞ্জ শীতলক্ষা নদীর তীরে তাঁর জাহাজ নির্মাণ ও পাইকারী ব্যবসাও ছিল।

www.pathagar.com

শাহজাহানপুরের বিশাল আমবাগানের পাখি-ডাকা, ছায়া-সুনিবিড় 'কবি-ভবনে'র বৈঠকখানায় বসে কবির সঙ্গে আলাপ হতো। বৈঠকখানার আসবাব-পত্র ছিল একান্তই সেকেলে ও মামুলি। একটা চেয়ার টেনে কবি সাহেব আমাকে বসতে দিতেন, আরেকটি চেয়ারে তিনি নিজে বসতেন। অনেক গল্প হতো। রাজনীতি, দেশের অবস্থা, মুসলমানদের অবস্থা, সাহিত্য ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে কথা হতো। অত্যন্ত সহজ, সরল, বিনীয়, মুধুরভাষী ও রসালাপী ছিলেন তিনি। ঐ সময় তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতা আমি দৈনিক সংগ্রামের সাহিত্য পাতা ও বিশেষ সংখ্যায় ছেপেছি। তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিবেশে কথা হতো। তাঁর জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও সাফল্য-ব্যর্থতার কথা আলোচনা হতো। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে একদিন তাঁর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেবার বাসনা উদয় হলো আমার মনে। কিন্তু ইতোমধ্যে দেশের অবস্থা চরম অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত হলো। প্রবল গণ-আন্দোলন, সামাজিক অস্থিরতা অবশেষে শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। আমার বাসনা অপূর্ণই রয়ে গেল।

এখনো মাঝে-মধ্যে যাই আমবাগানে। মসজিদের পাশে দেয়ালের সাথে অচিহ্নিত দুটি কবর। বাংলার বিপ্লবী কবি বে-নজীর আহমদ ও ইসলামী রেনেসাঁর কালজয়ী কবি ফররুখ আহমদ অনন্ত নিদ্রায় শায়িত রয়েছেন পাশাপাশি। কবর জিয়ারত করে দুই মহান কবির আত্মার মাগফিরাত কামনা করে ফিরে আসি।

কীভাবে দুই কবি একই সাথে অনন্ত শয়ানে শুয়ে আছেন তা অনেকেরই জানা। ১৯৭৪ সনে কপর্দকহীন মজলুম কবি ফররুখ আহমদ যখন ইন্তিকাল করেন তখন তাঁকে কবরস্থ করার উপযুক্ত স্থান পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন শোকাকুল বে-নজীর আহমদ ঝড়ের মত ছুটে এসে খাটিয়া ধরে বললেনঃ 'আমার ভাই-এর লাশ আমার বাড়িতে নিয়ে যাব।' এ বলে তিনি খাটিয়ার একপাশ কাঁধে নিলেন। অন্যরাও তাঁর সাথে খাটিয়া বহনে শরীক হলো। এভাবেই কবি ফররুখ আহমদ কবি বে-নজীর আহমদের চির আতিথ্য গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

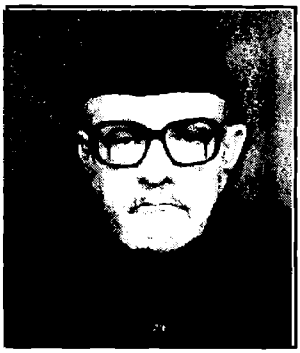

মনীষী দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ স্মরণে

'কুল্লু নাফছুন জায়েকাতুল মওত' অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মহান স্রষ্টার এ অমোঘ সত্য বাণীর সারবত্তা আমরা প্রতিদিনই অনুভব করে থাকি। দেশবরেণ্য দার্শনিক, জ্ঞানতাপস, সর্বজন শ্রদ্ধেয় জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (জন্ম ঃ ২৫ অক্টোবর ১৯০৬) ১৯৯৯ সনের ১লা নভেম্বর আমাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে সেই চিরন্তন সত্য বাণীই আর একবার সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ যেমন ছিলেন সকলের শ্রদ্ধেয়, বরেণ্য তেমনি ছিলেন সকলের একান্ত আপনজন। এমন অসাধারণ জ্ঞানী, উপমহাদেশের খ্যাতনামা দার্শনিক, বহু গুণে গুণান্বিত, সহজ-সরল-নিরহংকার-অমায়িক, সৌম্য-দর্শন, মধুর ভাষী বিরল ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে যেই এসেছে, তাকেই তিনি আপন করে নিয়েছেন। তাঁর সান্নিধ্যের স্নিগ্ধ ছোয়া স্মৃতির মণিকোঠায় মুক্তাখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে থাকে। তাঁর সাথে পরিচয়ের প্রথম দিনে তিনি আমার অন্তরে যে শ্রদ্ধার আসন অধিকার করে নিয়েছিলেন কালের দীর্ঘ ব্যবধানে সে আসন অন্তরের গভীর আবেগে আরো দীপ্ত-সমুজ্জ্বল হয়েছে। তাঁকে আরো বেশি আপন ও পরমাত্মীয় বলে মনে হয়েছে।

১৯৬১ সন। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. শেষবর্ষের ছাত্র। অধুনালুপ্ত 'পাক-সাহিত্য সংঘে'র সাধারণ সম্পাদক। সংঘের পক্ষ থেকে দু'দিন ব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। এগার ও বারো নভেম্বর, ১৯৬১। দু'দিনে মোট তিনটি অধিবেশন। প্রথম দিনের অধিবেশনের বিষয়বস্তু ছিলঃ 'ইসলামী সাহিত্যের স্বরূপ'। দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনের বিষয়বস্তু ছিল ঃ 'সংস্কৃতি ও ইসলাম', এবং দ্বিতীয় অধিবেশনের বিষয়বস্তু ছিলঃ 'পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যত'। দ্বিতীয় দিনে প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য শ্রদ্ধেয় দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমি ভাই শাহ আব্দুল হান্নানকে (সাবেক সচিব, বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের চেয়ারম্যান) সঙ্গে করে তাঁর বাসায় গেলাম। তিনি তখন থাকতেন গুলবাগের একটি বাসায়, টিনশেড ঘরে। ঘরের সামনে একটি লনে চেয়ার পেতে তিনি আমাদের বসতে দিলেন। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে স্বল্প আলোর প্রশান্ত পরিবেশে তিনি আমাদের নিয়ে গল্পে মেতে উঠলেন। হান্নান ভাইর সঙ্গে তাঁর আগেই পরিচয় ছিল, তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রথম পরিচয়েই মুগ্ধ হলাম। অসাধারণ লাবণ্যময় সুন্দর চেহারা, বক্তব্যে গভীর পাণ্ডিত্য আর ব্যবহারে

www.pathagar.com

বিনয়, নম্রতা ও মাধুর্যের ছাপ। পর্যাপ্ত চা-নাস্তা খাইয়ে সেদিন আমাদের বিদায় করলেন। আমাদের দাওয়াত সানন্দে কবুল করায় আমরাও খুশী মনে বাড়ি ফিরলাম।

যথারীতি তিনি সেমিনারে উপস্থিত হয়ে সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন। সেদিন সেমিনারে 'সংস্কৃতি ও ইসলাম' বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ, মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, অধ্যাপক গোলাম আযম, মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী ও নূরুল আলম রইসী। আলোচনায় শরীক হয়েছিলেন ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, অধ্যক্ষ আবুল কাসেম, অধ্যাপক আফতাব আহমদ রহমানী, মওলানা মুহিউদ্দীন খান, মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আলী ও শাহ আব্দুল হান্নান। সেমিনারে পঠিত সকলের প্রবন্ধ ও আলোচনাই অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও মনোজ্ঞ হয়েছিল। তবে তার মধ্যে মওলানা আব্দুর রহীমের প্রবন্ধ ও সভাপতি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ভাষণ সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং উভয়ের বক্তব্য নিয়ে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও প্রাণবন্ত বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সেমিনার শেষেও পত্র-পত্রিকায় কয়েক মাস যাবত এ বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় ওঠে। ফলে এ বিষয়ে আরো অনেক মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেরিয়ে আসে।

এর প্রায় এক যুগ পরে আজরফ সাহেবের সাথে আমার আবার কিছুটা ঘনিষ্ঠ হবার মওকা মেলে। আমি তখন সিদ্ধেশ্বরী কলেজে অধ্যাপনা করি, থাকি কলেজের পাশেই মগবাজার কাজী অফিস লেনে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি অনেক বিভাজন ও পরিবর্তন ঘটে। কবি ফররুখ আহমদ তখন ঢাকা বেতারে চাকুরী থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত হয়েছেন। তাঁর বেতন বন্ধ। ইস্কাটন গার্ডেনে সরকারী ফ্লাট ছেড়ে দেয়ার জন্য বার বার এত্তেলা আসছে। টাকার অভাবে তাঁর মেধাবী বড় ছেলের মেডিকেলের পড়া বন্ধ। বিনা চিকিৎসায় বড় মেয়ের অকাল মৃত্যু ঘটে। কবির শরীরও অর্ধাহারে-অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় ভেঙ্গে পড়েছে। এ কান ও কান হয়ে কথাটা আমাদের সকলের জানা-জানি হলো। আমরা অনেকেই এ খবরে অত্যন্ত ব্যথিত ও যন্ত্রণাকাতর হয়ে পড়লাম। আমরা কয়েকজন একমত হলাম, কবিকে সাহায্য করার জন্য আমাদের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। প্রথমতঃ আমরা 'কবি ফররুখ আহমদ সাহায্য তহবিল' গঠনের কথা চিন্তা করি। কিন্তু কবির চরম আত্মাভিমান ও কঠোর আত্মমর্যাদাবোধের কথা চিন্তা করে সাধারণভাবে বিপন্ন কবি-সাহিত্যিকদের সাহায্যার্থে তহবিল গঠনের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের সাথে আলোচনা করে ১৯৭৪ সনের ২৪শে নভেম্বর বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন মরহুম মওলানা আলাউদ্দীন আল্-আযহারীর বাসভবনে এক বৈঠক আহ্বান করি। এতে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। সভায় ষোলজন উপস্থিতির মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন ছিলেন: ডা. মুহাম্মদ গোলাম মুয়ায্যম, মওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আল আয্হারী, অধ্যাপক আব্দুল গফুর, অধ্যাপক মুহাম্মদ আবুল হোসেন মিয়া, অধ্যাপক মুজীবুল হক, মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান প্রমুখ।

অধ্যাপক আবুল হোসেনের কুরআন তেলাওতের পর সভার আহ্বায়ক হিসাবে আমি সভার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করি। এরপর ডক্টর গোলাম মুয়ায্যম, মওলানা আল-আয্হারী, সভাপতি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের আলোচনার পর উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, (১) বিপন্ন কবি-সাহিত্যিক-মনীষী-গুণীজনদের তালিকা প্রণয়ন করা হবে এবং তাঁদের সাহায্যার্থে ও তাঁদের প্রতিভাকে যথাযথ কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে একটি উন্নত মানের সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকা ও গ্রন্থাদি

www.pathagar.com

প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে, (২) বিপন্ন গুণীজন জাতির গৌরব, জাতি নানাভাবে তাঁদের নিকট ঋণী। তাই তাঁদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁদেরকে যথাযথ সাহায্য প্রদান আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

উপরোক্ত লক্ষ্যে যথাযথ কর্মপন্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফকে আহবায়ক এবং আমাকে সদস্য-সচিব করে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কমিটির পরবর্তী সভা ১লা ডিসেম্বর, ১৯৭৪ তারিখে ডক্টর গোলাম মুয়ায্যমের বাসায় কবি তালিম হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নতুন যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কবি তালিম হোসেন, জনাব মোহাম্মদ আবুল ফয়েজ প্রমুখ। সভায় পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দুটি উপ-কমিটি গঠনসহ কতিপয় বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ আমাদের এসব কর্মকাণ্ডে বিশেষ উদ্যোগী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। আমাদের এসব উদ্যোগে আরো যাঁরা সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক শাহেদ আলী ও মওলানা মুহিউদ্দীন খানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে দুর্ভাগ্যবশত: ১লা ডিসেম্বরের বৈঠকের পর আমাদের তৎপরতা আর বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। কারণ ইতোমধ্যেই এ খবর কবি ফররুখ আহমদের নিকট পৌঁছে যায় এবং তিনি এতে খুব বিব্রত ও ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েন। তিনি এত বড় আত্মমর্যাদাশীল অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, নিতান্ত দারিদ্রাবস্থায়ও একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন মানুষের নিকট থেকে কোনরূপ সাহায্য নিতে রাজী ছিলেন না। যদিও আমাদের উদ্যোগটি ছিল বিপন্ন কবি-সাহিত্যিকদের জন্য কিন্তু আমাদের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য ছিল কবি ফররুখ আহমদকে তাঁর দুর্দিনে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান। কিন্তু এ ব্যাপারে কবির মনোভাব বিরূপ জেনে, তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার কারণেই শেষ পর্যন্ত আমাদের কর্মতৎপরতা বন্ধ করে দিতে আমরা বাধ্য হই। দেওয়ান আজরফসহ আমরা সকলেই এতে দারুণভাবে মর্মাহত হই বটে তবে এর ফলে কবির প্রতি আমাদের সকলের শ্রদ্ধাই বহু গুণে বৃদ্ধি পায়।

এর প্রায় এক-দেড় বছর পর আজরফ সাহেবের সাথে আমার আবার খানিকটা ঘনিষ্ঠ হবার মওকা মেলে। ১৯৭৫ সনের কথা। আমি তখন ঢাকাস্থ সিদ্ধেশ্বরী কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর রাজনৈতিক নেতাগণ সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন ও নাম ফলানোর উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে অসংখ্য কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে সাবেক বেসরকারী কলেজগুলোতে অকস্মাৎ ছাত্র ঘাটতি দেখা দেয়। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তখন আবুজর গিফারী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। সিদ্ধেশ্বরী ও আবুজর গিফারী উভয় কলেজেই তখন নিদারুণ আর্থিক সংকট চলছিল। এ অবস্থা লাঘবের জন্য উভয় কলেজের কতিপয় শিক্ষক কলেজ দুটিকে একীভূত করার চিন্তা করেন। এ চিন্তা থেকে আমরা উভয় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল এবং কতিপয় সিনিয়র শিক্ষক উপর্যপরি কয়েকটি বৈঠক করি। কিন্তু বিভিন্ন কারণে আমাদের সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি। তবে এ সুবাদে আজরফ সাহেবের সাথে আমার ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করার যে সুযোগ হয় সেটা এক আনন্দময় সুখস্মৃতি হয়ে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধকে গভীরতর করেছে। বলাবাহুল্য, আমাদের আলোচনা শুধু কলেজ-সংক্রান্ত বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি, ইতিহাস-দর্শন-ধর্ম-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য ইত্যাদি সকল বিষয়কে স্পর্শ করে গেছে এবং সেখানে আজরফ সাহেবই ছিলেন প্রায় একক বক্তা আর আমরা সবাই ছিলাম তাঁর মুগ্ধ শ্রোতা।

www.pathagar.com

এরপর কর্ম-ব্যাপদেশে আমি ১৯৭৭ সনের ১২ ফেব্রুয়ারী দুবাই চলে যাই। সেখানে প্রথম দিকে কিছুদিন বিভিন্ন ছোট-খাট চাকুরী, ব্যবসা ইত্যাদি করে শেষ পর্যন্ত ১৯৭৮ সনের ১লা মে দুবাই চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রকাশনা বিভাগে সম্পাদক হিসাবে চাকুরী পাই এবং ১৯৯৬ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত উক্ত চাকুরীতে বহাল থেকে প্রবাস-জীবনকে নানা কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত রাখি। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলো ১৯৮১ সনে দুবাইতে 'বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুলে'র প্রতিষ্ঠা। সরকারী চাকুরীর কঠিন দায়িত্ব পালনের মধ্যেও দুবাইতে একমাত্র বাংলাদেশী স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

১৯৮৮-৮৯ সনের দিকে একদিন অকস্মাৎ জানতে পারলাম ইরান থেকে ঢাকা আসার পথে দুবাইতে যাত্রা-বিরতির ফাঁকে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ স্থানীয় হোটেল ফোনেশিয়াতে অবস্থান করছেন। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম সেখানে। প্রবাসে তাঁকে পেয়ে এত ভাল লাগলো যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তিনিও খুব খুশী হলেন। তাঁর সহযাত্রী ছিলেন আরো পাঁচজন। তার মধ্যে দু'জন ছিলেন আমার বহু পরিচিত বন্ধুজন। একজন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সিকান্দার আলী ইব্রাহিমী, অন্যজন অধ্যাপক সিরাজুল হক। অন্যরা হলেন এডভোকেট এ.বি.এম. নূরুল ইসলাম, আহমদ আব্দুল কাদের ও হাফেজ সুলতান আহমদ। তাঁদের পেয়েও আমি যেমন খুশী তাঁরাও তেমনি খুশী। দীর্ঘদিন পর দেখা তাই কথার আর শেষ নেই। পরের দিন তাঁদের ছয় জনকেই স্কুল দেখার আমন্ত্রণ জানালাম।

পরের দিন সকালে স্কুলের একটি মাইক্রোবাসে করে তাঁদেরকে স্কুলে নিয়ে এলাম। আমিও আমার অফিস থেকে ছুটি নিয়ে স্কুলে গিয়ে তাদেরকে নিয়ে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করলাম, ফটো তুললাম, নানা রকম আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলাম। আজরফ সাহেব সেদিন কী যে খুশী হয়েছিলেন, বিদেশে বাংলাদেশী স্কুল এবং বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী দেখে দীর্ঘ সময় তিনি স্কুলে কাটিয়ে দুপুর বেলা ফিরে গেলেন হোটেলে। বিকেলে আমিও আবার হোটেলে গেলাম। রাত এগারোটা অবধি সবার সঙ্গে গল্প-গুজব করে বিমানের গাড়ীতে তাঁদেরকে তুলে দিয়ে ফিরে এলাম বাসায়।

ইতোমধ্যে আমি দুবাইতে 'বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুল'কে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন, মাসিক সাহিত্য সভা ইত্যাদির আয়োজন করতে থাকি। ধীরে ধীরে ১৯৯০ সাল থেকে স্কুলে বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলন ও বাংলা পুস্তক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করি। এ উপলক্ষে প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে একজন বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিককে প্রধান অতিথি হিসাবে দাওয়াত দিয়ে এনে স্কুলের পক্ষ থেকে তাঁকে সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করি। প্রথম বছর প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদ। দ্বিতীয় বছর অর্থাৎ ১৯৯১ সনে প্রধান অতিথি হিসাবে দাওয়াত দেই দেশের শীর্ষ দার্শনিক, লেখক ও চিন্তাবিদ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফকে। তিনি আমাদের দাওয়াত সাগ্রহে কবুল করেছিলেন। কিন্তু সম্মেলনের কিছুদিন পূর্বে বাথরুমে পড়ে গিয়ে আঘাত পান। সে অবস্থায় তখন একাকী তাঁর পক্ষে চলাফেরা সম্ভব ছিল না। এজন্য তিনি সম্মেলনে যোগদানে অপারগতা প্রকাশ করে প্রধান অতিথির লিখিত ভাষণ পাঠান। সম্মেলনে তাঁর সে দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ ভাষণ পাঠ করে শুনানো হয়। সম্মেলনে দাওয়াত দিয়ে ১৮.১০.৯০ তারিখে তাঁকে যে পত্র লিখি তার জবাবে তিনি যে দরদপূর্ণ চিঠি লেখেন তা নিম্নরূপঃ

www.pathagar.com

"জনাব মতিউর রহমান,

সভাপতি বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুল, দুবাই ও সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি।

বা'আদ সালামে মসনুন আরজ এই যে, আপনার প্রেরিত ১৮.১০.৯০ইং তারিখের পত্র প্রায় ১০/১২ দিন পূর্বে হস্তগত হয়েছে। আপনার সঙ্গে দীর্ঘকাল নানা সাংস্কৃতিক সভা-সমিতিতে যোগদান করে এবং আপনার সরল ও মধুর ব্যবহারে আমি বহু দিন থেকে মুগ্ধ রয়েছি। আপনাদের দাওয়াতে আপনার ও আপনার স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব নূরুল আলম রইসী সাহেবের আন্তরিকতার পরিচয় পেয়ে বেশ সান্ত্বনা অনুভব করছি। বর্তমানে এরূপ আন্তরিকতা আমাদের সমাজে দুর্লভ। কৈশোর থেকেই নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। সেগুলোতে দানের মূল্য যৎকিঞ্চিৎ হলেও শ্রমের মূল্য কম ছিল না। সেগুলোর কোন স্বীকৃতি পাচ্ছিনে। আপনাদের দাওয়াতে সে স্বীকৃতি রয়েছে বলে আমি বিশেষভাবেই সন্তোষ লাভ করছি।

আপনাদের এ স্কুলের একটি ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। দুবাইয়ে এ স্কুলের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় তার মাধ্যমে দুবাই-এ বাংলা ভাষারও একটা স্থান হয়ে যেতে পারে। ভবিষ্যতে যদি বাংলা ভাষাভাষী লোকেরা দুবাইয়ে স্থায়ী বসতী করার সুযোগ ও সুবিধা পায় তাহলে সে দেশে বাংলা ভাষা প্রবর্তনের অগ্রপথিক রূপে আপনারা নন্দিত হবেন।

আপনাদের দাওয়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে আমার পক্ষে কয়েকটা প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছে। ১৯৮৮ সালে পা ফসকে পড়ে যাওয়ার পর থেকে আমি ডাঃ বদরুদ্দোজার চিকিৎসাধীনে দিন গুজরান করছি। তাঁর বিধান মত খাদ্য গ্রহণ করতে হয় এবং সাবধানে চলতে হয়। তা সত্ত্বেও জীবনযাত্রার প্রয়োজনে একজন সাথীকে নিয়ে ঢাকা শহরে রিকশা বা অন্য নানা যানবাহনে চলাফেরা করতে হয়। স্বাভাবিক শক্তিতে একাকী চলা এখন সম্ভবপর নয়। গত কয়েক দিন যাবত কোমরে ব্যথা দেখা দিয়েছে। এজন্য চলাফেরাতে বেশ কষ্ট হয়। এ জন্য আমার পক্ষে একাকী দুবাই পর্যন্ত যাওয়ার সাহস করা সম্ভবপর নয়। .....

আপনাদের এ অনুষ্ঠানের সাফল্য সর্বতোভাবে কামনা করে আল্লাহ সুবহানাতায়ালার কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করছি।

আপনাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছামুগ্ধ
মোহাম্মদ আজরফ
চামেলী বাগ
৩২৫/২ পূর্ব রামপুরা, টিভি রোড, ঢাকা-১২১৯
২০-১১-১৯৯০ইং

উপরোক্ত চিঠির জবাবে আমি যে চিঠি লিখেছিলাম তা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

"পরম শ্রদ্ধেয় দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

মোহতারাম,

আমার গভীর শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা নিবেন। আপনার চিঠি পাবার পরে উপসাগরীয় অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করায় আমাদের সমস্ত কর্মসূচী মুলতবী রাখতে হয় এবং এ কারণে আপনাকেও আর জবাব লেখা হয়ে উঠেনি। আপনার পত্র আমি এখানে সাহিত্য সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির বৈঠকে পড়ে শুনিয়েছি। ... আমাদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হলো নিম্নরূপ ঃ

১. এ বছরের সাহিত্য সম্মেলন দুবাই বাংলাদেশ স্কুলে ২৫শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ।

www.pathagar.com

২. সম্মেলন উপলক্ষে একটি পুস্তক প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।..

৩. সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হয় যে, এবারের সম্মেলনে আপনিই আমাদের প্রধান অতিথি থাকবেন। আপনার শারীরিক অবস্থার জন্য আমরা সকলেই দু:খিত এবং আল্লাহর দরবারে আপনার সুস্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করি। শারীরিক কারণে সশরীরে সম্মেলনে উপস্থিত হতে না পারলে সেমতাবস্থায় আপনার ভাষণ লিখে পাঠালে আমরা সেটা সম্মেলনে পড়ে শোনাব এবং সম্মেলন-পরবর্তী সাহিত্য সংকলনে তা যথাযোগ্যভাবে ইনশাল্লাহ ছাপানো হবে।

৪. সম্মেলনে পাঠ এবং সম্মেলন-পরবর্তী সংকলনে প্রকাশার্থে আপনার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠালে আমরা পরম কৃতার্থ হব।

৫. সম্মেলন উপলক্ষে আমরা প্রবাসী বাংলাদেশী কবি-সাহিত্যিকদের একটি জীবনপঞ্জী (Bibilography) প্রকাশের চেষ্টা করছি।

আপনার প্রত্যাশিত ভাষণ প্রবাসী কবি-সাহিত্যিকদের জন্য সবিশেষ অনুপ্রেরণাদায়ী হবে বলে আমরা গভীরভাবে আশাবাদী। সম্মেলনের বিস্তারিত খবর, সচিত্র বিবরণ সবকিছু ইনশাল্লাহ যথাসময়ে আপনার নিকট প্রেরণ করা হবে। সেই সাথে আরো কিছু সুখবর আশা করি আপনাকে দেয়া সম্ভব হবে। আমরা আপনার দোয়াপ্রার্থী। ইতি

আপনার প্রীতিধন্য
মুহম্মদ মতিউর রহমান
সভাপতি, বাংলা সাহিত্য সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি, দুবাই।"

স্বাস্থ্যগত কারণে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে দুবাই যেতে পারেননি। কিন্তু আমাদের অনুরোধে তিনি সুলিখিত ভাষণ ও জীবন-পঞ্জী লিখে পাঠিয়েছিলেন। সম্মেলনে তা পড়ে শোনানো হয় এবং সম্মেলন-পরবর্তী সংকলনে তা প্রকাশিত হয়। সে বছর 'বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুল, দুবাই-সাহিত্য পুরস্কার'ও তাঁকে প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। আমার উপরোক্ত পত্রে সেটারই আভাস ছিল। যেহেতু স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি দুবাই যেতে পারেননি তাই সে বছর জুলাই মাসে আমি ছুটিতে ঢাকায় এসে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান ও "বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুল, দুবাই, সাহিত্য পুরস্কার- ১৯৯১" প্রদান করি। অনুষ্ঠানে ঢাকার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেনঃ অধ্যাপক শাহেদ আলী, অধ্যাপক আব্দুল গফুর, অধ্যাপক আব্দুল মান্নান সৈয়দ, ব্যারিস্টার মোহাম্মদ কোরবান আলী, দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদক আবুল আসাদ, অধ্যাপক নূরুল আলম রইসী, কবি আসাদ বিন হাফিজ প্রমুখ। আজরফ সাহেব সেদিন যে দরদভরা জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিয়েছিলেন তা সকলের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে আমি তাঁর হাতে পুরস্কারের নগদ অর্থ ও সার্টিফিকেট তুলে দিয়েছিলাম। সে ছিল আমার জীবনের এক বিশেষ আনন্দের মূহূর্ত।

পরবর্তী বছর ১৭ জুলাই, ১৯৯২ তারিখে 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ' আমার সাহিত্য-কর্মের উপর এক আলোচনা ও সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে। অধ্যাপক শাহেদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। 'মুহম্মদ মতিউর রহমানের সাহিত্য সাধনা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক নূরুল আলম রইসী। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কবি আল মামুদ, কবি-সমালোচক

www.pathagar.com

আব্দুল মান্নান সৈয়দ, দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদক আবুল আসাদ, কথাশিল্পী মাহবুবুল হক, ইতিহাস-গবেষক মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, কবি আসাদ বিন হাফিজ, কবি হাসান আলীম প্রমুখ। প্রধান অতিথির ভাষণে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর স্বভাবসুলভ রসাল ভঙ্গীতে এভাবে শুরু করেনঃ

"আজ মতিউর রহমানকে সংবর্ধনা দেওয়া উপলক্ষে হঠাৎ করে আমার একটা ফার্সী কবিতা মনে পড়ে গেল - 'মুনপুরা হাজী...' অর্থাৎ আমি তোমাকে হাজী বলছি, তুমিও আমাকে হাজী বল। তারা কেউই হাজী ছিলেন না। এভাবে দু'জনেই হাজী বলে পরিচিত হয়ে গেলেন। তবে আমি হাজী কিনা সে সম্বন্ধে আমার মনে সংশয় আছে। কিন্তু মতিউর রহমান প্রকৃত হাজী। তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রকৃত সংবর্ধনার উপযুক্ত বলে আমি মনে করি।" তাঁর এ কথাগুলোর মধ্যে যে বিনয় ও ঔদার্য রয়েছে তাতে আমি গভীরভাবে অভিভূত হয়েছিলাম। তিনি প্রকৃতই একজন মহৎ সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। অন্যকে প্রাপ্যের চেয়েও অধিক সম্মান দিতেন। নিজেকে মনে করতেন অতিশয় নগণ্য। এটাই প্রকৃত মহত্ত্বের লক্ষণ। প্রকৃত মু'মিনের পরিচয়ও এটাই। উপরোক্ত বক্তব্যে তাঁর অনুরূপ মহত্ত্ব ও উদারতার পরিচয়ই ফুটে উঠেছে।

আমি দুবাই থাকতে প্রতি বছর একবার ছুটিতে দেশে আসতাম। দেশে এলে কোন না কোন অনুষ্ঠানে আজরফ সাহেবের সাথে দেখা হয়ে যেত। দেখা হলেই পরম আন্তরিকতার সাথে তিনি নানারূপ কুশল জিজ্ঞেস করতেন। তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ মিষ্টি ব্যবহারের ফলে তাঁকে পরম আত্মীয় বলে মনে হতো। একবার দেশে এসে স্নেহভাজন কবি মতিউর রহমান মল্লিকের নিকট কথা প্রসঙ্গে অন্যান্য অনেকের মধ্যে আজরফ সাহেব কেমন আছেন জানতে চাইতেই মল্লিক বললো, তাঁর শারীরিক অবস্থা বিশেষ ভাল নয়, আর্থিক কষ্টের মধ্যেও আছেন, পারলে দেখা করে আসুন।

আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম। পূর্বরামপুরার একটি ছোট বিল্ডিং-এর দোতলার পশ্চিম পাশের ছোট একটি কামরায় বই-পুস্তক-পাণ্ডুলিপিতে গাদাগাদি করা একটি বিছানার একপাশে তিনি শুয়ে আছেন। আমি গিয়ে ছালাম দিতেই তিনি হুড়মুড় করে উঠে বিছানার এক পাশে বসলেন, আরেক পাশে আমাকে বসতে দিলেন। কুশলাদি আদান-প্রদানের পর তিনি দুবাই ও আমার সম্পর্কে নানা কথা জানতে চাইলেন, তাঁর সম্পর্কেও নানা কথা জানালেন। বিদায়ের সময় তাঁর হাতে একটি লেফাফা তুলে দিলে তিনি উজ্জ্বল দুটি ঠোঁটে মিষ্টি হাসির প্রলেপ ছড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন 'ওতে কী আছে?' আমি খুব বিব্রত ভাবে বললাম, 'সামান্য কিছু টাকা আপনার ঔষধ-পথ্যের জন্য'। তিনি লেফাফা খুলে পাঁচশো টাকার কয়টি নোট তা গুণতে লাগলেন। তারপর নোটগুলো পুনরায় লেফাফায় ভরে সেটি বালিশের নীচে রেখে দিলেন। আমি ছালাম জানিয়ে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

সারা পথ মনে মনে ভাবলাম সোনার চামচ মুখে নিয়ে জমিদার ঘরে যাঁর জন্ম তিনি কত দীনহীন সামান্য অবস্থায় তাঁর বার্ধক্যের দিনগুলো অতিবাহিত করছেন। দেশের এত বড় একজন পণ্ডিত জ্ঞানের মহাসমুদ্র সন্তরণ করে যিনি আমাদের দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চিন্তার জগতকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন, যিনি শিক্ষকতা করে, বিভিন্ন সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করে জ্ঞানের সুদীপ্ত আলো বিস্তার করে গেছেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভা-সমিতিতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে যিনি দেশের মান-

www.pathagar.com

ইজ্জত-গৌরবকে উচ্চে তুলে ধরেছেন জাতি কতভাবেই না তাঁর নিকট ঋণী! কিন্তু তাঁর প্রতি আমাদের এ অশেষ ঋণ জাতি কখনো কোনভাবে পরিশোধের গরজ কি অনুভব করেছে? সাধারণ একটি ছোট কামরায় বই-পুস্তকে ঠাসাঠাসি করা বিছানার এক পাশে শোবার ব্যবস্থা, অভ্যাগতদেরকেও তারই একপাশে বসতে দেয়া, বিছানায় বসে হাঁটুর উপর খাতা-কলম নিয়ে অবিরাম লিখে যাওয়া, বিছানায় শুয়ে-বসে স্বল্পালোকে রাত-দিন জ্ঞান সাধনায় নিমগ্ন থাকা–তাঁর মত মহাসাধক নিরভিমানী মহাপণ্ডিতের পক্ষেই সম্ভব ছিল। তাঁর লেখাপড়া করার মত একটি টেবিল-চেয়ারও ছিল না, অভ্যাগতদের বসতে দেয়ার মত ঘরে কোন চেয়ারও ছিল না। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দেশের এ শীর্ষ দার্শনিক মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব পর্যন্তও রিকশায় চড়ে, কখনো কখনো কারো সাহায্যে চলাফেরা করে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে সভাপতি বা প্রধান অতিথির সম্মানীত আসন অলংকৃত করতেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দেশবাসী আমরা অজস্রভাবে তাঁর কাছ থেকে কেবল নিয়েইছি। তিনিও কখনো নিজের সম্পর্কে চিন্তা না করে এমন কি অসুখ-বিসুখ সত্ত্বেও অম্লান বদনে নিঃশেষে শুধু দিয়েই গেছেন। বিনিময়ে আমরা তাঁকে কতটুকু দিয়েছি, জাতি কি কখনো তা ভেবে দেখেছে? জাতির মহৎ ও কৃতী ব্যক্তিরা যখন এভাবে অবজ্ঞাত–অবহেলিত হয়, তখন সেই জাতির মধ্যে মহৎ ও কৃতী ব্যক্তিদের জন্ম হবে সে প্রত্যাশাই বা করি কীভাবে।

বিশ বছর প্রবাসে কাটিয়ে ১৯৯৭ সনের জানুয়ারীতে আমি দেশে ফিরে আসি। পরের বছর 'স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদ' আমাকে সভাপতি নির্বাচন করে। ঐ বছরই আমার প্রস্তাবক্রমে 'স্বদেশে'র পক্ষ থেকে দেশের চারজন বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিকে সংবর্ধনা ও স্বর্ণপদক প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সে অনুযায়ী ২৮ নভেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, কবি তালিম হোসেন, জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান ও বিশিষ্ট সাংবাদিক-লেখক সানাউল্লাহ নূরীকে সংবর্ধনা ও "স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদ পদক - ১৯৯৮" প্রদান করা হয়। বাকরুদ্ধ কবি তালিম হোসেন রোগশয্যায় শায়িত থাকার কারণে তাঁর পক্ষ থেকে তদ্বীয় জ্যৈষ্ঠ কন্যা বিশিষ্ট নজরুল-সঙ্গীত শিল্পী শবনব মুশতারী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে পদক গ্রহণ করেন। বাকি তিনজন সশরীরে উপস্থিত হয়ে উদ্দীপনাময়ী জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান এবং পদক গ্রহণ করেছিলেন। 'স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদে'র সভাপতি এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে সেদিন সবাইর হাতে আমার পদক তুলে দেবার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল।

২৫ অক্টোবর ছিল দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ৯৪তম জন্মদিন। এর এক মাস আগেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, 'স্বদেশে'র পক্ষ থেকে ঐ দিন আমরা তাঁর বাসায় গিয়ে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করবো। সে অনুযায়ী ২৫ অক্টোবর, ১৯৯৯ আমি, স্বদেশের প্রধান সম্পাদক মুহম্মদ আবদুল হান্নান, সাংগঠনিক সম্পাদক এস. এম. আব্দুর রাজ্জাক, নির্বাহী সদস্য মাহবুবুর রহমান বুলবুল, কামরুন নাহার শিউলি, সিরাজগঞ্জের সাংবাদিক আব্দুস সামাদ জেহাদী সকাল নয়টায় মৌচাক মার্কেটে একত্র হই। সেখান থেকে আমরা একটি ফুলের তোড়া ও কেক সংগ্রহ করি। তারপর একযোগে আমরা ৩২৫/২ পূর্ব রামপুরা আজরফ সাহেবের বাসায় রওয়ানা হই। সেখানে গিয়ে দেখলাম তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন। আমাদের আগেই 'তমদ্দুন মজলিশে'র কয়েকজন কর্মী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি বাসা থেকে ক্যামেরা নিয়ে গিয়েছিলাম। তাঁকে বিছানায় বসিয়ে তাঁর দুই পাশে বসে বেশ কয়েকটি ফটো তোলা হলো। তিনি আমাকে কাছে

www.pathagar.com

বসিয়ে কথা বললেন। তখনো তাঁর কথা ছিল স্পষ্ট, স্মৃতিশক্তি ছিল তীক্ষ্ণ আর মুখে ছিল মোলায়েম স্নিগ্ধ হাসি। শিশুর মত সুন্দর নিষ্কলুষ বিনয়ীমুখ। উজ্জ্বল সুন্দর চেহারা। প্রথম দর্শনেই তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমে মাথা নুয়ে আসে। সেদিনও তেমনি হয়েছিল। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হলো গত কয়েক দিন যাবত তাঁর শারীরিক অবস্থা একটু খারাপ হয়ে গেছে। বিছানা থেকে তিনি প্রায় উঠতেই পারেন না। তিনি আমাকে কাছে ডেকে একে একে আমার সম্পর্কে, আমার পরিবারের কুশল জিজ্ঞেস করে দুবাইর কথা, দুবাইর স্কুলের কথা জিজ্ঞেস করে সবশেষে আমার হাত তাঁর হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন ঃ "আমার যাবার সময় হয়ে গেছে, আমার জন্য দোয়া করবেন।"

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ৯৪তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে লেখক তার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেন

তাঁর কথা শুনে আমি উদ্বেলিত হলাম। উপস্থিত সকলের মুখেই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। তাঁর শরীর তখন বিছানায় নেতিয়ে পড়লেও কণ্ঠস্বর ছিল অনুচ্চ কিন্তু স্পষ্ট। মনে হলো, তিনি তাঁর অন্তরে মহান প্রভুর ডাক শুনতে পেয়েছেন এবং তিনি তা আমাদের জানিয়ে দিলেন। আমি হতবিহ্বল চিত্তে তাঁর নির্দেশে মহান প্রভুর দরবারে হাত তুললাম। উপস্থিত সকলেই আমার সাথে হাত তুললেন। শোয়া অবস্থায় আজরফ সাহেবও হাত তুললেন। প্রাণ খুলে আল্লাহর দরবারে তাঁর জন্য আমরা সবাই দোয়া করলাম।

বিদায়ের আগে তাঁর হাতে সবিনয়ে একটি লেফাফা গুঁজে দিয়ে বললাম, আপনার ঔষধ-পথ্যের জন্য সামান্য ক'টি টাকা। তিনি স্মিত বদনে লেফাফা খুলে পাঁচশো টাকার দু'টি নোট সবাইকে দেখিয়ে আবার লেফাফায় পুরে তা বালিশের নীচে রাখলেন। একটা করুণ বিষণ্ন ছায়া ছোট্ট অপ্রশস্ত কামরার নির্বাক থমথমে আবহাওয়াকে তখন মলিন ব্যথাতুর করে তুলেছিল। সকলের চোখে-মুখেই বিদায়ের সকরুণ আর্তি।

পরের দিন অর্থাৎ ২৬ অক্টোবর পত্রিকা মারফত জানলাম, তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায় তাঁকে বারডেমে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে দিন দিন তাঁর অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। অবশেষে ২ নভেম্বর, ১৯৯৯ তাঁর ইন্তিকালের খবর এল। সেদিন বায়তুল মুকাররমে গিয়ে জোহরের নামায পড়লাম। নামায-শেষে জানাযার নামায। প্রাণভরে তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করলাম। জানাযা-শেষে শেষ বারের মতো তাঁর মুখ দর্শন করলাম। সেই সৌমকান্তি সুন্দর চেহারা। মাত্র কয়েকদিন আগেই নিজ বাসায় যিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। মৃত্যুর কালো হাত আজ তাঁকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তাঁর মহান প্রভুর অমীয় সুন্দর ভুবনে। আল্লাহ তাঁর আত্মার মাগফিরাত দান করুন।

www.pathagar.com

আমার স্মৃতিতে ফররুখ

আমার জন্ম সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার চর বেলতৈল গ্রামে একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী দরিদ্র শিক্ষিত মুসলিম পরিবারে। ছায়া-ঢাকা, পাখি-ডাকা, নির্ভৃত এক পল্লীতে কেটেছে আমার শৈশব। বাড়ির সামনে এক বিশাল চৌচালা টিনের ঘরে ছিল এক ঐতিহ্যবাহী বালিকা বিদ্যালয় (১৮৯২ সনে প্রতিষ্ঠিত)। আমার দাদার বড় ভাই মুনশী জহির উদ্দীন পণ্ডিত ছিলেন বালিকা বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা। মুনশী জহির উদ্দীন বিয়ে করেছিলেন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্নের একমাত্র বোন নূরজাহানকে। আমাদের বাড়ির ঠিক উত্তর পাশের বাড়িটিই ছিল নজিবর রহমানের। ১৮৯৪ সন থেকে আমার দাদা মুনশী ওয়াহেদ আলী পণ্ডিত বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক এবং এর কিছুদিন পর থেকে আমার দাদী মোছাম্মৎ রমিছা খাতুন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তাঁরা উভয়ে ১৯৫২ সন পর্যন্ত উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে অতঃপর একসঙ্গে অবসর গ্রহণ করেন। আমাদের বাড়ির পূর্ব পাশে আমার চাচার বাড়িতে ছিল ছেলেদের জন্য আরেকটি বিদ্যালয়, তাতে প্রধান শিক্ষক ছিলেন আমার আব্বা মরহুম আবু মুহম্মদ গোলাম রববানী এবং সহকারী শিক্ষক আমার চাচা মুনশী শফিউদ্দীন পণ্ডিত। বাড়ির পশ্চিম পাশে অবস্থিত মসজিদে ইমামতি করতেন আমার আরেক চাচা দানেশ মুনশী। খুব ভোরে দানেশ চাচা এক হাতে লাঠি এবং অন্য হাতে লণ্ঠন নিয়ে গলা খাকাড়ি দিতে দিতে মসজিদে গিয়ে সুরেলা কণ্ঠে আযান দিতেন। সুবেহ্ সাদেকে পাখির কিচির মিচির শব্দের সাথে সে আযানের দরাজ আওয়াজ ভেসে যেত বহু দূর পল্লীর নিস্তব্ধ, নীরব, শান্ত মেঠো পথে।

এ রকম একটি স্বপ্নাচ্ছন্ন রোমান্টিক পরিবেশে আমার ঘুম ভাঙতো। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির প্রাঙ্গনে পাশাপাশি দুই বিদ্যালয়ে আর এক ধরনের কোলাহল শুরু হতো। সকাল দশটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত চলতো সে কোলাহলের রেশ। স্কুলে যাবার সময় কখনো আমার দাদী, কখনো বড় বোন আবার কখনো ফুফু আমাকে কোলে করে স্কুলে নিয়ে যেতেন। সারা দিন শিক্ষার্থী মেয়েদের কোলে-কাখে পরম আদরে-স্নেহে সময়টা অতিবাহিত হতো। একটু বড় হওয়ার পর আমার আব্বা হাত ধরে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন পাশের বাড়ির ছেলেদের স্কুলে। সেখানেই আমার পড়াশোনার হাতে খড়ি। এমনি এক সৃজনশীল পবিত্র মনোরম পরিবেশে কেটেছে আমার স্বপ্নমুগ্ধ শৈশবের রোমাঞ্চকর দিনগুলো।

www.pathagar.com

আমার আব্বা পেশায় ছিলেন শিক্ষক। মননে-রুচিতে ছিলেন একজন সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবী। নিজে গান লিখে, নিজেই সুর দিয়ে দরাজকণ্ঠে তা গাইতেন। একটি উপন্যাস লেখাও শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। আমাকে একবার তাঁর পাণ্ডুলিপি দেখিয়েছিলেন, পরম যত্নে তিনি তাঁর টিনের বড় বাক্সে তা আটকে রাখতেন। দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনে সেটা আর কখনো শেষ করতে পারেন নি। ঘরে 'মাসিক মোহাম্মদী' ও আরো কিছু পত্রিকা আসতো সবগুলোর নাম এখন আর মনে নেই। আব্বা একা, কখনো অন্যদের সাথে একত্রে বসে সেগুলো পাঠ করতেন। গ্রামের শিক্ষিত লোকদের প্রায় নিয়মিত একটা আড্ডা বসতো আমাদের বাড়িতে, আব্বাকে ঘিরে, আমি মাঝে-মধ্যে তার আশেপাশে ঘুরঘুর করতাম শৈশবকাল থেকে।

আজো স্পষ্ট মনে পড়ে, শীতকালে দীর্ঘ রাত্রিতে শেষ রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলেও বাইরে প্রচন্ড ঠান্ডা বলে আব্বা আমাদেরকে বাইরে বের হতে দিতেন না। তাঁর লোমশ উষ্ণ বুকের মাঝে নিবিড়ভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রায়ই কবি কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামী গযল গাইতেন। 'দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে দ্বীন ইসলামী লাল মশাল', অথবা 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে' ইত্যাদি নানা প্রাণ-মাতানো গান। আমি তন্ময় হয়ে শুনতাম–এক অপূর্ব ভাব ও উদ্দীপনায় আমার মন উদ্দীপ্ত হতো।

শৈশবে এ গানের মাধ্যমেই নজরুলের সাথে আমার প্রথম পরিচয়। একটু বড় হয়ে স্কুলে গিয়ে নজরুলের 'খোকার সাধ', 'কাঠ বিড়ালী', 'লিচুচোর' ইত্যাদি কবিতার মাধ্যমে তাঁকে আরো চেনার সুযোগ হয়েছে। পরবর্তীকালে হাইস্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুলকে যত পড়েছি, তত ভাল লেগেছে। কিন্তু সেই ছোটবেলায় আমার আব্বার গাওয়া নজরুল ইসলামের ইসলামী গযলের মাধ্যমে তাঁকে যেভাবে চিনেছিলাম, সে চেনাটাই আমার কাছে সর্বদা বড় হয়ে থাকলো। সেই শৈশবে আমার কচি-মনে নজরুলের যে আসন রচিত হলো, কালক্রমে তা আরো দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে।

ফররুখ আহমদের কবিতার সাথে পরিচয় ঘটেছে আরো পরে। ১৯৫৪ সনে ক্লাস নাইনে পড়ার সময় ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতাটি প্রথম পড়ার সুযোগ হয়। সেটা ছিলো পুরা কবিতাটির একটি সংক্ষিপ্ত আকার। একবার পড়ে আবার পড়তে ইচ্ছে হয়। বার বার পড়ে মনে এক অপূর্ব ভাবাবেগের সৃষ্টি হলো। আমার প্রিয় কবি নজরুলের মতোই মনে হলো ফররুখকে। ভাবের দিক থেকে প্রায় একই রকম কিন্তু প্রকাশভঙ্গি ও ব্যঞ্জনার দিক থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। নজরুল গোত্রের হয়েও যেন নজরুল থেকে কিছুটা আলাদা। ঐদিন থেকেই ফররুখের প্রতি আমার গভীর অনুরাগ ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়। নজরুল-ফররুখ কাননের দুই পুষ্পিত গোলাপের সৌরভে আমার মানস-জগত হৃষ্ট-পুষ্ট-আমোদিত সেই শৈশব-কৈশোরের কাল থেকেই।

ফররুখ আহমদের (জন্ম ঃ ১০ জুন, ১৯১৮, মৃত্যু ঃ ১৯ অক্টোবর, ১৯৭৪) সাথে ব্যক্তিগত পরিচয় ঘটেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দী পেরিয়ে। ১৯৬২ সনে আমি সিদ্ধেশ্বরী কলেজে (বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ) বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করি। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু নূরুল আলম রইসীর (বর্তমানে সপরিবারে নিউ ইয়র্কে বসবাসরত) তখনো এম .এ. পরীক্ষা শেষ হয়নি; কিন্তু আর্থিক কারণে সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুলে মনিং শিফ্‌টে সে তখন শিক্ষকতা করে। কবি ফররুখ আহমদের ছেলেরা ওখানে তার ছাত্র ছিল। সে সূত্রে ফররুখ আহমদের বাসায় গিয়েও সে পরিচয় করে এসেছে। ছেলেদের শিক্ষক হিসাবে

www.pathagar.com

কবি সাহেব তাকে 'মাস্টার সাহেব' বলেই সম্বোধন করতেন এবং কদরও করতেন।

রইসীর সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৫৭ সনে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে। আমি তখন আই.এ. দ্বিতীয় বর্ষে, ও তখন মাদ্রাসায় আলিম, ফাজিল পাশ করে, ম্যাট্রিক পাশ করে আই.এ. প্রথম বর্ষে এসে ভর্তি হয়। একদিন কলেজের বিতর্কানুষ্ঠানে কালো মত, মুখে চাপ দাড়িবিশিষ্ট দোহারা চেহারার এক নবাগত ছাত্রের বক্তৃতা শুনে আমি কিছুটা বিস্মিত হই। পুরনো ঝানু কোন ছাত্র নয়, একেবারে আনকোরা নতুন, মাত্র প্রথম বর্ষের ছাত্র, অথচ চমৎকার সাবলীল যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা। কিছুটা ঈর্ষাও বোধ করি। সেই রইসীর সঙ্গে অচিরেই খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ঐ সময়ই ও খুব ভাল কবিতা লিখতো। ওর প্রতিভা অনুযায়ী, আমার ধারণা, এতদিনে ওর যথেষ্ট কবি-খ্যাতি অর্জিত হওয়া উচিত ছিল। আমরা এক সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা, ছাত্র-সংগঠনের নেতৃত্ব দান ইত্যাদি কাজে পরস্পর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ি।

সে ১৯৬৩ সনের কথা। রইসী একদিন আমাকে কবির বাসায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব দেয়ায় আমি উৎফুল্ল হলাম। কবির সাথে ওর পরিচয় ছিল তা জানতাম না। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলাম। আমার প্রিয় অত বড় কবির সাথে অত সহজে পরিচয় হবে সেটা ছিল আমার নিকট অকল্পনীয়। রোমাঞ্চ-পুলকে অভিভূত মন নিয়ে বন্ধু রইসীর সাথে কথা বলতে বলতে পায়ে হেঁটেই কবির মালীবাগের বাসায় গিয়ে হাজির হলাম।

একটি সংকীর্ণ গলির মধ্যে চৌচালা টিনের ঘর। ঘরের সামনের দিকটায় মুলি বাঁশের ঘেরা দিয়ে বৈঠকখানা তৈরি করা হয়েছে। প্রায় দশ/বার জনের বিশাল পরিবার নিয়ে কবি সেই একটি মাত্র টিনের ঘরেই গাদাগাদি করে বসবাস করেন, অবিশ্বাস্য সব কবিতা লেখেন, ঢাকা রেডিও'র জন্য গান রচনা করেন। মালীবাগে তখনো তেমন দালান-কোঠা ওঠেনি, মাঝে-মাঝে দু'একটি পুকুর, গাছপালা ও ছোট ছোট বাড়ি-ঘর। ছায়া-মেদুর সংকীর্ণ গলিপথ। পায়ে-চলা লোকের সংখ্যাই বেশি, অল্পসংখ্যক রিক্‌শাও চোখে পড়তো। তবে গাড়ি তখনো সেখানে তেমন একটা স্থান করে নিতে পারেনি। অনেকটা গ্রাম্য গ্রাম্য ভাব।

কবির বড় ছেলে মাহমুদ লাজুক লাজুক ভঙ্গীতে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বৈঠকখানায় নিয়ে বসালো। খবর পাওয়ার সাথে সাথেই কবি এসে সালাম দিয়ে দাঁড়ালেন আমাদের সামনে। আমরাও সম্মোহিতের মত দাঁড়িয়ে তাঁর সালামের জবাব দিয়ে তাঁর সাথে পরম ভক্তিভরে মোসাহিবা করলাম। কবি আমাদেরকে বসতে বলে নিজেও একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। লাল টক্‌টকে সূর্যকান্তি চেহারা, 'হেরার রাজ তোরণে'র বেহেশতী রোশ্‌নী যেন ঠিক্‌রে পড়ছে তাঁর চেহারায়। ঝাক্‌ড়া মাথাভরা বাব্‌রি চুল- দুরন্ত বৈশাখী ঝড় যেন খেলা করছে, কবির কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তা নেচে উঠছে। চোখ থেকে যেন স্নিগ্ধ জ্যোতি ঠিক্‌রে পড়ছে, তীক্ষ্ণ-ক্ষুরধার সে দৃষ্টির সামনে চোখ তুলে তাকানো কঠিন। 'সাত সাগরের' সিন্দাবাদ মাঝির মত যেন জীবন-যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত, কিন্তু নির্ভীক 'সিন্ধু-ঈগলে'র ন্যায় 'সমুদ্র-নীল ঝড়ে' 'রাত পোহাবার' অধীর প্রতীক্ষায় 'দীর্ঘ রাত্র একা জেগে' থাকা এক দৃঢ়-সংকল্পবদ্ধ দুঃসাহসী নাবিক।

বন্ধু রইসী আমাকে কবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করি, উপরন্তু, কিছু কিছু লেখালেখি করি শুনে মনে হলো, কবি কিছুটা খুশীই হলেন। অনেকক্ষণ কথা হলো কবির সঙ্গে। বরং বলা চলে, কবি একাই বলে গেলেন আর আমরা

www.pathagar.com

দু'জন মুগ্ধ শ্রোতার মত কেবল মাঝে মাঝে হাঁ-হু বলে মাথা নাড়ানাড়ি করলাম আর কি! কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে তিনি সামনে রাখা বাটা থেকে এক সাথে দু'তিনটা পান তুলে মুখে পুরতে লাগলেন। কবির রক্তিম অধর দু'টি পানের রক্তিম বর্ণে রঞ্জিত হয়ে এক অপূর্ব লালিমার সৃষ্টি করলো। পান খাওয়ার মধ্যে অত তৃপ্তি ও আনন্দ থাকতে পারে, কবির পান খাওয়া না দেখলে হয়ত বিশ্বাস করাই কঠিন। শুনেছি, কবি নজরুলও ঐ রকম পান খেতেন। তবে সেটা তো আর চোখে দেখিনি। কবির মত শাহী হালতে পান খেতে দেখেছি আর এক মহামনীষীকে-তিনি হলেন বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ, ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী নেতা সৈয়দ আবুল আলা মওদূদী (রহ)। তিনি শুধু পান খেতেন না, পান খাওয়াটা যেন তাঁর কাছে ছিল এক সৌখিন, সুঘ্রাণপূর্ণ আর্ট।

কথা বলতে বলতে চা-নাস্তা এসে গেল। আমরা তার সদ্ব্যবহার শুরু করলাম। কবির আলোচনা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে প্রবেশ করছিল। বেশির ভাগ আলোচনাই ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক। কিন্তু কবি নিজের সম্পর্কে কিছুই বললেন না। এমনকি, তাঁর লেখা সম্পর্কেও না। বুঝলাম, অযাচিতভাবে নিজের ঢাক পিটাতে কবি অভ্যস্থ নন। আলোচনা থেকে আরো বুঝতে পারলাম, কবি তাঁর বিশ্বাস, ইতিহাস-ঐতিহ্য, নিজের পরিপার্শ্ব, সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। অতীতের দিকে মুখ করে পড়ে থাকা গোঁড়া বিশ্বাসী বলে তাঁকে আদৌ মনে হলো না। মন-মননে, শিল্প-ভাবনা এবং রুচিতে তাঁকে একজন আধুনিক মানুষ বলেই প্রতীয়মান হলো। তবে আলোচনার মধ্যে তাঁকে বেশ আবেগতাড়িত হতে দেখেছি। কথার মধ্যে তাঁর দৃঢ় প্রতীতি ও স্বপ্নাচ্ছন্নতার ভাব ছিল বেশ স্পষ্ট। তিনি যা বিশ্বাস করতেন, তাঁর আচার-আচরণ ও কথায় তারই প্রতিফলন ঘটতো। কবি তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করার বড় একটা অবকাশ কাউকে দিতেন না। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কবি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরাপোষ। ফলে কবির ভক্তের সংখ্যা অসংখ্য হলেও বন্ধুর সংখ্যা ছিল নেহায়েতই কম।

এরপরও বেশ কয়েকবার কবির মালীবাগের বাসায় গেছি। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমার নিজের সংকোচ কাটিয়ে কবির সাথে তখনও তেমন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারিনি। ভক্তের নির্দ্বন্দ্ব, আতিশর্যপূর্ণ মন নিয়েই তাঁকে কেবল প্রত্যক্ষ করতাম। বাহ্যিকভাবে কিছুটা দুরত্ব থাকলেও মনের দিক থেকে ততদিনে একটা নিবিড় অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।

মাঝখানে বেশ কিছুদিন কবির সঙ্গে কোন যোগাযোগ রক্ষা করতে পারিনি। একদিন কবি নিজেই খবর পাঠালেন ঢাকা রেডিওতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য। সে ১৯৬৫ সনের কথা। পাক-ভারতের যুদ্ধ তখন শেষ হয়ে গেছে। শুনেছি, যুদ্ধের কয়দিন নাকি কবি বেতার কেন্দ্রে দেশাত্মবোধক ও ইসলামী জাগরণমূলক বিভিন্ন গান রচনা ও বিভিন্ন প্রোগ্রাম তৈরিতে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, তাঁর গোসল-খাওয়া-বিশ্রামেরও কোন সময় ছিল না। প্রায়ই তিনি রেডিও অফিসেই রাত্রি-যাপন করতেন। সৈন্যরা রণাঙ্গনে এবং দেশপ্রেমিক, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার জীবন্ত প্রতীক কবি ফররুখ আহমদ রেডিওর মাধ্যমে (টিভি তখনও চালু হয়নি) ইসলাম ও মুসলমানের চির দুশমন পৌত্তলিক ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এমন জাতিগত, আদর্শগত দেশ-প্রেমিক কবি পৃথিবীতে কয়জন আছেন?

www.pathagar.com

১৯৬৫-এর সেপ্টেম্বর যুদ্ধে সমগ্র পাকিস্তানী জাতি শিশা-ঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। ছাত্র-শিক্ষক, চাকুরীজীবী, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্য-সংস্কৃতিসেবী, রাজনীতিবিদ, কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী সকল শ্রেণীর মানুষ ইসলাম ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক নজীরবিহীন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। জনগণের এ ঐক্যবদ্ধ সচেতন প্রয়াসের কারণেই যুদ্ধাবস্থায়ও জিনিসপত্রের অভাব ঘটেনি, মূল্য বৃদ্ধিও হয়নি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এতটুকু অবনতি ঘটেনি, পাড়ায়-পাড়ায়-মহল্লায় জনগণ বিশেষতঃ যুবকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে টহল দিয়েছে– চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি-ছিনতাই-ধর্ষণ ইত্যাদি বিশৃঙ্খল অবস্থার যাতে সৃষ্টি না হয় সে ব্যাপারে সকলে সতর্ক থেকেছে। পুলিশ বা নিরাপত্তা বাহিনীকে এ ব্যাপারে মোটেও ভাবতে হয়নি। বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় ব্লাক আউট হয়েছে, অন্ধকারে সব একাকার হয়ে গেছে, কর্তৃপক্ষ সাইরেন বাজিয়ে জনগণকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবার ঘোষণা দিয়েছে– অথচ সাইরেনের শব্দ শোনার সাথে সাথে দলে দলে লোকেরা বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়-ছাদে-প্রকাশ্য স্থানে, গগন-বিদারী 'আল্লাহু আকবর', 'নারায়ে তকবীর' ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধের অমিত প্রত্যয় ঘোষণা করেছে। নিখাদ দেশপ্রেম ও ইসলামের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছিল। একমাত্র এ দেশপ্রেম ও ইসলাম-নিষ্ঠার মাধ্যমেই আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, আত্মমর্যাদা রক্ষা, সামাজিক সকল সমস্যার সমাধান ও জাতীয় উন্নতি-অগ্রগতির পথ অবারিত-সুনিশ্চিত হতে পারে। এছাড়া, অন্য কোন পথে আমাদের মুক্তি নেই। আজকের এ সন্ত্রাসপূর্ণ, অরাজক পরিস্থিতিতে দেশের নেতারা যত তাড়াতাড়ি সেটা উপলব্ধি করেন, ততই মঙ্গল।

সেপ্টেম্বর যুদ্ধের অগ্নি-ঝরা দিনগুলোতেই কবি আমাকে লোক-মারফত খবর পাঠিয়েছিলেন রেডিও-প্রোগ্রামের মাধ্যমে তাঁর নেতৃত্বাধীন কলমী জেহাদে শামিল হওয়ার জন্য। আমি তখন মাস চারেকের জন্য করটিয়া সা'দত কলেজে অধ্যাপক হয়ে গিয়েছিলাম। তাই খবরটা পেতে আমার দেরী হয়। যুদ্ধের পরেই রেডিও অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। সাক্ষাতমাত্র কবি যেন রোষে একেবারে ফেটে পড়লেন ঃ 'কোথায় ছিলেন যুদ্ধের সময়!' দেশ এবং জাতির এরূপ বিপদের সময় কেউ এমন দূরে থাকে? কত খ্যাত-অখ্যাত লোক এল, তাদের দিয়ে প্রোগ্রাম করালাম, আপনাকে খবর দিয়েও পেলাম না।" আমি অনেকটা হতবাক হয়ে গেলাম। অমন আপনজনের মত দরদপূর্ণ গালাগাল শুনতে ভালই লাগছিল। অল্পক্ষণ পরেই উনি স্বাভাবিক হয়ে এলেন।

কবি তখন রেডিওর স্টাফ আর্টিস্ট হিসাবে কর্মরত। ছোট চাকরী। কিন্তু তাঁর তেজস্বী ব্যক্তিত্ব ও কবি হিসাবে তাঁর অসামান্য মর্যাদার জন্য পরিচালক পর্যন্ত সকলেই তাঁকে বিশেষ সমীহ করতেন, শ্রদ্ধাও করতেন সকলে। তিনি কাজ করতেন অনেকটা স্বাধীনভাবে। তিনি কখনো কাউকে তোয়াজ করতেন না, তোয়াজ করা তাঁর ধাতে ছিল না। অন্যরাই বরং সাধ্যমত তাঁকে তোয়াজ করে চলতো। তবে তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষী, কারো অযথা তোয়াজ তিনি কখনো পছন্দ করতেন না– তোষামোদ তো নয়ই।

সামান্য স্টাফ আর্টিস্ট হলেও সেপ্টেম্বর যুদ্ধের সময় শুনেছি, তিনি ঢাকা রেডিওর প্রাণশক্তি হিসাবে কাজ করেছেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিচালকসহ অন্যান্য অফিসাররাও প্রায়ই তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং তাঁর মতামতকে যথাযথ গুরুত্ব

www.pathagar.com

দিতেন। ফলে তিনি তখন বেশ দাপটের সাথেই সেখানে কাজ করেছেন। তাছাড়া, যেহেতু তাঁর কাজের পেছনে ব্যক্তিগত কোন লোভ-লালসা বা স্বার্থ-চিন্তা ছিল না, দেশপ্রেম, ইসলামী আদর্শ ও জাতিগত স্বার্থই ছিল তাঁর সকল কাজ ও উদ্দীপনার উৎস। তাই অতীব নিষ্ঠার সাথে মিশনারী জীল্ নিয়ে তিনি তাঁর কাজ করেছেন– পর্যাপ্ত অর্থ, পদোন্নতি বা অন্য কোন লোভ দেখিয়ে তাঁকে দিয়ে কখনো তা করানো সম্ভব ছিল না। অন্যদের জন্য যা ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কবির জন্য সেটাই ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা, অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য ছিল এখানেই।

রেডিওতে কবির বসার নির্দিষ্ট কোন কক্ষ বা অফিস ছিল না। যেখানে যখন খুশি কবি বসে পড়তেন। তবে আমি যতদিন রেডিওতে গেছি, কবিকে সাধারণতঃ কবি হেমায়েত হোসেনের অফিস-কক্ষেই বসতে দেখেছি। যে পয়ষট্টি সনের কথা বলছি, তখন হেমায়েত সাহেব ছিলেন প্রোগ্রাম প্রডিউসর। পরবর্তীতে তিনি রংপুর আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্রে পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে অপরিণত বয়সেই ইন্তিকাল করেন। হেমায়েত নিজেও ছিলেন কবি ও গীতিকার। ফররুখ আহমদকে তিনি অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন। পদ-মর্যাদায় হেমায়েত হোসেন বড় হলেও কবির সঙ্গে ব্যবহারে মনে হয়েছে গুরু-শিষ্য বা ছোট ভাই-বড় ভাইয়ের মতই।

রেডিওতে কবির সাথে আমার প্রথম সাক্ষাতের দিনও কবি হেমায়েত হোসেনের রুমেই বসা ছিলেন। উত্তেজনা প্রশমিত হবার পর কবি হেমায়েত হোসেনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে এক রকম হুকুমের সুরেই তাঁকে বললেন আমাকে একটি প্রোগ্রাম দেয়ার জন্য। শিডিউল দেখে কবির সঙ্গে পরামর্শ করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উপর দশ মিনিটের একটি টক্ দেয়া হলো আমাকে। এরপর থেকে আমি প্রতি মাসেই রেডিওতে মাসে নিয়মিত দুটো করে প্রোগ্রাম পেয়ে এসেছি। ১৯৭১ সনের সেপ্টেম্বরে আমাকে একটি টক্ দেয়ার পর দেশের গোলযোগপূর্ণ অবস্থার প্রেক্ষিতে আমি সে টক্ নিতে অস্বীকার করা পর্যন্ত নিয়মিতভাবেই রেডিও প্রোগ্রাম চালিয়ে আসছিলাম।

সম্পূর্ণ অযাচিত ও অপ্রত্যাশিতভাবে কবির মাধ্যমে রেডিওর প্রোগ্রাম পাওয়ায় আমি যেমন আনন্দবোধ করলাম তেমনি ব্যক্তিগতভাবে কবির প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ করলাম। ওর পর থেকে মাসে অন্ততঃ দু'একবার রেডিও অফিসেই কবির সাথে দেখা হতো। তিনি নানা প্রসঙ্গ নিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে আলোচনা করতেন, চা-সিঙ্গারা-বিস্কুট কখনো বা সন্দেশ খাওয়াতেন। কবির সঙ্গে যারাই দেখা করতে আসতেন, তারাই ওভাবে আপ্যায়িত হতেন। অমন আন্তরিকতা ও উদার আতিথেয়তা দেখে রীতিমত মুগ্ধ হতাম। তাঁর প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ আরো বেড়ে যেত। অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রে কবির মধ্যে কখনো শত্রু-মিত্র জ্ঞান লক্ষ্য করিনি। শুধুমাত্র আপ্যায়নের লোভে অনেকে অযথা কবির সঙ্গে দেখা করতে আসতো, বুঝতে পারতাম।

এভাবে ক্রমান্বয়ে কবির প্রতি আকর্ষণ প্রবল থেকে প্রবলতর হলো। রেডিও অফিস ছাড়াও মাঝে-মধ্যে তাঁর বাসায়ও যাতায়াত শুরু করলাম। ততদিনে কবি অবশ্য ইস্কাটন গার্ডেনে সরকারী ভবনে একটি ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠেছেন। ইস্কাটন গার্ডেন থেকে শাহবাগস্থ রেডিও অফিস কাছেই। কবির অফিসে যাতায়াত অনেকটা সহজ হলো। কবি সর্বদা পায়ে হেঁটেই অফিসে যাতায়াত করতেন। গ্রীষ্ম-বর্ষায় একটা ছাতাই ছিল ভরসা। লম্বা

www.pathagar.com

শেরওয়ানী পরে পান চিবাতে চিবাতে ছাতা মাথায় সেই অবিস্মরণীয় ঋজু চেহারার অসাধারণ কবি তাঁর পরিচিত পথ ধরে প্রতিদিন নিয়মিত যাতায়াত করতেন অফিসে। রেডিও অফিসই ছিল তাঁর কাছে সব কিছু। ছোট চাকরী, বিশাল পরিবার নিয়ে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করেছেন। কিন্তু বড় চাকরী, নানা আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধার অফার পেয়েও তিনি তা নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেছেন।

১৯৬৯ সনের ডিসেম্বর মাসে আমি নতুন প্রকাশিতব্য 'দৈনিক সংগ্রামে' সাহিত্য-সম্পাদক হিসাবে যোগদান করি। সিদ্ধেশ্বরী কলেজে অধ্যাপনা করেও এ দায়িত্ব পালনে কোন অসুবিধা ছিল না। পত্রিকার সাহিত্য বিভাগ ছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অকেশনে বিশেষ সংখ্যাগুলো বের করার দায়িত্ব ছিল আমার উপর। পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৭০ সনের ১৭ জানুয়ারী। উদ্বোধনী সংখ্যার সাথে ষোল পৃষ্ঠার একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। নিয়মিত সংখ্যার জন্য একদল নিবেদিতপ্রাণ সাংবাদিক ছিল, যাঁদের মধ্যে নবীন-অনভিজ্ঞ তরুণের সংখ্যাই ছিল বেশি। তবে তারা ছিল কমিটেট। কিন্তু ষোল পৃষ্ঠার বিশেষ সংখ্যার দায়িত্ব ছিল এককভাবে আমার উপর। লেখা সংগ্রহ থেকে শুরু করে, সম্পাদনা, ২/৩টা করে প্রুফ দেখা সবই এক হাতে করতে হয়েছে। কবিকে গিয়ে ধরলাম লেখা দেয়ার জন্য। ইসলামপন্থীদের একটি দৈনিক পত্রিকা বের হচ্ছে শুনে তিনি খুব খুশি। উদ্বোধনী সংখ্যার জন্য কবি আমাকে 'সংগ্রাম' শীর্ষক একটি কবিতা দিয়েছিলেন। উদ্বোধনী সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষদেশে গুরুত্বের সাথে ওটা ছেপেছিলাম। পত্রিকার একটি কপি নিয়ে ইস্কাটন গার্ডেনে ওনার হাতে তুলে দিতেই গভীর আবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। সে আবেগের মধ্যে ছিল নিঃস্বার্থ ইসলামী জোশ। কবির ব্যক্তিগত কোন চাওয়া-পাওয়া বা পার্থিব অর্জনের প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল বলে কখনো অনুভব করিনি, ইসলাম ও মুসলমানদের জয়-পরাজয় নিয়েই ছিল কবির যত আনন্দ ও দুঃখ। এমন আদর্শগতপ্রাণ মানুষ অতিশয় বিরল।

এর ক'দিন পর কবিতার জন্য পঁয়ত্রিশ টাকার একটি বিলের টাকা (সেটাই ছিল তখন সর্বোচ্চ সম্মানী, সাধারণতঃ দশ থেকে পঁচিশ টাকা পর্যন্ত সম্মানী দেয়া হতো) নিয়ে কবির বাসায় হাজির হলাম। কবি খুব অসন্তুষ্ট হলেন। পত্রিকা চললেই তিনি খুশি, সম্মানীর প্রয়োজন নেই। কবির মেজাজ বুঝে আমি আর কথা বাড়ালাম না। অনেক কথাবার্তার পরে, চা-নাশ্‌তা খেয়ে বিদায় নেবার আগে খুব বিনয়ের সাথে অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে সম্মানীর টাকাটা কবির হাতে তুলে দিয়ে এলাম। এরপর প্রায় প্রতি সপ্তাহে সাহিত্য পাতা এবং বিশেষ সংখ্যার জন্য কবির নিকট ধর্ণা দিয়েছি। প্রায়ই তিনি আমাকে একটি কবিতা, নিদেন পক্ষে একটি ব্যঙ্গ কবিতা দিয়ে ধন্য করেছেন। ব্যঙ্গ কবিতা সাধারণতঃ কবি বেনামেই লিখতেন। তাঁর সবগুলি ব্যঙ্গ কবিতা সংগ্রহ করে তা সংকলিত করা সম্ভব হলে দেখা যাবে এক্ষেত্রে ফররুখ সকলের শ্রেষ্ঠ। মানে, সংখ্যায়, কবিত্বগুণে এবং বিষয়-বৈচিত্র্যে বাংলা ব্যঙ্গ কবিতার ক্ষেত্রে ফররুখ আহমদ কেবল অসাধারণ নয়, অদ্বিতীয় বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

কবি দৈনিক সংগ্রামের ব্যাপারে খুব আগ্রহভরে আমাকে নানা পরামর্শ দিতেন। তাঁর কোনটা ছিল আমার সাহিত্য পাতা বিষয়ক এবং অধিকাংশই অন্যান্য বিষয়ক, কবি যথাস্থানে তা পৌঁছে দেবার অনুরোধ জানাতেন। আমি তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতাম

www.pathagar.com

বিশ্বস্ততার সঙ্গে। আলোচনা প্রসঙ্গে কবি একদিন আমাকে জানালেন, সংগ্রামের সম্পাদক হওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রথমে তাঁকে প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু সে প্রস্তাবে তিনি রাজি হননি। এক্ষেত্রে কবির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল খুবই স্পষ্ট। তিনি একনিষ্ঠভাবে ইসলামের পক্ষে কিন্তু ইসলামের নামে বিভিন্ন দলমত রয়েছে, তিনি কোন বিশেষ দলমতের অনুসারী হতে চান না। তাই তিনি সংগ্রামের সম্পাদক না হয়েও তিনি ছিলেন দৈনিক সংগ্রামের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ও পরম হিতৈষী। ইসলামের পক্ষে যে যা-ই করতো তিনি আন্তরিকভাবে তা সমর্থন করতেন ও উৎসাহ দিতেন।

কবির শেষ জীবনে বিশেষত বাংলাদেশ হবার পর কবির নিঃসঙ্গ, বিড়ম্বিত দিনগুলোতে প্রায় প্রতিদিনই তাঁর বাসায় গিয়েছি, দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর সান্নিধ্যে কাটিয়েছি। সে সময় পত্র-পত্রিকায় তাঁর বিরুদ্ধে লেখালেখি হয়েছে, রেডিওর চাকরী থেকে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। অভাব-অনটনে তাঁর শারীরিক অবস্থাও খুব খারাপ হয়ে পড়েছে। বড় ছেলের মেডিকেলের পড়া বন্ধ হয়ে গেছে, বড় মেয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। এসব কারণে কবি নিশ্চয়ই মানসিকভাবে খুব ভেঙ্গে পড়েছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা এই যে, আলাপ-আলোচনায় তিনি কখনো ব্যক্তিগত কোন প্রসঙ্গ টেনে আনতেন না। তখনও দেশ এবং জাতির কথা, ইসলাম ও মুসলমানদের চিন্তাই তাঁকে একান্তভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এ সময় তিনি একটু বেশি রকম আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন বলে আমার মনে হয়েছে। তিনি চল্লিশের দশকের শুরুতেই আধ্যাত্মিকতায় দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক পুরুষ মওলানা অধ্যাপক আব্দুল খালেককে মুরশিদ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন বলে সকলেই জানি। কিন্তু শেষ জীবনে বিভিন্ন আলাপচারিতায় তাসাউফের প্রসঙ্গটি বেশি আসতো। এ সময় তিনি আল-কুরআনের কয়েকটি সূরার অনুবাদ করেন। প্রায় প্রতিদিনই আলাপকালে তিনি তাঁর অনুবাদের কিছু অংশ আমাকে পড়ে শুনাতেন। এর আগেও তিনি দু' একটি সূরার অনুবাদ করেছেন, কিন্তু ঐ সময় আল-কুরআনের সাথে তাঁর সম্পর্ক আরো গভীর হয় বলে আমার ধারণা। আল-কুরআনের কাব্যানুবাদ তাঁর পূর্বসূরী কবি গোলাম মোস্তফা, কাজী নজরুল প্রমুখ অনেকেই করেছেন, তবে এক্ষেত্রে ফররুখের অবদান বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে বলে আমার ধারণা। ফররুখের চিন্তা-চেতনা, জীবনাচরণ, কাব্যকৃতি সব কিছুর মূল উৎস আল-কুরআন, মহানবীর সীরাত, সাহাবায়ে কেরাম ও আউলিয়াদের উচ্চ জীবনাদর্শ। তাঁর কৃত আল-কুরআনের কাব্যানুবাদে একটি ভিন্ন স্বাদ ও ব্যঞ্জনার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর এসব রচনার একটি সংকলন প্রকাশিত হলে কবি হিসাবে তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন হতে পারে এবং তাঁর কবি-প্রতিভার বহুমুখিনতারও পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

১৯৭৪ সনে সীরাতুন নবী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমি একদিন তাঁর বাসায় গিয়ে তাঁর স্বকণ্ঠে তাঁর রচিত 'সীরাজাম মুনীরা' কবিতার আবৃত্তি টেপ করার প্রস্তাব দিলাম। তিনি প্রথমে রাজি হলেন না। বললেন, তাঁর যে শারীরিক অবস্থা তাতে ঐ কবিতা আবৃত্তি করলে হয়তো দম বন্ধ হয়ে তিনি মারাই যাবেন। ইতোপূর্বে রেডিও কর্তৃপক্ষও নাকি তাঁকে আবৃত্তি করার অনুরোধ করেছে কিন্তু তিনি ঐ একই অজুহাতে তাদেরকে বিমুখ করেছেন। একথার পরে তাঁকে আর কিছু বলা চলে না। তাই অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। আমার মন যে কিছুটা বিষণ্ন হয়েছে কবি তা উপলব্ধি করলেন। তাই কবির

www.pathagar.com

কাছ থেকে যখন বিদায় নিয়ে চলে আসবো তখন তিনি বললেন, ঠিক আছে, 'আপনার মন খারাপ হয়েছে বুঝতে পারছি, টেপ রেকর্ডার নিয়ে আসবেন আমি আবৃত্তি করবো।' হাতে চাঁদ পাওয়ার মত আনন্দ নিয়ে সেদিন সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে এলাম।

আমি তখন সিদ্ধেশ্বরী কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, থাকতাম মগবাজার কাজী অফিস লেনে ছোট্ট একটি ঘরে। নিজের কোন টেপ রেকর্ডার ছিল না। প্রতিবেশী বিশিষ্ট আলিম মওলানা আলাউদ্দীন আল্-আযহারীকে গিয়ে বলতেই উনি সাগ্রহে রাজি হয়ে গেলেন। টেপ রেকর্ডার নিয়ে উনি নিজেই আমার সঙ্গে কবির বাসায় গেলেন। কবি আবৃত্তি শুরু করলেন। কিন্তু আবৃত্তি তাঁর মনঃপুত হচ্ছিল না। দু' একবার টেস্ট করে তাঁর দরাজ কণ্ঠে যথারীতি শুরু করলেন। পুরা কবিতাটি আবৃত্তির পর মনে হলো তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। বার বার আমার আতঙ্ক হচ্ছিল, তাঁর আবার দম বন্ধ হয়ে না যায়! কী দরাজ, ভরাট, দরদী কণ্ঠে তাঁর সে আবৃত্তি! এ রেকর্ডের খবর অনেকের কাছেই পৌঁছে গেল। রেডিওর প্রাক্তন পরিচালক মরহুম শামসুল হুদা ও তাঁর স্ত্রী প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী লায়লা আর্জুমান্দ বানু খবর পেয়ে আমাকে বাসায় দাওয়াত দিয়ে নিয়ে বললেন, 'আপনি এক অসাধ্য সাধন করেছেন, আমরা অনেক চেষ্টা করেও পারিনি।' তাঁদের একান্ত অনুরোধে টেপের একটা কপি তাঁদেরকে সরবরাহ করি। সীরাতুন্নবী উপলক্ষে ঐ টেপটি এখনো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাজাতে শুনি। কবি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছিলেন এটা যে তারই ফসল সেটা ভেবে আনন্দবোধ করি।

আগেই বলেছি, কবি তাঁর ব্যক্তিগত কোন বিষয় কারো সঙ্গে সচরাচর আলোচনায় আনতেন না। কিন্তু আমরা তাঁর দুরবস্থার কথা বিভিন্ন সূত্রে জেনে ফেলতাম। তাঁকে আর্থিক সাহায্য দেয়ার জন্য মগবাজারে ডাক্তার গোলাম মুয়াজ্জমের বাসায় একদিন এবং মওলানা আলাউদ্দীন আল্-আযহারীর (বর্তমানে মরহুম) বাসায় একদিন তাঁর ভক্ত-অনুরক্তগণ বৈঠক করলাম। উভয় বৈঠকেই সভাপতিত্ব করেছিলেন অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার গোলাম মোয়াজ্জম, মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারী, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, অধ্যাপক আব্দুল গফুর, অধ্যাপক আবুল হোসাইনসহ অনেকেই। আমি ছিলাম দুটো বৈঠকেরই আহ্বায়ক। বৈঠকে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফকে আহ্বায়ক এবং আমাকে সদস্য-সচিব করে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। আমরা অর্থ সংগ্রহের কর্মসূচীও গ্রহণ করি। ইতোমধ্যে আমাদের কার্যক্রমের খবর জানতে পেরে কবি রীতিমত উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, 'আমি কি কারো কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছি যে আমার নামে চাঁদা তুলতে হবে?' একথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দেই। সেদিন আমরা তাঁর ভক্ত-অনুরক্তরা আহত হয়েছিলাম এই ভেবে যে, কবির চরম আর্থিক সংকটের সময়ও আমরা সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কবিকে কোনরূপ সাহায্য করতে পারিনি। আবার এ ভেবে আনন্দবোধ করেছি যে, আত্মমর্যাদাশীল বিশ্বাসী কবি চরম দুর্দিনেও এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো করুণার প্রার্থী ছিলেন না। এমন আত্মমর্যাদাশীল দৃঢ় ঈমানের মানুষ আমাদের সমাজে ক'জন আছেন? মানুষ হিসাবে ফররুখ আহমদ ছিলেন এক তুলনাবিরল অসাধারণ ব্যক্তিত্ব।

একদিন যথারীতি কবির বাসায় গিয়ে দেখি কবি বৈঠকখানায় বসে আছেন। পাশে রয়েছেন মাসিক 'মদীনা' সম্পাদক মওলানা মুহিউদ্দীন খান ও ধানমন্ডি সরকারী বয়েজ

www.pathagar.com

হাইস্কুলের হেড মওলানা। কবি তাঁদের সঙ্গে তাঁর স্বভাবসুলভ উদ্দীপ্ত ভঙ্গীতে আলাপ করছেন। আমাকে দেখে মওলানা মুহিউদ্দীন খান বললেন, 'জানেন, মাত্র অল্প কিছুক্ষণ আগে আমাদের সামনে এখানে কবির মুখ দিয়ে প্রায় এক-দেড় সের রক্ত পড়েছে।' শুনে আমি শিউরে উঠলাম, অথচ হাসিমাখা আলাপরত কবিকে দেখে তা বিশ্বাস করার উপায় ছিল না। কবির চেহারার দিকে তাকালে অবশ্য তখন বোঝা যেত তাঁর মুখের সে ঔজ্জ্বল্য অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে, রোগ-জর্জর পান্ডুরতা ভর করেছে তাঁর চেহারায়। রোগ-জ্বরায় তখন তিনি বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছেন। চিকিৎসার দিকে তাঁর কোন খেয়াল ছিল না, ঔষধ-পথ্যের কোন ব্যবস্থা ছিল না, সে সামর্থ্যও তাঁর আদৌ ছিল না। দোয়া-তাবিজ, ঝাড়-ফুঁক, পানি পড়া এই ছিল তাঁর সম্বল। আমাকেও কয়েকটি দোয়া লিখে দিয়েছিলেন তিনি ঐ সময়। কবির নিজের হাতে লেখা সে দোয়াগুলো আমি এখনো সযত্নে রেখে দিয়েছি– ঐ সময় থেকে তা নিয়মিত আমলও করে আসছি।

একদিন কবির বাসায় গেলাম। সঙ্গে ছিলেন আমার সহকর্মী অধ্যাপক বদিউল আলম (বর্তমানে সিদ্ধেশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ)। কবিকে খুব বিষণ্ন মনে হলো। কথায় কথায় বললেন, 'আমার জন্য অল্প ভাড়ার ছোট্ট একটা বাসা দেখে দিন।' রেডিওর চাকরী যাওয়ার সাথে সাথে তাঁকে সরকারী কোয়ার্টার ছাড়ার নোটিশ দেয়া হয়েছে। নোটিশের কপিটিও কবি দেখালেন। আমরা খুব ব্যথিত হলাম। রেডিওর চাকরী ছাড়া কবির আয়ের দ্বিতীয় কোন পথ নেই। নিজস্ব কোন বাড়ি দূরে থাক, পৃথিবীতে নিজের এতটুকু কোন জায়গাও ছিল না। এমতাবস্থায় কবি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন, কীভাবে চলবেন ভেবে আমার মনও ব্যথা-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। সেদিন আর বেশি কথা হলো না, আমরা কবির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। আমাদের বিদায় দেয়ার জন্য কবি কথা বলতে বলতে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন।

ঐ সময় দৈনিক গণকণ্ঠে আহমদ ছফা কবির পক্ষে জোরালোভাবে লিখলেন। তাঁর লেখায় বিবেকবান এক শ্রেণীর লোকের টনক নড়লো। কবির অজান্তেই তাঁরা সক্রিয় হয়ে উঠলেন, তাঁরা প্রেসিডেন্টের কাছেও গেলেন। সরকারী বাস-ভবন আর তাঁকে ছাড়তে হলো না। শেষ পর্যন্ত সেখানেই দুঃখ-বেদনায়, অনাহার-অনিদ্রায়, নির্দয় সমাজের নিষ্ঠুর কষাঘাতে জর্জরিত, ভগ্নস্বাস্থ্য, হতোদ্যম কবি একদিন লাশ হলেন।

কবির মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে রোযার ছুটিতে কলেজ বন্ধ হওয়ায় বাড়ি চলে এলাম। ১৯৭৪ সনের ১৯ অক্টোবর সিরাজগঞ্জ আমার শ্বশুর বাড়িতে ইফতারের পর মাগরিবের নামায পড়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে আমার ছেলে জাহিদকে কোলের কাছে নিয়ে আদর করছিলাম। পাশে রেডিওতে খবর প্রচারিত হচ্ছিল। হঠাৎ একটি খবর শুনে আৎকে উঠলাম। আমার প্রিয় কবি, মুসলিম বাংলার কালজয়ী প্রতিভা ফররুখ আহমদ ইন্তিকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আমার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো, দু'চোখ বেয়ে অশ্রু বয়ে যেতে লাগল, আমি কোন কথাই বলতে পারলাম না। আমার স্ত্রী খালেদা বেগম এসে ঐ অবস্থায় আমাকে দেখে চমকে উঠলো। সে বার বার আমাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করতে লাগলো। আমি কোন রকমে তাকে শুধু কবির মৃত্যুর খবরটা বলে বালিশে মুখ ঢেকে ডুকরে কাঁদতে লাগলাম।

www.pathagar.com

আমার দেখা কবি তালিম হোসেন

বাংলা সাহিত্যে রেনেসাঁস তথা মুসলিম পুনর্জাগরণের অন্যতম কবি হিসাবে পরিচিত তালিম হোসেনের জন্ম ১৯১৮ ঈসায়ীর ২৯ অক্টোবর মুতাবিক বাংলা ১৩২৫ সনের ১৮ কার্তিক নওগাঁ জেলার চাকরাইল গ্রামে। ছোটবেলা থেকে কবির দু'একটি কবিতা ও গানের সাথে পরিচিত ছিলাম। ফলে সে সময় থেকেই তাঁর প্রতি আমার একটি শ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি হয়। তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে ১৯৬০ ঈসায়ীতে। তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আর তিনি সরকারী মাসিক 'মাহে নও'-পত্রিকার সম্পাদক। পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন স্বনামধন্য কবি-সমালোচক-গবেষক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও কবি-লেখক-গবেষক আব্দুস সাত্তার।

'মাহে নও' পত্রিকার লেখক হিসাবেই কবি তালিম হোসেনের সাথে আমার প্রথম পরিচয় এবং সে পরিচয় বয়সের ব্যবধান অতিক্রম করে দ্রুত ঘনিষ্ঠতায় রূপান্তরিত হয়। 'মাহে নও' পত্রিকায় আমার প্রথম লেখা ছাপা হবার পরই আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হই। এরপর পত্রিকায় লেখা দেবার সুবাদে তাঁর সঙ্গে আমার মাঝে-মধ্যেই দেখা হতো, আলোচনা হতো। বয়সের জন্য তাঁকে যেমন শ্রদ্ধা করতাম, কবি ও রাশভারী মার্জিত চেহারার জন্য তেমনি তাঁকে সমীহও করতাম। কিন্তু একবার কাছে যেতে পারলে মুহূর্তে বয়সের দূরত্ব আর চেহারার ভারিক্কীপনা দূর হয়ে যেতো। বুদ্ধিদীপ্ত পাণ্ডিত্য আর কবিসুলভ মাধুর্য তখন, পরিবেশকে বেশ আকর্ষণীয় করে তুলতো। তাঁর আচরণে অনুভব করতাম, তিনি বেশ খানিকটা স্নেহের আশ্রয় দিয়ে ফেলেছেন আমাকে। নানা বিষয়ে তাঁর কৌতূহল এবং গভীর অনুসন্ধিৎসা ছিল। ছোট ছোট প্রশ্ন করে তাঁর যা জানবার জেনে নিতেন এবং সব ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব চিন্তা ও উপলব্ধি থেকে একটা মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা দিতেন যা সব সময় গ্রহণযোগ্য মনে না হলেও অগ্রাহ্য করার মত ছিল না। তাঁর মধ্যে একটা আভিজাত্যসুলভ মনোভাব ছিল। নিজের মতকে তিনি অকপটে তুলে ধরতেন, কিন্তু সেটাকে কখনো চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন না। সে কারণে তাঁর সহনশীল বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশ্রয়ে অকপটে নিজের মত ও মনের কথা ব্যক্ত করা যেত।

তালিম হোসেনের পিতা তৈয়ব উদ্দিন চৌধুরী ছিলেন একজন জমিদার, লেখক ও উদারচেতা সংস্কৃতিবান ব্যক্তি। তালিম হোসেন সম্ভবত: তাঁর পিতার ধাঁচ আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি ছিলেন উদার সংস্কৃতিবান মজলিশী মেজাজের অধিকারী। স্মিত মুখ, টানা টানা স্বপ্নময় দুটো চোখ, মোহনীয় উদার ব্যক্তিত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

আচরণ, বুদ্ধিদীপ্ত পরিমিত বাক-বিন্যাস এবং সর্বোপরি এক মজলিশী অন্তরঙ্গ আমেজে তিনি সকলকে কাছে টেনে নিতে পারতেন সহজেই। তাঁর মধ্যে ছিল এক সূক্ষ্ম ব্যঙ্গাত্মক রসিক-চিত্ততা। কিন্তু তার প্রকাশে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংযত ও রুচিশীল। প্রথমেই তাঁর ব্যঙ্গ কেউ বুঝতে পারতো না, ধীরে ধীরে তার তীর্যকতা শ্রোতার মনকে গভীর রসবোধে উদ্দীপ্ত করতো। তাঁর এ তীক্ষ্ম রসবোধ তাঁর অসংখ্য কবিতার মধ্যেও ব্যাপ্ত রয়েছে। যেমন ঃ

১। "কত শত উমেদার দেশের সেবার
জনগণ নামে করে কায়-কারবার।
যে যখন গদী পায় করে খেদমৎ
খালি পেটে জনগণ শোনে বাঁধা গৎ।"

২। "দালালী হালাল করে খাই
পদে পদে করি নিজ সত্যকে জবাই"

৩। "প্রথম শূল।
জনগণ দলে দলে ভোট
দিয়ে এ নির্বাচন সম্পূর্ণ
সাফল্যমণ্ডিত করেছেন। সে জন্য
তাদের অভিন্দন!
দ্বিতীয় শূল।
জনগণ মোটেই ভোট
না দিয়ে এ নির্বাচন সম্পূর্ণ
বর্জন করেছেন। সেজন্য
তাঁদের অভিনন্দন!
চূড়ান্ত শূল
সব দেখে শুনেও মোটেই
কোন প্রশ্ন না করে আমি
এখনো সুস্থ মস্তিষ্কে,
বহাল তবিয়তে রয়েছি। সে জন্য
আমাকে অভিনন্দন।"

১৯৩৭ ঈসায়ী থেকে কবি তালিম হোসেনের কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হতে থাকে। চল্লিশের দশকে 'পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'-এর কর্মকাণ্ডে এবং পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় তাঁর রচিত 'পাকিস্তান আজাদ', 'কাফেলার গান'. 'দিল্ আজাদীর দেশ' 'মুবারক হো জিন্দেগী', 'ভোরের নকীব', 'আবহায়াত' প্রভৃতি অসংখ্য গান বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ সময় রচিত তাঁর সব গান ও কবিতায় ইসলামী চেতনা ও মুসলিম পুনর্জাগরণের উদ্দীপনামূলক বক্তব্য রয়েছে। এগুলো মুসলিম জাতির উত্থান ও স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রেরণা যোগায়। কিন্তু কবি ছিলেন প্রচার-বিমুখ। তাই ১৯৩৭ সন থেকে গান ও কবিতা লিখলেও তাঁর জীবনকালে মাত্র অল্প কয়েকটি গ্রন্থই প্রকাশিত হয়। এগুলো হলো নিম্নরূপঃ

www.pathagar.com

১. দিশারী (কাব্যগ্রন্থ), প্রথম প্রকাশ ১৯৫৬
২. শাহীন (কাব্যগ্রন্থ), প্রথম প্রকাশ ১৯৬২
৩. ইসলামী কবিতা (সংকলন), প্রকাশকাল ১৯৮২
৪. নূহের জাহাজ (কাব্যগ্রন্থ) প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪
৫. স্বর্গচারণ (অনুবাদ, জন স্টাইনবেকের উপন্যাস), প্রকাশকাল ১৯৫৯
৬. এন্ড্রু কার্নেগী (অনুবাদ, জীবনী) প্রকাশকাল ১৯৬২
৭. ধাইকিড়ি ধাইকি (শিশুদের ছড়া ও কবিতা) প্রকাশকাল ১৯৮১

এছাড়া, তাঁর অসংখ্য কবিতা, গান, ব্যঙ্গ কবিতা, অনূদিত কবিতা, প্রবন্ধ, অনুবাদ, ছোটগল্প, শিশু-কিশোর গল্প ইত্যাদি অগ্রন্থিত এবং অধিকাংশই অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। কবি তালিম হোসেন খুব অল্প লিখেছেন বলে কথা আছে, কিন্তু তাঁর সব রচনা প্রকাশিত হলে দেখা যাবে, তিনি যা লিখেছেন তাও কম নয়। তাছাড়া, শুধু সংখ্যা এবং কলেবর দিয়েই শিল্পের মানবিচার হয় না। শিল্পগুণটাই আসল। শিল্পগত বিচারে তালিম হোসেনকে অনেকেই 'পারফেক্শনিস্ট' হিসাবে বিবেচনা করে থাকেন। কবি মূলতই যথার্থ শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ যত্নবান ছিলেন।

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আমি কবি তালিম হোসেনের সাথে কিছুটা জড়িয়ে পড়ি, এরকম দু' একটি কর্মকাণ্ডের বিবরণ নীচে তুলে ধরলাম।

পাকিস্তানের তৎকালীন কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন আহমদের এক বিবৃতির প্রতিবাদে দেশের একুশ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতি প্রদান করেন। তাতে একস্থানে উল্লেখ ছিলঃ "রবীন্দ্রনাথ আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ"। একুশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিবৃতির এ অংশটুকু সঙ্গত কারণেই অনেকে গ্রহণ করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন বড় কবি, তিনি বাংলা সাহিত্য কিংবা আমাদের সকলের গৌরব সে সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু একজন বড় কবি হলেই তাঁর সবকিছু অবলীলাক্রমে মেনে নিতে হবে এমন কথা নেই, দ্বিমতের অবকাশ অবশ্যই থাকতে পারে। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনা-দর্শনের মূল উৎস যেখানে বেদ-উপনিষদ, সেখানে তৌহিদবাদীদের সাথে তাঁর দর্শন ও সংস্কৃতি অভিন্ন হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু তার অর্থ এও নয় যে, কারো চিন্তা-দর্শনের সাথে মিল না হলেই তাকে বর্জন করতে হবে। এভাবে গ্রহণ-বর্জনের ছকবাঁধা নীতি অনুসরণ করে কেউ কোন কবি বা লেখকের লেখা পাঠ করে না।

একুশজন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতির ঐ অংশটুকুর প্রতিবাদ জানিয়ে তৌহিদবাদী কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, আলেম প্রভৃতির পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের বিবৃতি পত্রিকায় ছাপা হতে থাকে। চল্লিশজন বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকের পক্ষ থেকে এরূপ একটি যুক্তিপূর্ণ বলিষ্ঠ বিবৃতি তৈরী হলো। আমি তখন একাধারে সিদ্ধেশ্বরী নৈশ কলেজ ও ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস-এ চাকুরী করি। ফ্রাঙ্কলিনে তখন আমার সহকর্মী ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সানাউল্লাহ নূরী, বিশিষ্ট শিল্পী কাজী আবুল কাসেম, কবি সুফিয়া কামালের স্বামী মরহুম কামালুদ্দিন প্রমুখ। একদিন কবি তালিম হোসেন, কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও কবি আব্দুস সাত্তার উক্ত বিবৃতিটি নিয়ে এলেন ফ্রাঙ্কলিনে। অনেক আলোচনার পর নূরী ভাই, শিল্পী আবুল কাসেম ও আমি সে বিবৃতিতে স্বাক্ষর দান করলাম।

www.pathagar.com

চল্লিশজন বুদ্ধিজীবী স্বাক্ষরিত আমাদের বিবৃতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হওয়ার পর সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তুমুল ঝড় ওঠে। আমাদের বিবৃতিতে যাঁরা স্বাক্ষর করেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন: সর্বজনাব আব্দুল মওদুদ, মুহম্মদ বরকতুল্লাহ, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ, মুজীবুর রহমান খাঁ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, কবি আহসান হাবীব, কবি ফররুখ আহমদ, ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, ডক্টর হাসান জামান, ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, কবি বে-নজীর আহমদ, কবি মঈনুদ্দীন, অধ্যক্ষ শেখ শরফুদ্দীন, আ.কা.মু. আদমুদ্দীন, অধ্যাপক শাহেদ আলী, আ.ন.ম. বজলুর রশীদ, মুফাখ্খারুল ইসলাম, শামসুল হক, ওসমান গনি, মফিজ উদ্দীন আহমদ, আনিসুল হক চৌধুরী, মোস্তফা কামাল, হোসনে আরা, কবি তালিম হোসেন, মাফরূহা চৌধুরী, মোহাম্মদ নাসির আলী, এ. কে. এম. নূরুল ইসলাম, জাহানারা আরজু, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, কবি আব্দুস সাত্তার প্রমুখ।

আমাদের বিবৃতির প্রতি সমর্থন জানিয়ে ডক্টর মোহাম্মদ মোহর আলীসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁসহ তিরিশজন বিশিষ্ট আলেম, ৪৫ জন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীসহ আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি বিবৃতি দেন। শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েক জন হলেনঃ মুনশী রইসউদ্দীন, খাদেম হোসেন খান, বেদারউদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ হোসেন খান, আব্দুল লতিফ, ধীর আলী মিয়া, আবিদ হোসেন, মীর কাশেম খান, আব্দুল আলীম, নীনা হামিদ, আঞ্জুমান আরা বেগম, ইসমত আরা, ফউজিয়া খান, খালিদ হোসাইন, নাজমুল হুদা, শাহনাজ বেগম, এম.এ. হামিদ, কাদের জামিরী, ফুলঝুরি খান প্রমুখ।

আমাদের সংস্কৃতির রূপরেখা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা ও তাকে বিভ্রান্তি ও ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষার জন্য ঐ ইস্যুটি তখন বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। কবি তালিম হোসেন সে সময় সাংস্কৃতিক দিগ-নির্দেশনার ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আমি তখন ঢাকাস্থ 'পাক সাহিত্য সংঘে'র সাধারণ সম্পাদক। আমি উদ্যোগী হয়ে সমমনা ২১টি সাহিত্য-সংস্কৃতি-যুব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলদের এক বৈঠক আহবান করি। প্রথম দিনের বৈঠকে খুব উৎসাহব্যঞ্জক মতবিনিময়ের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় আরেকটি বৈঠক আহবান করি এবং তাতে বিশিষ্ট কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। বৈঠকে উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে একটি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নাম ঠিক করা হয় ঃ 'পাকিস্তান তামদ্দুনিক আন্দোলন'। অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ, কবি বে-নজীর আহমদ, আমি এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক আখতারুল আলমকে যথাক্রমে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক করা হয়। অন্যান্য পদে আর কাকে কাকে রাখা হয়েছিল এখন আর তা মনে নেই, তবে সর্বজনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মুজীবুর রহমান খাঁ, কবি ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, মুফাখ্খারুল ইসলাম, সানাউল্লাহ নূরী, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, মওলানা মুহিউদ্দীন খান, কবি আব্দুস সাত্তার, অধ্যাপক আব্দুল গফুর, হাফেজ হাবিবুর রহমান, বিশ্বেশ্বর চৌধুরী, আবদুল মান্নান তালিব প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ এবং অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস ছিলেন কবি বে-নজীর আহমদ, তালিম হোসেন, ফররুখ আহমদ ও মওলানা মুহিউদ্দীন খান।

www.pathagar.com

'পাকিস্তান তামদ্দুনিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে ঐ সময় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে একটি জাতীয়-ভিত্তিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ, মূল প্রবন্ধের রচয়িতা ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। তিনি উপস্থিত হতে না পারায় তাঁর প্রবন্ধটি পাঠ করে শুনান বিশিষ্ট সাংবাদিক আখতারুল আলম এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বজনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মুজিবুর রহমান খাঁ, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সবাইর নাম আজ আর মনে নেই, যদিও সে অনুষ্ঠানে ঘোষকের দায়িত্ব আমিই পালন করেছিলাম। সেমিনারের পরিকল্পনা, প্রবন্ধ লেখকের সাথে যোগাযোগ, প্রবন্ধ সংগ্রহ, এমনকি, সেমিনারের খরচ সংগ্রহের সিংহভাগ দায়িত্ব পালন করেছিলেন কবি তালিম হোসেন। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে তালিম হোসেনের দক্ষতা সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অথচ তিনি ছিলেন প্রচার-বিমুখ, নিজের নাম জাহির ও কৃতিত্ব নেয়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, নির্মোহ। অবশ্য ঐ সেমিনারের ব্যাপারে কবি বে-নজীর আহমদ, মওলানা মুহিউদ্দীন খান, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। আরো অনেকের অবদানই সেমিনারকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে সাহায্য করেছিল। আমি নিজেও নিরলসভাবে তাঁদের সাথে কাজ করেছি।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ব্যাপক ও প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার জন্য ১৯৬৪ সনের ২৪ মে 'নজরুল একাডেমী'র প্রতিষ্ঠা তালিম হোসেনের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এজন্য তাঁকে কঠোর পরিশ্রম ও বহু বাধা-বিপত্তির মুকাবিলা করতে হয়েছে। নজরুল সাহিত্যের চর্চা, 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা'র ন্যায় উন্নতমানের সমৃদ্ধ গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ, সর্বোপরি নজরুলের গান, গানের স্বরলিপি উদ্ধার, নজরুল গীতির চর্চা ও তা জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর নিরলস চেষ্টা ও প্রাণপণ সাধনা ছিল অনন্যসাধারণ। বাংলাদেশে নজরুলের পরিচিতি, তাঁর সঠিক মূল্যায়ন এমন কি, জাতীয় কবি হিসাবে নজরুলের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যাপারে কবি তালিম হোসেনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য, নজরুল একাডেমীর কাজে তিনি সর্বক্ষণ এত ব্যস্ত ছিলেন যে নিজের সাহিত্য-সাধনা ও সৃষ্টি-কর্মের জন্য তাঁর হাতে কোন সময়ই থাকতো না। বলতে গেলে, নজরুলের জন্য তিনি নিজের কেরিয়ার বিসর্জন দিয়েছিলেন। এমন নজরুল-নিমগ্ন ব্যক্তি খুব বিরল। একজন মহৎ শ্রেষ্ঠ কবির জন্য আরেক জন কবির এ মহৎ আত্মত্যাগ জগতে সুদুর্লভ।

১৯৭০ সনের জানুয়ারী থেকে ১৯৭১ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত আমি যখন দৈনিক সংগ্রামের সাহিত্য সম্পাদক ছিলাম তখন লেখার জন্য প্রায়ই কবি তালিম হোসেনের কাছে যেতাম। তিনি স্বনামে-বেনামে কখনো কবিতা, কখনো ব্যঙ্গ কবিতা দিয়েছেন। দৈনিক সংগ্রামের ব্যাপারে বিভিন্ন সময় তিনি নানা গঠনমূলক পরামর্শও দিতেন। তিনি নিজে রাজনীতি করতেন না, কিন্তু রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনায় তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যেত। তিনি একাধারে কবি, গীতিকার, গায়ক ও রসিক ব্যক্তি ছিলেন। বাসায় গেলে তিনি তাঁর উদার অতিথি-পরায়ণতার পরিচয় না দিয়ে ছাড়তেন না।

নিজের বাসায় ওঠার আগে তিনি ইস্কাটন গার্ডেনের সরকারী কোয়ার্টারে থাকতেন। ইস্কাটন গার্ডেনের পশ্চিম প্রান্তে মসজিদের পাশের বিল্ডিং-এ থাকতেন নজরুল-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ফররুখ আহমদ আর এর পূর্ব প্রান্তের বিল্ডিং-এ বাস করতেন কবি তালিম হোসেন। কবি ফররুখ আহমদের বাসায় আমি কারণে-অকারণে

www.pathagar.com

প্রায়ই যেতাম। সেখান থেকে মাঝে-মধ্যে কবি তালিম হোসেনের বাসায় গিয়েও দেখা করে আসতাম। একদিন কবি তালিম হোসেন বললেন ঃ "আমি একটি বাড়ি তৈরী করেছি, চলুন দেখে আসবেন।" আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম।

কবির সাথে রিক্সায় চড়ে মৌচাকের কাছে বড় রাস্তা থেকে অল্প খানিকটা উত্তর দিকে সরু গলির পাশে বেশ প্রশস্ত জায়গাতে নির্মীয়মান একটি দোতলা বাড়িতে তখন ফিনিশিং চলছিল। কবি সাগ্রহে তাঁর বাড়ীর ড্রয়িং, ডাইনিং, বেড, স্টাডিরুম সব ঘুরে ঘুরে দেখালেন। বাড়ির দক্ষিণ পাশে বেশ খানিকটা খালি জায়গা, পূব পাশেও কিছুটা খালি। নিরিবিলি সুন্দর পরিবেশে নিখুঁত পরিকল্পনায় বাড়িটি নির্মিত হয়েছে। আমি দেখে তারিফ করতে লাগলাম। কবি জিজ্ঞেস করলেন, "পরিকল্পনাটি আপনার পছন্দ হয়েছে?" আমি নির্দ্বিধায় সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "অবশ্যই, খুব সুন্দর ও নিখুঁত হয়েছে।" তারপর কবি বললেন, "জানেন, কোন্ আর্কিটেক্ট এ পরিকল্পনা তৈরী করেছেন?" আমি বললাম, 'না' তিনি বললেন, "সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি আমার।" একথা বলে তিনি এক গভীর পরিতৃপ্তির সাথে শিশুর মত অম্লান স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে দিলেন সারা মুখে।

১৯৭৭ ঈসায়ীর ১২ ফেব্রুয়ারী সিদ্ধেশ্বরী ডিগ্রী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ থাকাকালে আমি দুবাই চলে যাই। দীর্ঘ কাল দুবাই থাকাকালে কবির সাথে দেখা-সাক্ষাৎ বা যোগাযোগ ছিল না। ইতোমধ্যে দুবাইতে আমি সরকারী চাকুরী করার অবকাশে ১৯৮১ ঈসায়ীতে সেখানকার প্রবাসী বাংলাদেশী ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ও বাংলা শিক্ষাদানের জন্য দুবাইতে "বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুল" প্রতিষ্ঠা করি। স্কুলের মাধ্যমে সেখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করার সাথে সাথে ১৯৯০ ঈসায়ী থেকে প্রতি বছর বাংলা সাহিত্য সম্মেলন ও বাংলা পুস্তক প্রদর্শনী শুরু করি। সম্মেলন উপলক্ষে বাংলাদেশের কোন একজন বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিককে নিয়ে স্কুলের পক্ষ থেকে তাঁকে সাহিত্য-পুরস্কার দেয়ার ব্যবস্থা করি। কবি তালিম হোসেনকে একবার প্রধান অতিথি করে সাহিত্য পুরস্কার দেয়ার ইরাদা করে ১৯৯৪ ঈসায়ীতে ছুটিতে ঢাকা এসে কবির বাসায় টেলিফোন করলাম। ধরলেন কবি-পত্নী বিশিষ্ট লেখিকা ও সাংবাদিক মাফরূহা চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে কুশল বিনিময় করে কবিকে চাইলাম। কবি টেলিফোন ধরে পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। আমি পরিচয় দিলাম, তবু চিনতে পারলেন না। বার বার বিভিন্নভাবে পরিচয় দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। খুব হতাশ হলাম। বয়স মানুষকে এমন প্রতারিত করে। টেলিফোনে কণ্ঠস্বর শুনেই যিনি চিনতে পারতেন, কখনো নাম জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনবোধ করতেন না তিনি বার বার পরিচয় দেবার পরেও আমাকে চিনতে পারলেন না।

কয়েকদিন পর একদিন তাঁর বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। ড্রয়িং রুমে বসে মাফরূহা আপার সাথে কথা হলো। তিনি কবির অবস্থা সবিস্তার জানালেন। তিনি তখনো কথা বলতে পারতেন, কিন্তু তাঁর স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছে, তিনি কাউকে চিনতে বা কোন কিছু মনে রাখতে পারতেন না। কবি তখন ঘুমাচ্ছিলেন, আমি জাগাবার চেষ্টা করিনি। তাঁকে ঘুম থেকে জাগানো ডাক্তারেরও বারণ ছিল। এক বুক দু:খ আর হতাশা নিয়ে ফিরে এলাম। তাঁকে দুবাই নিয়ে সাহিত্য পুরস্কার দেবার পরিকল্পনাও আর পরিপূরিত হলো না আমার।

১৯৯৭ ঈসায়ীর জানুয়ারীতে আমি দুবাই থেকে একবারে চলে আসি। ঐ বছর মে মাসে 'বাংলা সাহিত্য পরিষদে'র এক অনুষ্ঠানে মাফরূহা আপার সাথে দেখা। তাঁর সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে কবিকে জাতীয় পর্যায়ে এক সংবর্ধনা দেয়ার ব্যাপারে আগ্রহের কথা

www.pathagar.com

উল্লেখ করলাম। উনি সম্মতি দিলেন। কথামত তাঁর বাসায় গিয়ে এ ব্যাপারে একদিন বিস্তারিত আলোচনা করে এলাম। কবি আল-মাহমুদসহ অনেকের সাথেই যোগাযোগ করলাম। তাঁরা উৎসাহ দিলেন। ঠিক করলাম, সবাইকে নিয়ে এক জাতীয় সংবর্ধনা কমিটি গঠন করে কবিকে জাতীয় পর্যায়ে উপযুক্ত সংবধর্না প্রদানের ব্যবস্থা করবো। কিন্তু ইতোমধ্যে কী দিয়ে কী হয়ে গেল, একদিন রাত্রিবেলা মাফরুহা আপা টেলিফোন করে বললেন, "কবির শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ এ অবস্থায় এ রকম কোন অনুষ্ঠান করা ঠিক হবে না।" আমি বললাম, "তাহলে আপাতত: এটা স্থগিত রাখা যাক, পরে কখনো করা যাবে।" তিনি বললেন, "না, স্থগিত রেখে লাভ নেই, এটা বাদই দেন।" এরপর আর কথা চলে না। আমি খুব হতাশ হলাম। দেশের একজন বিশিষ্ট কবিকে সম্মানিত করার আমার দ্বিতীয় উদ্যোগও ব্যর্থ হলো। মাফরুহা আপার এ নেতিবাচক মনোভাব আমার নিকট কিছুটা রহস্যময় বলেই মনে হলো।

১৯৯৭ ঈসায়ীর ২৮ অক্টোবর "গুণীজন সংবর্ধনা পরিষদে"র সাধারণ সম্পাদক তরুণ সংস্কৃতি-কর্মী আল মুকতাদীরের টেলিফোন পেলাম। সুন্দর মার্জিত কণ্ঠে সে বললো, "আগামী কাল কবি তালিম হোসেনের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর বাসায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, আপনি আসবেন।" পরের দিন সকালে কবি-ভবনে গিয়ে দেখি কবি-পরিবারের সদস্যগণ ছাড়াও জনাব সানাউল্লাহ নূরী, কবি আল মাহমুদ, কবি আতাউর রহমান, কবি আল মুজাহিদী, মরহুম কবি গোলাম মোস্তফা-কন্যা ফিরোজা খাতুন, তাঁর কন্যা মন্জু, কবি আসাদ বিন হাফিজ, নোমান মোশাররফ, মুকতাদীরসহ কবি-পরিবারের সদস্য ও তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নির্বাক কবির পাশে দাঁড়িয়ে, বসে অনেক ছবি তোলা হলো, ফুলে ফুলে কবির শরীর, বিছানা, ঘর ভরে দেয়া হলো। ড্রয়িং রুমে বসে সানাউল্লাহ নূরীকে সভাপতি ও আল মাহমুদকে প্রধান অতিথি করে আলোচনা অনুষ্ঠানে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ূর জন্য মহান আল্লার নিকট দোয়া করা হলো। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ আমারও হয়েছিল। সবশেষে সকলে মিষ্টিমুখ করে বিদায় নিলেন।

১৯৯৮ ঈসায়ীর ২৯ অক্টোবর মুকতাদীরের আহবানে সাড়া দিয়ে কবির জন্মদিন পালনার্তে কবি-ভবনে হাজির হই আরেক বার। এবারেও তেমনি ফুলে ফুলে সাজানো হয়েছে সবকিছু। ছবি তোলার পর্ব শেষ করে ক্ষুদ্র ঘরোয়া অনুষ্ঠানে মিলিত হলাম উপস্থিত সবাই। আমাকে সভাপতি করে অনুষ্ঠান শুরু হলো। কবির জীবৎকালে তাঁর বাসভবনে এটাই ছিল তাঁর সর্বশেষ জন্মদিনের অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে আমি সভাপতিত্ব করেছিলাম, এটা আমার জীবনের এক উজ্জ্বল স্মৃতি হয়ে থাকলো।

ইতোমধ্যে ১৯৯৮ ঈসায়ীর সেপ্টেম্বরে ঢাকার বিশিষ্ট সাহিত্য-সংস্কৃতি সংগঠন 'স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদ' আমাকে সভাপতি নির্বাচন করে। স্বদেশের নির্বাহী কমিটির সভায় আমি জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, কবি তালিম হোসেন, জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান ও বিশিষ্ট সাংবাদিক সানাউল্লাহ নূরীকে সংবর্ধনা ও স্বর্ণপদক দেওয়ার প্রস্তাব করলাম। খরচের টাকাটাও আমি ব্যবস্থা করবো বলে জানালাম। সকলে সাগ্রহে আমার প্রস্তাবে সম্মত হলেন। বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠক ও লেখক মাহবুবুল হককে আহবায়ক করে প্রস্তুতি সাব কমিটি গঠিত হলো। ১৯৯৮ ঈসায়ীর ২৮ নভেম্বর 'বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে' এক সাড়ম্বর অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের

www.pathagar.com

শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-সাংবাদিকতা জগতের চার উজ্জ্বল পথিকৃৎকে সংবর্ধনা ও স্বর্ণপদক প্রদান করি। কবি তালিম হোসেনের পক্ষ থেকে তাঁর বড় মেয়ে বিশিষ্ট নজরুল গীতি-শিল্পী শবনব মুশতারী পদক গ্রহণ করেন। অন্যরা ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে পদক গ্রহণ করেন। জাতির এ চার বিশিষ্ট গুণীজনকে সেদিন সংবর্ধনা ও পদক দিতে পেরে আমার বহুদিনের একটি স্বপ্নের বাস্তবায়ন ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ নৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে যেন খানিকটা মুক্তি পেয়েছিলাম। শুধু দুঃখ থেকে গেল, স্মৃতিভ্রষ্ট নির্বাক নিশ্চল কবি তালিম হোসেন তাঁর প্রতি নিবেদিত আমাদের আন্তরিক গভীর শ্রদ্ধা স্বচক্ষে দেখে যেতে পারলেন না। তবু সান্ত্বনা, তাঁর জীবিতকালে আমরা তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাতে পেরেছি।

স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত স্বর্ণপদক প্রদান উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কবি কন্যা বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী শবনব মুশতারী বক্তৃতা করছেন

১৯৯৯ ঈসায়ীর ২২ ফেব্রুয়ারী সকাল বেলা আবার মুক্তাদীরের টেলিফোন পেলাম ঃ 'শুনেছেন?' বললাম, 'না, কী হয়েছে?' 'কবি তালিম হোসেন ভোর সোয়া তিনটায় ইন্তেকাল করেছেন। বাদ আছর সিদ্ধেশ্বরী জামে মসজিদে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হবে আপনি আসবেন।' টেলিফোন ছেড়ে হতবিহ্বল হয়ে পড়লাম। অনেক স্মৃতির ভীড়ে আমি নির্বাক নিশ্চল। চোখ দুটি এলো ঝাপ্সা হয়ে। স্ত্রী খালেদা বেগমকে বললাম খবরটা। বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। শীতের শিশিরসিক্ত সকালে পূবের আকাশ তখনো কুয়াশামলিন। ভোরের পাখিরা শীতের জড়তা কাটিয়ে সবে একটু একটু পাখা মেলতে শুরু করেছে।

আমার একটি জরুরী কাজ থাকা সত্ত্বেও সব ফেলে সিদ্ধেশ্বরী জামে মসজিদে গেলাম। নামাযে জানাযার পর তাঁর লাশ ট্রাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো কবির জীবনের স্বপ্ন-সাধনার কেন্দ্র নজরুল একাডেমীতে। সেখানে উপস্থিত সকলে তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। আবার দোয়া হলো। তারপর লাশ নিয়ে ট্রাক ছুটলো বনানী গোরস্তানের দিকে। তখন অস্তগামী সূর্য তার ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে। ফাল্গুনের অবসন্ন বিকেলে গোধূলির ম্লানিমা। ট্রাক যখন বনানী গোরস্তানে ঢুকলো, বসন্তের রঙিন সূর্য তখন দিন-রাত্রির সন্ধিক্ষণে সমুপস্থিত। সূর্য ডোবার সাথে কবির লাশও সমাহিত হলো বনানীর পাখিডাকা সবুজ চত্বরে। দশ ফাল্গুনের দীপ্ত সূর্য অস্তমিত হবার সাথে সাথে সমাহিত হলেন বাংলার এক যৌবনদীপ্ত লাস্যময় কবি যিনি ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে জাগানোর আহবান জানিয়েছেন, পরাধীন জাতির মুক্তির গান গেয়েছেন, মানবতার জয়গান সোচ্চারিত হয়েছে যাঁর বলিষ্ট দরাজ কণ্ঠে।

www.pathagar.com

সৈয়দ আলী আহসান স্মরণে

বিশিষ্ট কবি, সাহিত্য-সমালোচক, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সৈয়দ আলী আহসান গত ২৫ জুলাই, ২০০২ তারিখে এ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চির অবিনশ্বর পৃথিবীর অভিযাত্রী হয়েছেন। বিগত কয়েক বছর থেকেই তিনি অসুস্থ হয়ে শয্যাগত ছিলেন। তবে শারীরিকভাবে অসুস্থ হলেও তাঁর মন ও মস্তিষ্ক ছিল সচল এবং তিনি অবিরত লেখালেখির মাধ্যমে শিক্ষিত-বিদগ্ধ সমাজে তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি পরিণত বয়সেই (জন্ম : ২৬ মার্চ, ১৯২০) ইন্তেকাল করেছেন, সেদিক থেকে আফ্‌সোস্ করার কিছু না থাকলেও তাঁর অবর্তমানে আমাদের শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মনন-চর্চার ক্ষেত্রে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হলো। এসব ক্ষেত্রে আমরা এক অভিভাবকতুল্য মহান ব্যক্তিত্বের শীতল ছায়া থেকে বঞ্চিত হলাম।

সৈয়দ আলী আহসানের মতো বিশ্বমানের মনীষীর জন্ম পৃথিবীতে খুব কমই হয়। তাঁর মতো ব্যক্তিরা যে কোন দেশ ও জাতির জন্য মহাগৌরবের। তাঁর বহুমুখী অবদান ও কৃতিত্বে আমাদের দেশ ও জাতি নানাভাবে সমৃদ্ধ ও উপকৃত হয়েছে। কবি হিসাবে সমধিক খ্যাতি অর্জন করলেও তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর অবদানে আমাদের সাহিত্য যেমন সমৃদ্ধ, সমাজ-সংস্কৃতি-শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক নানা দিক ও বিভাগও তেমনি ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে স্বদেশে তিনি যেমন একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসাবে সম্মানিত ছিলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনি ছিলেন বিশেষভাবে সমাদৃত। বলতে গেলে, এসব কারণে তিনি আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের সম্মান, মর্যাদা ও পরিচিতিকেও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর মত বড় মাপের ব্যক্তি যে কোন দেশের জন্য এক গৌরবময় মূল্যবান জাতীয় সম্পদ।

অসাধারণ মেধার অধিকারী সৈয়দ আলী আহসান ১৯৩৭ সনে আরমানিটোলা সরকারী হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক, ১৯৩৯ সনে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও ১৯৪৪ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে কৃতিত্বের সাথে এম.এ পাশ করে ঢাকাস্থ ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (বর্তমানে কবি নজরুল কলেজ) ও ১৯৪৫ সনে হুগলী ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে অধ্যাপনা করেন ও ১৯৪৫ সনের শেষের দিকে কলকাতা রেডিওতে প্রোগ্রাম এসিস্ট্যান্ট হিসাবে চাকুরী নেন। ১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকা রেডিওতে যোগদান করেন।

www.pathagar.com

এরপর ১৯৪৯ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে সিনিয়র লেকচারার হিসাবে যোগ দেন। এরপর ১৯৫৩ সনে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে রীডার ও বিভাগীয় প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। তারপর ১৯৬০ সনে তিনি বাংলা একাডেমীর পরিচালক (তখনও মহাপরিচালকের পদ সৃষ্টি হয়নি) পদে যোগদান করেন। ১৯৬৭ সনে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ এবং প্রফেসর হিসাবে যোগ দেন এবং সেখান থেকেই ১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে কলকতা চলে যান এবং 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে' নিয়মিত অনুষ্ঠান করা ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব-জনমত সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সনে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, ১৯৭৫ সনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, ১৯৭৭ সনে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা (মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন), ১৯৭৮ এ পুনরায় জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক এবং পরে চারুকলা ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস-এ চারুকলা বিষয়ে খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৮৯ সনে জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইন্তিকালের পূর্বে তিনি কিছুকাল দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ ও কবি মরহুম ডক্টর সৈয়দ আলী আশরাফ প্রতিষ্ঠিত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। এছাড়া, তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান, ইউনেস্কোর উপদেষ্টা, বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ ও দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন। প্রায় সাত/আটটি ভাষা রপ্ত করেছিলেন তিনি।

বিশাল বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী সৈয়দ আলী আহসানের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১০৫টি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলোঃ

প্রবন্ধ-গবেষণা ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত [প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই-এর সাথে যুগ্মভাবে, ১৯৫৪], নজরুল ইসলাম [১৯৫৪], Essays in Bengali Literature [১৯৫৬], কবি মধুসূদন [১৯৫৭], কবিতার কথা [১৯৫৭], সাহিত্যের কথা [১৯৬৪], কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা [১৯৬৮], পদ্মাবতী [১৯৬৮], মধুমালতী [১৯৭২], আধুনিক বাংলা কবিতা, শব্দের অনুষঙ্গে [১৯৭০], রবীন্দ্রনাথ, কাব্য বিচারের ভূমিকা [১৯৭৪], মধুসূদন, কবিকৃতি ও কাব্যাদর্শ [১৯৭৫], আধুনিক জার্মান সাহিত্য [১৯৭৬], সতত স্বগত [১৯৮৩], শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য [১৯৮৩] সরহপাদ দোহাকোষ গীতি [১৯৯৩], বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ প্রাচীন যুগ [১৯৯৪], আমাদের আত্মপরিচয় এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ [১৯৯৬], মৃগাবতী [১৯৯৮]।

গল্প ঃ গল্পসংগ্রহ [১৯৫২], গল্প সংকলন [১৯৬৯]

আত্মজৈবনিক উপন্যাস ঃ জিন্দাবাহারের গলি [১৯৮৫], স্রোতোবাহী নদী [১৯৮৯]

কবিতা ঃ অনেক আকাশ [১৯৫৯], একক সন্ধ্যায় বসন্ত [১৯৬৪], সহসা সচকিত [১৯৬৫], উচ্চারণ [১৯৬৮], আমার প্রতিদিনের শব্দ [১৯৭৪], চাহার দরবেশ ও অন্যান্য

www.pathagar.com

কবিতা [১৯৮৫], সমুদ্রেই যাব [১৯৮৭], রজনীগন্ধা [১৯৮৮], নির্বাচিত কবিতা [১৯৯৬]

শিশুতোষ ঃ কখনো আকাশ [১৯৮৪]।

ভ্রমণকাহিনী ঃ প্রেম যেখানে সর্বস্ব [১৯৮৭], হে প্রভু আমি উপস্থিত।

আত্মজীবনী ঃ আমার সাক্ষ্য [১৯৯৪]

অনুবাদ ঃ ইকবালের কবিতা [১৯৫২], প্রেমের কবিতা [যুগ্মভাবে, ১৯৫৮], হুইটম্যানের কবিতা [১৯৬৫], ইডিপাস [১৯৬৮], সাম্প্রতিক জার্মান গল্প [১৯৭০], জার্মান সাহিত্য একটি নিদর্শনী [১৯৭৪], উইলিয়াম মেরিডিথের নির্বাচিত কবিতা [১৯৮২], সন্দেশ রাসক [১৯৮৭], নাহ্‌জুল বালাঘা [১৯৮৮]।

এ ছাড়াও রয়েছে তাঁর অপ্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান রচনাবলী। কবিতা ছাড়াও তাঁর গদ্য রচনা এক বিশেষ উন্নত মানে উত্তীর্ণ। তাঁর গদ্যের স্টাইল, বর্ণনা ও শব্দ-বিন্যাস বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও অনুকরণীয়। তাঁর গদ্যের বিষয়বস্তুও বহু বিচিত্র ও আকর্ষণীয়। এতে তাঁর অসাধারণ মেধা, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু বিষয়ে তাঁর রচনা ও গবেষণা আমাদের মননশীল, সৃষ্টিশীল জগতকে করেছে বিস্তৃত ও নানা বর্ণ-সুষমায় সুসমৃদ্ধ। তাই তাঁকে নিঃসন্দেহে আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মনন জগতের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব হিসাবে অভিহিত করা যায়।

পুরস্কার ঃ কবিতার জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৭), দাউদ পুরস্কার (১৯৬৮, প্রত্যাখ্যান), সুফী মোতাহার হোসেন স্বর্ণপদক (১৯৬৭), একুশে পদক (১৯৮৩), নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৮৫),মধুসূদন পুরস্কার (১৯৮৫), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৮৮), Officer Del Orore Des Arts Et Des Letters, Paris (১৯৯২), হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯৭৪ সনে নাগপুর বিশ্ব হিন্দি সম্মেলন থেকে প্রাপ্ত সম্মাননা পত্র। বাংলা সাহিত্য পরিষদ পদক- ১৯৯১, 'স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদ' কর্তৃক স্বর্ণপদক প্রাপ্ত (১৯৯৮) প্রভৃতি।

বলতে দ্বিধা নেই, সৈয়দ আলী আহসানের সান্নিধ্যে যাবার সুযোগ আমার খুব বেশী হয়নি। খুব সম্ভবত তিনি যখন বাংলা একাডেমীর পরিচালক তখন এক সেমিনারে তিনি মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের উপর একটি আলোচনা রেখেছিলেন। আমি সে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলাম। সেই প্রথম তাঁকে দেখি এবং তাঁর বক্তৃতা শুনি। শুনে আমি মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলাম। মাইকেলের উপর এমন সুন্দর আলোচনা আমি আর কখনো শুনিনি। তাঁর অপূর্ব বাচনভঙ্গী, স্নিগ্ধ সুরেলা কণ্ঠ, নিখুঁত শব্দ-চয়ন, বিষয়-দক্ষতা ইত্যাদি সবকিছু দেখে আমি অতিশয় অভিভূত হয়েছিলাম। তাঁর মধ্যে শ্রোতাকে সম্মোহিত করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। এ ক্ষমতার জন্য তিনি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাগ্মী হিসাবে প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এরপরও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনেছি, তাঁর উপস্থাপনা ও বিষয়-জ্ঞান দেখে যুগপৎ বিস্মিত ও অভিভূত হয়েছি। তাঁর বক্তৃতার মধ্যে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বাক-পটুতার এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটতো। সঠিক শব্দ ব্যবহারে তাঁকে কখনো ঠোঁট কামড়াতে দেখিনি, যেন তস্‌বী-দানার মত নিরন্তর তাঁর মুখ দিয়ে শব্দের স্নিগ্ধধারা অনায়াসে নির্গত হতো। তা মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষোভের মত নয়, খরস্রোতা নদীর মত উর্মিমুখরও নয়, পাহাড়ী ঝর্ণার অপরূপ স্নিগ্ধতা ও চলমানতা ছিল তাতে। তাঁর বক্তৃতা ছিল এক অসাধারণ আর্ট–জ্ঞান, যুক্তি, বুদ্ধি ও

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতাপূর্ণ মনোরম কথামালার হৃদয়গ্রাহী অভিনব শিল্প। তাঁর বক্তৃতা শুনে চমৎকৃত হয়েছি এবং মনে হয়েছে, বক্তা হিসাবে তিনি সম্ভবত শ্রেষ্ঠ বক্তাদের একজন। শিক্ষার্থী এবং সাধারণ শ্রোতাদের নিকট তিনি তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানগর্ভ, তত্ত্ব-তথ্যপূর্ণ আলোচনা ও বিশেষ বাচনভঙ্গীর জন্য অতিশয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

আমি সরাসরি তাঁর ছাত্র ছিলাম না। শ্রেণীকক্ষে তাঁর বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু আমি একথা শুনেছি, যখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিষয়ে লেকচার দিতেন, তখন আজকের স্বনামধন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর আনিসুজ্জামানের মত মনীষীরাও সাধারণ ছাত্রের মত ক্লাসের পেছনে গিয়ে বসে তাঁর বক্তৃতা শুনতেন। বাংলাদেশে খুব নামকরা যে সমস্ত শিক্ষক –যেমন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ডক্টর আবু হেনা মোস্তফা কামাল- এঁদের ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমি তাঁদের বক্তৃতা শুনেছি এবং সত্যিই অত্যন্ত মুগ্ধ করার মত বক্তৃতা দিতেন তাঁরা। তাঁদের বক্তৃতা যেমন ছিল জ্ঞানগর্ভ, তত্ত্ব-তথ্যসমৃদ্ধ তেমনি তাঁদের বক্তৃতার স্টাইল ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। আমার ধারণা, এক্ষেত্রে সৈয়দ আলী আহসানের সাফল্য ছিল ঈর্ষাযোগ্য। বক্তা হিসাবে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা ও সকলের প্রশংসা তিনি অর্জন করেছিলেন।

সৈয়দ আলী আহসানের সঙ্গে আমার সাক্ষাত পরিচয় ঘটে তাঁর বশিরউদ্দীন রোডের সংকীর্ণ গলি-সংলগ্ন নিতান্ত অনাড়ম্বর দোতলা বাড়িটিতে ১৯৯৪ সনের জুলাই মাসে। আমি তখন প্রবাসে থাকি। ১৯৯৪ সনের জুলাই মাসে ছুটিতে এসে আমি একদিন কাঁটাবনস্থ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারে গেলাম। সেখানে তখন 'কলম' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তরুণ কবি অনুজপ্রতীম মতিউর রহমান মল্লিক। কথা-প্রসঙ্গে সে বললো: 'ভাইজান, চলেন সৈয়দ আলী আহসান স্যারের বাসায় যাই, তিনি অসুস্থ, দেখে আসি'। আমি দ্বিরুক্তি না করে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে তার সঙ্গে গিয়ে রিকশায় উঠলাম।

ইতোপূর্বে তাঁর বাসায় আমার আর কখনো যাওয়ার সুযোগ হয়নি। বশিরউদ্দীন রোডের সংকীর্ণ গলির পাশে সাধারণ একটি বাড়ি। আসবাবপত্রও অতি সাধারণ। বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট কবি ও শ্রেষ্ঠ মনীষী যিনি মন্ত্রীত্বসহ বিভিন্ন উচ্চপদে সমাসীন ছিলেন, যাঁর গুণমুগ্ধদের সংখ্যা সীমাহীন, তাঁর বাড়ির অবস্থা দেখে বিশ্বাসই করা যায় না। অথচ বাংলাদেশে কত ভূঁইফোড় কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী চোখ-ঝলসানো গাড়ি-বাড়ির মালিক হয়েছেন। ভূয়া মুক্তিযোদ্ধা সেজেও কতজন কত সুযোগ-সুবিধা হাতিয়ে নিয়েছে। আর একজন সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা, যথার্থ প্রজ্ঞাবান আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, বিশিষ্ট কবি ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সৈয়দ আলী আহসানের বাড়ি দেখে বিশ্বাসই হতে চায় না। এত সাধারণ একটি বাড়ি, আসবাব-পত্রও অতিশয় সাধারণ। অবশ্য ড্রয়িং রুমে ঢুকে চোখ জুড়িয়ে গেল, মন প্রসন্ন হয়ে উঠলো। চারদিকে আলমারীতে থরে থরে অসংখ্য বই সাজানো। বহু বিচিত্র বিষয়ে লেখা বই। মনে হলো, একজন যথার্থ গুণী ব্যক্তির নিকট বহিরঙ্গ চাকচিক্য, বিত্ত-বৈভব, বিলাসোপকরণ, বাড়ি-গাড়ি তেমন কাংক্ষিত নয়। বই এবং কেবল বই-ই হলো তাঁর প্রিয় এবং অপরিহার্য নিত্যসঙ্গী।

এসব নানা অনুভূতির কথা ভাবতে ভাবতেই দেখি এক সময় ড্রয়িং রুমে এসে হাজির হলেন সৈয়দ আলী আহসান। শ্মশ্রুমণ্ডিত প্রশান্ত চেহারার খর্বাকৃতির মানুষ।

www.pathagar.com

আগেও দেখেছি, এখন বয়সের ছাপ কিছুটা স্পষ্ট। আমাদের সামনেই তিনি তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। অনেক কথা হলো। এক সময় অনেকটা আবদারের সুরেই অনুযোগ করে বললেন. 'আপনি আল মাহমুদ, শাহেদ আলী, শাহাবুদ্দীন আহমদ অনেককেই দুবাই নিয়ে গেলেন, আমাকে নিলেন না!'

আমি লজ্জিত হলাম। সপ্রতিভভাবে বললাম, 'হ্যাঁ সবার আগে অবশ্য আপনাকেই নেয়া উচিত ছিলো। কিন্তু অত বড় আয়োজন আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি বলে নিতে পারিনি, ভবিষ্যতে চেষ্টা করবো।'

একথা বলে নিজেকে রক্ষা করলাম। কথাটা মিথ্যাও বলিনি। দুবাইতে আমার প্রতিষ্ঠিত (১৯৮১ সনে) 'বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুলে'র পক্ষ থেকে ১৯৯০ সন থেকে ১৯৯৬ সন পর্যন্ত আমি নিয়মিত 'বার্ষিক বাংলা সাহিত্য সম্মেলন ও পুস্তক প্রদর্শনী'র আয়োজন করে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর একজন খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিককে সেখানে প্রধান অতিথি হিসাবে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গেছি এবং তাঁদেরকে স্কুলের পক্ষ থেকে 'সাহিত্য পুরস্কার' দিয়েছি। তাঁরা সকলেই সেখানে আমার বাসায় দুই সপ্তাহ করে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। সৈয়দ আলী আহসানকেও সেখানে নেয়ার চিন্তা ছিল, কিন্তু মন্ত্রীর পদ-মর্যাদাসম্পন্ন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মনীষীকে নিলে আনুষঙ্গিক যে খরচ সেটা চিন্তা করেই তাঁকে নেয়া সম্ভব হয়নি।

সেদিন মনীষী সৈয়দ আলী আহসানের বাসা থেকে বিদায় নেবার আগে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তাঁর নিকট একটি প্রস্তাব রাখলাম। বললাম, "ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা, মাওলানা সৈয়দ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) আধুনিক বিশ্বে ইসলামের এ পূর্ণাঙ্গ পরিচয়টি যথাসম্ভব তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং তার ফলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে শিক্ষিত সমাজে বর্তমানে ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এক্ষেত্রে বিশ্বখ্যাত অন্যান্য মুসলিম মনীষীর অবদানও কম নয়। এ সময় প্রত্যেক মুসলমানেরই নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী ইসলামের চর্চা করা প্রয়োজন। বিশেষত ইসলামী জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিদের এক্ষেত্রে যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। আমি মনে করি, আপনি যদি সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী কী তা নিয়ে একটি বই লিখতেন, তা হলে এক্ষেত্রে সেটা একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হতো এবং আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের জন্য তা একটি দিক-নির্দেশিকামূলক গ্রন্থ হতো।"

আমার কথা শুনে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "এটা খুবই ভাল প্রস্তাব। কিন্তু আমার হাতে সময় নেই। আমি চার/পাঁচটি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছি, এ কাজগুলো আমাকে শেষ করতে হবে। বিশেষত প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে আমি যে কাজ করছি, সেটা যদি শেষ করে না যাই তাহলে অন্য কেউ সেটা করতে পারবে না। কিন্তু এ কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এটা আমাকে আগে শেষ করতে হবে।"

আমি আর কথা বাড়ালাম না। মনে মনে ঠিক করলাম, আমার পক্ষে যতটা সম্ভব আমিই এ কাজটা শুরু করবো। পরে কোন উপযুক্ত ব্যক্তি হয়তো তা সম্পন্ন করবেন। পরের বছর জুলাই মাসে ছুটিতে বাংলাদেশে এসে 'ইসলামের দৃষ্টিতে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি' নামে আমার লেখা একটি ছোট বই ছেপে ফেললাম। পরবর্তীতে খানিকটা বড় আকারে এর দ্বিতীয় সংস্করণও প্রস্তুত করেছি। বর্তমানে তা ভিন্ন শিরোনামে মুদ্রণের অপেক্ষায় রয়েছে।

www.pathagar.com

১৯৭২ সনে প্রতিষ্ঠিত 'স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদের' আমি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলাম। ১৯৭৭ থেকে বিশ বছর কাল বিদেশে থাকায় আমি সংসদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখতে পারিনি। ১৯৯৭ সনের জানুয়ারীতে আমি প্রবাস-জীবন শেষ করে দেশে ফিরে আসার পর ১৯৯৮ সনে আমাকে পুনরায় 'স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদে'র সভাপতি নির্বাচন করা হয়। সংসদের পক্ষ থেকে আমার প্রস্তাবক্রমে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সংবাদপত্র জগতের চার দিক্‌পালকে সংবর্ধনা ও স্বর্ণপদক প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এঁরা হলেন বিশিষ্ট দার্শনিক, লেখক ও জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (জন্ম : ২৫ অক্টোবর, ১৯০৬, মৃত্যু : ১ নভেম্বর ১৯৯৯), বিশিষ্ট কবি ও নজরুল একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা-সেক্রেটারী তালিম হোসেন (জন্ম: ৩ নভেম্বর, ১৯১৮, মৃত্যু : ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯), বিশিষ্ট কবি, লেখক ও জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান (জন্ম: ২৬ মার্চ, ১৯২২ মৃত্যু: ২৫ জুলাই, ২০০২) ও বিশিষ্ট সাংবাদিক-সাহিত্যিক মুহম্মদ সানাউল্লাহ নূরী (জন্ম: ২৮ মে, ১৯২৮ মৃত্যু: ১৬ জুন, ২০০১)।

২৮ নভেম্বর, ১৯৯৮ 'বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে' আমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে উপরোক্ত চার বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সংবর্ধনা ও স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। এ চার মহান ব্যক্তিকে সেদিন নিজের হাতে তাঁদের স্বস্ব পদক তুলে দিতে পারার গৌরবময় স্মৃতি আজও আমাকে আনন্দে আবিষ্ট করে। এটাকে আমার জীবনের এক উল্লেখযোগ্য সুখ-স্মৃতি বলে মনে করি। সেদিন সৈয়দ আলী আহসানের মধ্যে খানিকটা অনীহা ছিল এ রকম যে, চারজনকে একত্রে সংবর্ধিত না করে প্রত্যেককে আলাদাভাবে সংবর্ধিত করলে সকলকেই যথাযথভাবে সম্মানিত করা হতো। কিন্তু আমার যুক্তি ছিল এই যে, চারজনই বয়সের এমন এক স্তরে উপনীত যে, চারজনকে যথাশীঘ্র সম্মানিত না করলে আমরা হয়ত সবাইকে সম্মানিত করার সময় ও সুযোগ নাও পেতে পারি। ঘটনাক্রমে দেখা গেল, সে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মাত্র তিন মাস পর কবি তালিম হোসেন, এগার মাস পরে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, দেড় বছর পর সানাউল্লাহ নূরী এবং সাড়ে তিন বছর পর সৈয়দ আলী আহসান আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। একথা ঠিক যে, আমাদের সেই ক্ষুদ্র সংবর্ধনার চেয়ে অনেক বড় সংবর্ধনা, সম্মাননা, স্বীকৃতি ও পুরস্কার তাঁরা প্রত্যেককেই পেয়েছেন, কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে অন্তর নিংরানো শ্রদ্ধা-কৃতজ্ঞতায় ভরা সম্মাননা তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করার সুযোগ পেয়েছিলাম এ জন্য আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করি ও মহান রাব্বুল আলামীনের অশেষ শোকর আদায় করি।

১৯৯৯ সনের ২৬ মার্চ সৈয়দ আলী আহসানের ৮০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী-অনুরাগী তাঁর বাসায় সমবেত হয়। ফুলে ফুলে সেদিন তাঁর অপরিসর ড্রয়িং রুম ভরে ওঠে। লোকের ভীড় ছোট্ট ড্রয়িং রুম ছাড়িয়ে, বাড়ির অলিন্দে, রাস্তা পর্যন্ত ছাপিয়ে যায়। বিদগ্ধ অনুরাগীরা অনেকেই অনেক কথা বললেন। তাতে বেশির ভাগই ছিল আবেগ, উচ্ছ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাবের উষ্ণতা। এ ধরনের অনুষ্ঠানে এ রকমই স্বাভাবিক। সবশেষে বললেন সৈয়দ আলী আহসান বয়সের ভারে ন্যুব্জ। স্ট্রোকে শরীরের একপাশ অসাড় তবু সেই পরিচিত, সুস্পষ্ট, স্নিগ্ধ, সুললিত কণ্ঠ। মনে হলো, সেদিন তিনি কিছুটা আবেগ-তাড়িত, দার্শনিকভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। জীবনের দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে তিনি এখন ক্লান্ত, অবসন্ন। জীবনের বাঁকে বাঁকে অনেক পলি জমেছে, ফসল ফলেছে, অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বেড়েছে- এ দিকে

www.pathagar.com

সময় কেড়ে নিয়েছে অনেক কিছুই। সৈয়দ আলী আহসান তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানগর্ভ ভাষণে, তাঁর চিরাচরিত অসাধারণ বাক্-শৈলীতে জীবনের নানা অভিজ্ঞতার, অনুভব-উপলব্ধির ডালি উন্মোচন করলেন, দীর্ঘ জীবন প্রাপ্তির জন্য মহান স্রষ্টার প্রতি শুকরিয়া জানালেন, নানা স্বীকৃতি ও ভক্তি-ভালবাসা পাওয়ার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন ঃ "আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি এ জন্য যে, এ বয়সেও তিনি আমার স্মরণশক্তি অক্ষুণ্ন রেখেছেন। আমি মহান আল্লার নিকট এই দোয়া করি, যতদিন বেঁচে থাকি ততদিন যেন আমার মন ও স্মৃতিশক্তি সতেজ থাকে। সময় অতিবাহিত করাটা বড় কথা নয়, সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগানো, মন ও মস্তিষ্কের চর্চা করার সুযোগ পাওয়াটাই বড় কথা।"

আল্লাহ তাঁর এ দোয়া কবুল করেছিলেন। অসুস্থ, পঙ্গু দেহ নিয়েও তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লিখে গেছেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা, জ্ঞান ও মননের কথা, ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম, সমাজের নানা বিচিত্র বিষয়ে তাঁর উপলব্ধির কথা। নানাভাবে তিনি লিখে গেছেন, কবিতায়, গদ্যে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে। কালের মণি-কোঠায় তা চির অম্লান হয়ে থাকবে বলে আশা করা যায়। জীবনের যথার্থ সার্থকতা তো এখানেই। বিভিন্ন, বিচিত্র বিষয়ে অবিশ্রান্ত লিখে গেছেন তিনি। পত্র-পত্রিকায় প্রায় প্রতিনিয়তই তাঁর লেখা ছাপা হতো। অবাক হতাম একথা ভেবে যে, এ বয়সে এত অসুস্থ শরীর নিয়ে ডিক্টেশনের মাধ্যমে তিনি এত কিছু লেখেন কীভাবে!

কবি ফররুখ আহমদের ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৯৯ সনের ২৮ অক্টোবর জাতীয় প্রেস ক্লাব ভি.আই.পি লাউঞ্জে এক আলোচনা সভায় সৈয়দ আলী আহসানকে প্রধান অতিথি হিসাবে দাওয়াত দেই। 'ফররুখ একাডেমী'র সভাপতি হিসাবে সে অনুষ্ঠানে আমি সভাপতিত্ব করেছিলাম। সেদিন তাঁর মনোজ্ঞ আলোচনায় কবি ফররুখ আহমদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য এবং উভয়ের কাব্য-চর্চার নানা প্রাসংগিক বিষয় আলোচনা করে তিনি অকপটে স্বীকার করেন যে, তাঁরা উভয়েই পুঁথি সাহিত্যের ভাব-ভাষা ও বিষয় নিয়ে আধুনিক কাব্য রচনায় ব্রতী হন প্রায় একই সময়। এ কাজে ফররুখ অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেন। এ ক্ষেত্রে ফররুখের মত সাফল্য অর্জন তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় ভেবে তিনি তাঁর 'চাহার দরবেশ' রচনার পর এক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছেড়ে দিয়ে ভিন্ন পথে কাব্য-চর্চা শুরু করেন। কিন্তু ফররুখ শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এক নতুন প্রাণবন্ত স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করলেন। ফররুখের অসাধারণ প্রতিভা ও মৌলিকত্বের জন্যেই এটা সম্ভব হয়েছিল। ফররুখের মত প্রতিভা ও মৌলিকত্ব ছিল না বলেই অন্যেরা যারা তাঁকে অনুসরণ করতে চেয়েছে তারা ব্যর্থ হয়েছে –একথা তিনি অকপটে স্বীকার করলেন।

১৯৯৯ সনের শেষের দিকে কোন একদিন (দিন-তারিখ মনে নেই) 'দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ে'র প্রভাষক কবি ইশারফ হোসেন টেলিফোন করে আমাকে বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিষয়ের সিলেবাস নিয়ে বিশেষ কমিটির বৈঠকে ভিসি সৈয়দ আলী আহসান স্যার আপনাকে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। আমি অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে বৈঠকে যোগদান করলাম। সৈয়দ আলী আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ডক্টর সদরুদ্দীন আহমদ, ডক্টর আনিসুজ্জামান, ডক্টর কে. এম.মহসীন ও আরো কয়েকজন, তাঁদের নাম আমার

www.pathagar.com

এখন মনে পড়ছে না, অংশগ্রহণ করেন। বৈঠক-শেষে আমি কিছুক্ষণ সৈয়দ আলী আহসানের অফিসে বসে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করলাম শুধুমাত্র আরো খানিকটা সময় তাঁর সান্নিধ্য লাভের আশায়। আলোচনাকালে বিভিন্ন বিষয়ে তিনি তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্য পেশ করছিলেন, আর উপস্থিত সকলে আমরা তাতে সায় দিয়ে যাচ্ছিলাম। অবশেষে আমি সবিনয়ে তাঁকে অনুরোধ করলাম, কবি ফররুখ আহমদের উপর একটা বই লিখতে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন ঃ 'ছাপবে কে?' উত্তরে নির্দ্বিধায় বললাম ঃ 'আমি ছাপবো।'

মনে হলো আমার উত্তরে তিনি আশ্বস্ত হলেন। শান্ত গলায় তিনি বললেন ঃ 'তাহলে ডিক্‌টেশন নেয়ার জন্য একজনকে পাঠাবে (ততদিনে তিনি আমাকে 'আপনি' থেকে 'তুমি' সম্বোধন করা শুরু করেছেন। এতে আমি যথেষ্ট স্বস্তি বোধ করতাম এবং মনে হতো যেন তিনি আমাকে কিছুটা ঘনিষ্ঠ করে নিয়েছেন।), দু'মাসের মত লাগবে। এর মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।

আমি খুব হৃষ্টচিত্তে সেদিন বাসায় ফিরলাম। মনে মনে লোক খুঁজতে লাগলাম এবং শীগ্‌গীরই পেয়েও গেলাম। তরুণ কবি মাহবুবুর রহমান বুলবুল অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে তখন মাত্র ফাইনাল এম. এ পরীক্ষা শেষ করেছে। সামান্য হাত খরচ দেয়ার শর্তে তাকে রাজী করালাম। সৈয়দ আলী আহসানের মত এক মহামনীষীর সান্নিধ্য লাভের আশায় সেও সন্তুষ্ট-চিত্তে রাজী হলো।

কবে থেকে তাকে পাঠাব তা জানার জন্য স্যারকে টেলিফোন করলাম। তিনি খুশী হলেন। তবে জানালেন যে, তিনি ইতোমধ্যেই ডিকটেশন নেয়ার লোক পেয়ে গেছেন এবং যথারীতি ফররুখ আহমদের উপর লেখা শুরু করেছেন। আমি খুব খুশী হলাম এবং তাঁর কাজ তাড়াতাড়ি সমাধা করার জন্য তাঁকে বিনীত অনুরোধ জানালাম।

ফররুখ আহমদের পাঁচটি কাব্যের উপর আলোচনা লেখার পর সৈয়দ আলী আহসান গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে ফররুখ আহমদের উপর পরিকল্পিত বইটি লেখার কাজ তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেননি। সৌভাগ্যবশত আমার সম্পাদিত 'ফররুখ একাডেমী পত্রিকা'র ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যায় যথাক্রমে তাঁর লেখা ঃ 'ফররুখ আহমদঃ সাত সাগরের মাঝি', 'ফররুখ আহমদের হাতেম তায়ী', 'ফররুখ আহমদের দিলরুবা' ও 'ফররুখ আহমদের মুহূর্তের কবিতা' ছাপা হয়। 'সিরাজাম মুনীরা' শীর্ষক তাঁর লেখাটি 'ফররুখ একাডেমী' প্রকাশিত 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যের ভূমিকা হিসাবে প্রকাশিত হয়। লেখাটি নিয়ে অবশ্য কিছুটা বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়। যাইহোক, সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ।

সাহিত্য সমালোচনায় শেষ কথা বলে কিছু নেই। ভিন্ন মতের অবকাশ অবশ্যই আছে। এক্ষেত্রে ফররুখ আহমদ সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসানের মতামত অনেকে সমর্থন করেননি। আমি নিজেও তাদেরই দলে। সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে শেষ কথা যেমন নেই, তেমনি কারো মতামত অন্য সকলে সমর্থন করবে সেটা আশা করাও সঙ্গত নয়। যাই হোক, বাংলা সাহিত্যের একজন কালজয়ী কবি ফররুখ আহমদ সম্পর্কে তাঁর সমকালের একজন বিশিষ্ট কবি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচক সৈয়দ আলী আহসান যে আমার মত একজন নগণ্য ব্যক্তির অনুরোধে জীবন-সায়াহ্নে কিছু লেখার প্রয়াস পেয়েছেন সে কথা ভেবে আমি গভীর আনন্দ-চিত্তে মহান স্রষ্টার শুকরিয়া আদায় করি। মহান দয়াময় আল্লাহ উভয় কবির আত্মার মাগফিরাত দান করুন।

www.pathagar.com

অম্লান স্মৃতিতে স্নিগ্ধোজ্জ্বল দুটি মুখ

এক.

বিগত কয়েক দিনে মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে আমাদের এ ধূলি-ধূসরিত মায়াবী পৃথিবীর বুক থেকে অসংখ্য পরিচিত মানুষের মধ্য থেকে দুটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল মায়াবী কোমল মুখ চিরতরে বিদায় নেয়। পৃথিবীতে মানুষের আগমন যেমন নিঃসঙ্গ অবস্থায় হয়ে থাকে, এ দু'ব্যক্তির বিদায়ও ঘটেছে অনেকটা তেমনি নীরবে, নিঃশব্দে ও অনেকেরই অজান্তে। খবরের কাগজের পাতায় তাঁদের নিঃশব্দ বিদায়ের খবর পড়ে অনেকেই বেদনায় মূয়মান ও শোকে মুহ্যমান হয়েছেন। এঁদের একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ, কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডক্টর সৈয়দ আলী আশরাফ, দ্বিতীয় জন হলেন ইসলামী রেনেসাঁসের কালজয়ী কবি ফররুখ আহমদের জীবন-সঙ্গিনী সৈয়দা তৈয়বা খাতুন (লিলি)। উভয়েই পরস্পর আত্মীয় সমতুল্য ছিলেন এবং পারিবারিক সূত্রে জানলাম, প্রথমোক্তের মৃত্যুর খবর স্বভাবতই দ্বিতীয় জনের মনে গভীর শোকের ছায়া বিস্তার করেছিল, নানা শোকে-দুঃখে কাতর ভগ্ন শরীরে তিনি মনের দিক দিয়ে আগে থেকেই ভেঙ্গে পড়েছিলেন। দু'দিন পর তিনিও পরপারের যাত্রী হলেন।

ডক্টর সৈয়দ আলী আশরাফ বিগত ১৯৯৮ সনের ৭ আগস্ট সুদূর বিলাতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে অনেকটা নিঃসঙ্গ অবস্থায় ৭৪ বছর বয়সে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। বিলাতে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫২ সনে ইংরেজীতে অনার্স পাশ করে ঐ একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৪ সনে English Poetry and its Audience (1900-1950) বিষয়ে ডক্টরেট করেন এবং উক্ত একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লেয়ার হলে ১৯৭৩-৭৪ সনে ফেলো, উলফ্‌সন কলেজে ১৯৮২-৮৪ সনে ফেলো, ১৮৮২-৯২ পর্যন্ত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুষদে ভিজিটিং প্রফেসর এবং ১৯৯০ সন থেকে আমৃত্যু উক্ত অনুষদের সদস্য ছিলেন। কেমব্রিজে তাঁর নিজস্ব বাড়ী ছিল। সেদিক দিয়ে কেমব্রিজকে তাঁর দ্বিতীয় আবাস বললে অত্যুক্তি হয় না। শেষ পর্যন্ত সেখানেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী সৈয়দ আলী আশরাফের জন্ম ১৯২৪ সনে আগলা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা, মাতুলালয়ে। তাঁর পৈত্রিক নিবাস আলোকদিয়া, মাগুরা। পিতা সৈয়দ আলী হামেদ, মাতা সৈয়দা কমরুন নিগার খাতুন। তাঁর বড় ভাই জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন আর এক অসাধারণ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। তিনিও একাধারে শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি।

www.pathagar.com

সৈয়দ আলী আশরাফ অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৫ সনে ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং পরবর্তী বছর এম. এ. পাশ করে ১৯৪৭ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে লেকচারার নিযুক্ত হন। ১৯৫৫-৫৬ সনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগের প্রধান অতঃপর ১৯৫৬-১৯৭৩ পর্যন্ত করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রধান ছিলেন। ১৯৭৪-১৯৮৪ পর্যন্ত সৌদি আরবের কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রফেসর ও প্রধান ছিলেন। এছাড়া, ১৯৭১ সনে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৯৭৪ সনে কানাডার নিউ ব্রান্স্ উইক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

সৈয়দ আলী আশরাফ

সৈয়দ আলী আশরাফের কাব্য-কৃতিগুলো নিম্নরূপঃ চৈত্র যখন (১৯৫৭), বিসংগতি (১৯৭৪), হিজরত (১৯৮৪), সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতা (১৯৯১), প্রশ্নোত্তর (১৯৯৬), ও হামদ। 'ইভানকে ক্লেয়ারগল' নামে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা সৈয়দ আলী আহসানের সাথে যৌথভাবে একখানি ইংরেজী প্রেমের কাব্য অনুবাদ করেন (১৯৬০)।

তাঁর গদ্য-রচনাগুলো নিম্নরূপঃ কাব্য পরিচয় (১৯৫৭), নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায় (২য় মুদ্রণ ১৯৯৫), বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য, সংসদ যুগঃ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের ইতিকথা (যন্ত্রস্থ), ও অন্বেষা (প্রকাশিতব্য)।

এছাড়া, তিনি 'দিলরুবা' সাহিত্য পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। ইংরেজীতে লেখা তাঁর বিশের অধিক গ্রন্থ এবং বহু আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকা, বিশ্বকোষ, স্মারক ইত্যাদিতে বিচিত্র বিষয়ের উপর তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাপা হয়।

তাঁর বহুমাত্রিক বিচিত্র প্রতিভা ও অবদানের মধ্যে শিক্ষাবিদ সৈয়দ আলী আশরাফের অবদান সম্ভবতঃ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অনন্যসাধারণ। এ ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হলোঃ ১৯৭৭ সনে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের তিনি উদ্যোক্তা ও সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। ১৯৮০-৮২ সনে ওআইসি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মক্কা শরীফে 'ওয়ার্ল্ড সেন্টার ফর ইসলামিক এডুকেশন'-এর প্রথম পরিচালক ছিলেন। এছাড়া, মক্কাসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে তিনি যোগদান করে প্রবন্ধ পাঠ ও বিভিন্নভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। তাঁর মধ্যে একাধারে ইসলাম ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুসমন্বয় ঘটেছিল। মূলতঃ দু'য়ের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ নেই। ইসলাম আল্লাহর দেয়া এক চিরন্তন, শাশ্বত বিধান। যে কোন দেশ-কাল-জনমণ্ডলীর জন্যই তার সর্বোত্তম ও যথাযথ উপযোগিতা রয়েছে। তবে এজন্য চাই উপযুক্ত যথার্থ মনন ও প্রাজ্ঞ দৃষ্টিভঙ্গী। সৈয়দ আলী আশরাফের মধ্যে আল্লাহ সেই গুণ, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা প্রদান করেছিলেন। তিনি তার যথার্থ সদ্ব্যবহারের জন্য আজীবন নিষ্ঠার সাথে কাজ করে গেছেন।

১৯৯৬ সনে বাহরাইনে অনুষ্ঠিত ওআইসির দ্বারা পরিচালিত ISESCO আয়োজিত শিক্ষা সম্মেলনে 'একবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম শিক্ষা পদ্ধতি'র উপর তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ

www.pathagar.com

করেন তাতে দেশ-কাল নির্বিশেষে সকল মুসলিম দেশে একক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের রূপরেখা দেয়া হয়। আধুনিক বিশ্বে ইসলামকে যারা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসাবে সমাজে কায়েম করতে আগ্রহী, তাদের নিকট এটি একটি মূল্যবান দিক-নির্দেশিকা হিসাবে বিবেচিত হবে। তিনি তাঁর এ রূপরেখাকে শুধু থিওরী হিসাবে না রেখে এর সফল বাস্তব রূপায়ণের জন্য একটি সুষ্ঠু ও ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে ঢাকায় 'দারুল ইহসান' নামে একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে এটি হলো প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং তিনি ছিলেন এর উদ্যোক্তা ও ভাইস চ্যান্সেলর। এটা হলো তাঁর আজীবন লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের অনন্ত সম্ভাবনাময় এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। এর সাফল্য শুধু তাঁকেই স্মরণীয় করে রাখবে তাই নয়, সমগ্র বিশ্বে, বিশেষতঃ মুসলিম জাহানে ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এটা এক গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক হিসাবে চিহ্নিত। তাই আমার ধারণায়, সৈয়দ আলী আশরাফের সকল অবদানের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং এ জন্য শুধু সমগ্র জাতি নয়; আন্তর্জাতিকভাবে বিশেষতঃ মুসলিম বিশ্বে তিনি চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন।

ব্যক্তিগতভাবে এ অসাধারণ মনীষীকে আমার জানার তেমন একটা সুযোগ ঘটেনি। তিনি জীবনের বেশীর ভাগ সময় বিদেশে কাটিয়েছেন। তবে ছাত্র-জীবন থেকেই তাঁর সম্পর্কে শুনে আসছি। তাঁকে সামান্য যা কিছু জেনেছি তার প্রধানতম মাধ্যম ছিলেন আমার প্রিয় এবং ইসলামী রেনেসাঁসে'র কালজয়ী কবি ফররুখ আহমদের মাধ্যমে। কবির শেষ জীবনের কয়েকটি বছর আমি প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর ইস্কাটন গার্ডেনের সরকারী বাস ভবনের বৈঠকখানায় হাজির হতাম। আমার ধানমন্ডির সার্কুলার রোডের বাসা অথবা পরবর্তীতে মগবাজার কাজী অফিসের নিকটস্থ বাসা থেকে তাঁর বাসার দূরত্ব খুব একটা ছিল না। বিকেলে হাঁটতে হাঁটতেই চলে যেতাম তাঁর বাসায়। নানা প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে আলোচনা হতো, কবিতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ইত্যাদি কোন কিছুই বাদ যেত না। মাঝে মাঝে বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষও আলোচনায় আসতেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ ডক্টর হাসান জামান, জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, ডক্টর সৈয়দ আলী আশরাফ এবং আরো অনেকে। প্রকৃতপক্ষে, এঁদের প্রত্যেকেই আমাদের জাতীয় শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে এক একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বিশেষ। এঁদের প্রথমোক্ত দু'জনের সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে ছিলাম খুবই ঘনিষ্ঠ। পরবর্তী দু'জনকে আমি বিশেষভাবে জানতাম কিন্তু ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পাইনি আর শেষোক্ত ব্যক্তির সাথে আমার তখন পর্যন্ত সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি। ডক্টর হাসান জামান কবি ফররুখ আহমদের আত্মীয় ছিলেন। শেষোক্তদের কারো সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু ছিল গভীর আত্মীক সম্পর্ক। তাঁদের সবার সম্পর্কে কবির খুব উচ্চ ধারণা ছিল। কিন্তু তাঁর আলোচনা থেকে ডক্টর হাসান জামান ও ডক্টর সৈয়দ আলী আশরাফ সম্পর্কে তাঁর আন্তরিক দরদ ও প্রীতিবোধ একটু বেশী বলে অনুভব করতাম। প্রকৃতপক্ষে, কবির নিকট থেকে ডক্টর আলী আশরাফ সম্পর্কে যা শুনেছি, তা থেকেই অদেখা এ অসাধারণ ব্যক্তি সম্পর্কে আমার মনে গভীর শ্রদ্ধাবোধের জন্ম হয়।

দীর্ঘ বিশ বছর দুবাইতে প্রবাস-জীবন যাপন শেষে ১৯৯৭ সনের ৫ জানুয়ারীতে দেশে ফেরার পর এ বরেণ্য মনীষীর সাথে আমার মাত্র দু'বার সাক্ষাতের সুযোগ হয়।

www.pathagar.com

প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ঢাকাস্থ পাবলিক লাইব্রেরী হলে। সেদিন জাতীয় অধ্যাপক সর্বজনমান্য দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফকে প্রদত্ত জাতীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ডক্টর সৈয়দ আলী আশরাফ বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন। তার বেশ-ভূষার মত বক্তৃতাও ছিল সহজ-সরল কিন্তু পাণ্ডিত্যপূর্ণ। ঐদিনই তাঁকে আমার প্রথম চাক্ষুস দর্শন।

তাঁর সঙ্গে আমার দ্বিতীয় এবং শেষ সাক্ষাত ঘটে ১৯৯৮ সনের ১১ জুন মোহাম্মদপুর গজনবী রোডস্থ ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মিলনায়তনে। কবি ফররুখ আহমদের আশিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে আয়োজিত সেমিনারে তিনি ছিলেন প্রধান অতিথি, আমি ছিলাম সভাপতি। বিশেষ অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং তৎকালীন দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগের প্রধান ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ ও বিশিষ্ট নজরুল ও ফররুখ গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদ। প্রবন্ধ পাঠ করেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ঐ সময় জেদ্দাস্থ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ম্যানেজার মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, আলোচনায় শরীক হন কবি মোশাররফ হোসেন খান, কবি মুকুল চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন কেন্দ্রের সদস্য-সচিব কবি মতিউর রহমান মল্লিক। সেমিনারের মূল প্রবন্ধ পাঠের সময় আমার পাশে উপবিষ্ট অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আমার কানে কানে বললেন, আগামীকাল তাঁর বিদেশ যাবার কথা, প্রস্তুতি নেবার কাজ বাকী রয়েছে, তাই প্রবন্ধ পাঠের পরই তিনি তাঁর ভাষণ রেখে বিদায় নিতে চান। আমি তাঁর অভিপ্রায়ের কথা কাগজে লিখে প্রবন্ধ পাঠ শেষে প্রধান অতিথিকে তাঁর ভাষণ দেয়ার ঘোষণা দেবার জন্য উপস্থাপককে জানালাম। সে অনুযায়ী প্রবন্ধ পাঠ শেষে প্রথমেই তিনি তাঁর মূল্যবান ভাষণ পেশ করে সকলের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

আমরা অনুধাবন করতে পারলাম না সেই বিদায়ই ছিল তাঁর শেষ বিদায়। পরের দিন তিনি বিদেশ গেলেন। এর পঞ্চান্ন দিন পর তাঁর মৃত্যুর শোকাবহ খবর এলো। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব হারালো তার এক প্রিয় অনন্যসাধারণ মহাপ্রাণ শিক্ষাব্রতী ব্যক্তিত্বকে। ব্যক্তিগতভাবে আমার বলতে দ্বিধা নেই, এত স্বল্প পরিচয়ে কোন মানুষ আমাকে এত গভীরভাবে অভিভূত করতে পারেনি। অতি সাধারণ, সহজ, সরল, নিরহংকার, মিতভাষী, স্নিগ্ধোজ্জ্বল সৌম, শ্মশ্রুমণ্ডিত, খর্বাকৃতির এ অসাধারণ মানুষটিকে নিজের অজান্তেই গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছিলাম, অথচ তাঁর সঙ্গে আমার তেমন ঘনিষ্ঠ হবার কোন সুযোগই ঘটেনি।

দুই.

দ্বিতীয় যে উজ্জ্বল মায়াবী মুখচ্ছবিটি আমাদের নিকট থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে গেল সেটি হলো কবি ফররুখ আহমদের স্ত্রী সৈয়দা তৈয়বা খাতুন (লিলি)। তিনি ছিলেন কবির খালাতো বোন। ১৯৪২ সনের নভেম্বর মাসে তাঁদের বিয়ে হয়। বিয়ের ঘটক ছিলেন তাঁদের উভয়ের নানা মোহাম্মদ হুরমাতুল্লাহ। তিনি অনেক ভেবে-চিন্তে এ বিদূষী, অসাধারণ সুন্দরী ও গুণবতী রমণীর পাত্র হিসেবে অসাধারণ সুন্দর, প্রতিভাবান অথচ তৎকালে কিছুটা বোহেমিয়ান টাইপের ফররুখ আহমদকে বাছাই করেছিলেন। দু'জনেই

www.pathagar.com

ছিলেন তাঁর পরম স্নেহভাজন আদরের নাতি-নাতনী। বিয়ের পূর্বে ৩১.৭. ৪২ তারিখে দুর্গাপুর থেকে তিনি ফররুখ আহমদের বড় ভাই সৈয়দ সিদ্দিক আহমদকে যে চিঠি লেখেন তা থেকে এর কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। তিনি লেখেনঃ

"তোমার ২৮শে তারিখের পত্র পাইয়া সবিশেষ অবগত হইলাম।.... ফররোখ বর্তমানে কি করিতেছে । তাহার তো লেকচার Culture আছে। আর একবার চেষ্টা করিলে ভাল হয়। একটা degry (degree) থাকা ভাল।.... সে একবার এখানে আসিলে আমি খুব সন্তুষ্ট হইতাম। তাহার যাতায়াত খরচ আমি দিতে প্রস্তুত। লিখিলেই ইনশাল্লাহ পাঠাইয়া দিব।..... লিলিকে খুবই ভালবাসি। তাকে একটা সুপাত্রের হাতে দিয়া যাইতে পারিলে মনের শান্তি হইত। সে এমন সুন্দর লেখাপড়া শিখিয়াছে যে একটা মূর্খের সহিত বিবাহ হইলে সে জীবনে মড়া হইয়া থাকিবে। তাহার জন্য একটু চেষ্টা কর। গাফিলী করিও না।" (দ্র. আব্দুল মান্নান সৈয়দ/ফররুখ আহম্মদঃ জীবন ও সাহিত্য, পৃ.৪)।

বিয়েতে ফররুখ আহমদের সাগ্রহ সম্মতি ছিল তা বোঝা যায় নিজের বিয়ে উপলক্ষে লিখিত তাঁর 'উপহার'নামক কবিতা থেকে। কবিতাটি 'সওগাত' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ সংখ্যায় ছাপা হয়। কবিতাটি এইঃ

আমরা দু'জনে ধরার ধূলায় বাঁধব বাসর-ঘর,
রবে চিরদিন এ স্বয়ম্বরে সত্যের স্বাক্ষর,
রবে চিরদিন বিবাহ-লগ্ন
রইব প্রেমের মধুতে মগ্ন
হাতে হাত রেখে চলব আমরা অন্তরে অন্তর;
আমরা দু'জনে ধরার ধূলায় বাঁধব বাসর-ঘর ॥

....

মিলবে প্রভাত, সন্ধ্যা, রজনী বিবাহের উৎসবে,
আমাদের ঘরে নিত্য প্রেমের মিলনোৎসব হবে।
পাড়ি দিয়ে যাবো সাগরে তরণী,
আমাদের মোহে জাগবে ধরণী
অশ্রু শোনিতে ভাসানো ধরার আশ্রয় বন্দর;
আমরা দু'জনে ধরার ধূলায় বাঁধব বাসর-ঘর ॥
নিবিড় বাঁধনে চিরদিন মোরা বাঁধা রবো পাশাপাশি,
দুর্যোগ রাতে, আঘাতে, ব্যথাতে ফোটাবো প্রেমের হাসি,
ফোটাবো উর্দ্ধে কণ্টকহীন
রাঙা শতদল নিত্য নবীন,
সামনে দাঁড়ালে প্রলয়-ভাঙন পাব না আমরা ডর;
আমরা দু'জনে ধরার ধূলায় বাঁধব বাসর-ঘর ॥

www.pathagar.com

কবিতাটি দীর্ঘ ৩৬ লাইনের। এখানে পুরোটা উদ্ধৃত করা থেকে বিরত থাকলাম। 'লিলি আহমদ' নামে একটি কবিতাও সওগাতে ছাপা হয়। 'লিলি' শিরোনামে কবির আর একটি কবিতা 'মৃত্তিকা' পত্রিকার বসন্ত ১৩৪৯ সংখ্যায় ছাপা হয়। 'লিলি' শিরোনামের কবিতা থেকে এখানে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত হলোঃ

তোমার সৌভাগ্য লিলি! চিরদিন নবসূর্য সাথে
পার হয়ে কাল মৃত্যু উদিত যে নবীন আশাতে
তাকায় তোমার পানে, তুমি ফিরে চাও তার মুখে,
সূর্যের কৌতুক লিলি, চিরদিন তোমাদের কৌতুকে।

সে-প্রাণ উজ্জ্বল দীপ্তি কক্ষপথে নিত্য গতিমান
আকণ্ঠ পিপাসা তব পূর্ণ করে দিয়া শেষ দান,
পরম বন্ধুর মতো তারপর তাকায় পুলকে;
তোমরা জাগিয়া ওঠো সূর্য! লিলি! আলোর ঝলকে।

কবিরা সৃজনশীল। তাঁদের সৃষ্টির পেছনে কোন না কোন অনুপ্রেরণা কাজ করে। আমরা কবিকে দেখি, তার সৃষ্টিকে দেখি। কিন্তু অনেক সময় তাদের সৃষ্টির পেছনে যে অনুপ্রেরণা কাজ করে তা থাকে অনেকটা লোকচক্ষুর অন্তরালে ও প্রায় ক্ষেত্রে অবজ্ঞাতই থেকে যায়। অথচ যে কোন সৃষ্টির পেছনে এ ধরনের অনুপ্রেরণার গুরুত্ব সীমাহীন। বিশেষত সৃজনশীল প্রতিভার পেছনে তাঁর নিত্যসঙ্গী প্রিয়তমা পত্নী বা প্রিয়জনের অনুপ্রেরণা অপরিসীম। কোন কিছুর দ্বারাই এর পরিমাপ করা যায় না। কবি ফররুখ আহমদের জীবনেও তাঁর প্রিয়তমা পত্মীর উপস্থিতি ছিল তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেনঃ

এ বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার আনিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।

কবি ফররুখ আহমদের জীবনে এর সত্যতা ও তাৎপর্য ছিল অনিবার্য। ফররুখ ছিলেন প্রকৃত জাত কবি। কবিতা লেখা, রেডিওর চাকুরী ও বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আসর জমানো এসব কাজেই তাঁর সময় অতিবাহিত হতো। স্বামী-স্ত্রী ও নয় জন ছেলেমেয়ের বিরাট সংসার দেখাশোনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল তাঁর স্ত্রীর উপরে। কী অপরিসীম ধৈর্য, বুদ্ধিমত্তা ও নৈপুণ্যে তিনি এ বিশাল সংসারের হাল ধরে কবিকে তাঁর সৃষ্টি-কর্মে উৎসাহ ও নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ করে দিয়েছিলেন কবি-পত্নীর লেখা থেকেই তার বিবরণ শোনা যাকঃ

"কবি হিসাব-নিকাশের কোন ধার না ধারলেও সংসারবিমুখ ছিলেন না। পিতা হিসাবে তিনি ছিলেন দায়িত্বশীল। ছেলেমেয়েদের প্রতি কর্তব্য পালনে বিন্দুমাত্র অমনোযোগী ছিলেন না। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন খুব যত্নশীল। সংসারী তিনি যতটা ছিলেন তার চেয়ে বেশী ছিলেন ছেলেমেয়ের শিক্ষার

www.pathagar.com

ব্যাপারে মনোযোগী। ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় ভাল ফল করলে তিনি ভীষণ খুশি হতেন। আনন্দে তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করতো। আর তিনি আনন্দিত হতেন যখন একটি কবিতা লেখা শেষ করতেন। কবিতা ও কবিতার বই প্রকাশিত হলে তিনি আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠতেন।" ('সংসারে ফররুখ আহমদ' "ফররুখ আহমদঃ ব্যক্তি ও কবি" ঃ শাহবুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত, পৃ. ৪৫)।

কবি-পত্নী আরো লিখেছেনঃ "তাঁর রোজগার খুব বেশী ছিল না, তাই আমাদের সংসারের প্রাচুর্য ছিল না কখনই। কিন্তু, সুখ ছিলো, অভাব-অনটনের মধ্যেও সংসারে প্রশান্তি ছিলো । ... অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। ... আমাদের ঘরে আসবাবপত্র তেমন এখনও নেই, আগেও ছিলো না। সত্যি কথা বলতে কি, আমার মাঝে মাঝে সাধ জাগতো আসবাবপত্র করবার। কিন্তু তা প্রকাশ করা হতো না বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই। সংসার চালাতেই আমাদের বেশ কষ্ট হতো। এ অবস্থায় আসবাবপত্রের কথা তুলবার অবকাশ কোথায়? ... ঢাকায় খুব সুন্দর একটি বাড়ীর স্বপ্ন ছিলো তাঁর। তিনি বলতেন, এমন একটি বাড়ী বানাবেন, যে বাড়ীর সামনে থাকবে পুকুর, থাকবে চমৎকার একটি বাগান। কিন্তু তাঁর সে স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পায়নি। ঢাকায় জমি কিনবার মত সামর্থ্য তাঁর ছিলো না। ... এ জন্য তাঁর আক্ষেপও ছিলো না।" (ঐ, পৃ. ৪৩-৪৪)।

কবি-পত্নীর বিবরণ থেকে তাঁদের দাম্পত্য-জীবন, সংসারের অভাব-অনটন, দুঃখ-দারিদ্র্য, ছোট-খাট স্বপ্নসাধ ও তার অপূর্ণতা-অতৃপ্তির বিষয় জানা যায়। আমরা জানি, কবি ফররুখ আহমদ সারা জীবন সামান্য বেতনে চাকুরী করতেন। চাকুরী ছাড়া অন্য কোনভাবে টাকা রোজগারের কোন চেষ্টাই তিনি কখনো করেননি। অতএব, এ সামান্য রোজগারের বড় সংসার চালাবার কষ্টটুকু তাঁর স্ত্রীকেই বহন করতে হতো। এজন্য তাঁকে কত নিষ্ঠা, ধৈর্য ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে তা হয়ত অন্য কেউ বুঝতে পারেনি। কবি নিজে কখনো তা কাউকে বুঝতে দেননি। কবি-পত্নীও এ ব্যাপারে ছিলেন সদা সতর্ক। সংসারের দুঃসহ দুঃখ-জ্বালা, অভাব-অনটন দু'জনে নীরবে সহ্য করেছেন। এ অভাবের সংসারেও মেহমানদারীতে কখনো কার্পণ্য ছিল না। কবির ঘরের কোন মেহমান কবি-পত্নীর হাতের চা-নাস্তা, বিস্কুট, পান না খেয়ে বিদায় নিয়েছে এমনটি কখনো হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কবির ঘরে মেহমান গেলে কবিকে কিছুই করতে হতো না, কবি কথা বলতে বলতেই কিছুক্ষণের মধ্যেই মেহমানদের চা-নাস্তা এসে হাজির হতো। কবি-পত্নী যেন মেহমানদের জন্য ওগুলো হামেশা প্রস্তুতই রাখতেন!

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ঢাকা বেতার-কর্তৃপক্ষ যখন কবিকে তাঁর চাকুরী থেকে বরখাস্ত করে, তাঁর বেতন বন্ধ করে দেয়, তাঁকে সরকারী বাসা ছাড়ার নির্দেশ দেয়, তাঁর তখন অন্য কোন রোজগারের কোন ব্যবস্থাই ছিল না, ঘরে দু'বেলা চুলা জ্বলা অসম্ভব হয়ে পড়ে, সেই কঠিন দুর্দিনেও তাঁর ঘরের মেহেমানদারীতে কোন কার্পণ্য লক্ষ্য করিনি। কী করে এটা সম্ভব হতো আমি তা ভেবে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ি। এটা প্রধানতঃ কবি-পত্নীর জন্যই সম্ভব হতো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এটা কখনো জিজ্ঞেস না করলেও মনে মনে অনুভব করতাম।

www.pathagar.com

শেষ-জীবনে কবি-পত্নীর চোখের সামনে তাঁর আজীবনের সুখ-দুঃখ, প্রেম-ভালবাসার সঙ্গী বাংলা সাহিত্যের এক অমর প্রতিভা আমাদের সকলের প্রিয় কবি ফররুখ আহমদ ক্ষুধাদীর্ণ, রোগজর্জর, পাণ্ডুর অবস্থায় বিনাচিকিৎসায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন, তার বড় দুই ছেলে অকালে প্রাণত্যাগ করে, তৃতীয় ছেলে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পঙ্গুত্বদশা প্রাপ্ত হয়, এমতাবস্থায় কী দুর্বিসহ জীবনই যে তিনি যাপন করে গেছেন তা অনুমান করাও কঠিন। কবির জীবিতাবস্থায় আমি কখনো আমার স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর বাসায় যাইনি। তবে কবির ইন্তিকালের পর যখনই গেছি, তখন আমার স্ত্রী আমার সাথে থাকতেন। ১৯৭৭ সনে আমি বিদেশ যাওয়ার ফলে অবশ্য আমাদের যাতায়াত কমে গিয়েছিল।

১৯৯৫ সনের দিকে আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে শেষ বারের মত তাঁর আজিমপুরের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। তাঁর কথায় তাঁর দুঃসহ জীবনের দুঃখ-বেদনার সব করুণ চিত্র ফুটে উঠেছিল। আমার স্ত্রী কী বলে যে তাঁকে সান্ত্বনা দেবে সে ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলো না, শরাহত বিহঙ্গের মত সে ব্যাকুল-বিহবল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও তখন তিনি তাঁর পঞ্চম পুত্র সৈয়দ মুহম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান বাচ্চুর বিয়ের ব্যাপারে খুব চিন্তিত ছিলেন। কারণ সংসারের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে সে বিয়ে করতে রাজী ছিল না। কবি-পত্নী আমার স্ত্রীকে বার বার অনুরোধ করলেন তাঁর ছেলেকে বিয়েতে সম্মত করাতে। আমার স্ত্রী তাঁকে কথা দিয়েছিলেন। বাচ্চু সেদিন ঘরে ছিল না। আমার স্ত্রী তার কথা রেখেছিলেন, ইসলামী ব্যাংক মৌচাক শাখায় গিয়ে আমার স্ত্রী বাচ্চুকে অনেক বুঝিয়ে তাকে বিয়ে করতে রাজী করিয়েছিলেন। কবি-পত্নী এ কথা শুনে খুব খুশী হয়েছিলেন এবং আমার স্ত্রীর প্রতি তিনি অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুতে আমরা এক মহিয়সী মহিলাকে হারিয়েছি। আজিমপুরের বাসায় তাঁর সাথে সেই শেষ সাক্ষাতের পর আমার স্ত্রী বহু বার সেখানে যাবার কথা আমাকে বলেছেন। কিন্তু যাই-যাচ্ছি করে কেন জানি আর যাওয়া হয়নি। অবশেষে তাঁর মৃত্যু ও জানাযার খবরটা যখন একসাথে পেলাম, তখন আমাদের সেই অপূর্ণ ইচ্ছাটাই আমাদের মন ও বিবেককে বার বার দুঃসহ দহনে পীড়িত করতে লাগলো । মানুষের এ অক্ষমতা, অপূর্ণতা, অতৃপ্তি ও সীমাবদ্ধতা সকলের জীবনকেই বুঝি দুর্বহ করে তোলে।

www.pathagar.com

আনোয়ার পাশা

শহীদ অধ্যাপক আনোয়ার পাশার স্মৃতি

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আমরা আমাদের অনেক প্রিয়জন হারিয়েছি। একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বর রমনার শ্যামল প্রান্তরে বিজয়ের লাল-সবুজ পতাকা উড্ডীন হবার দু'দিন আগে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কয়েকজন বুদ্ধিজীবীকে ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে যেমন ছিলেন অনেকেরই প্রিয়, দেশবাসীর নিকটও তাঁরা অনেকেই সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দেশ ও জাতিকে তাঁরা তাঁদের প্রতিভা ও যোগ্যতা অনুযায়ী অনেক কিছুই দিয়েছেন। তাই তাঁদের নির্মম হত্যাকাণ্ডে দেশ ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

এমনি একজন স্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন শহীদ অধ্যাপক আনোয়ার পাশা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, বিশিষ্ট কবি, কথাশিল্পী ও প্রাবন্ধিক আনোয়ার পাশা। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন। শুধু শিক্ষক নয়, "ফ্রেন্ড-গাইড-ফিলোসফার' বলতে যা বোঝায় তিনি আমার নিকট ছিলেন অনেকটা তাই। অবশ্য তাঁর সঙ্গে আমি বহু বিষয়ে একমত হতে পারতাম না, কিন্তু তাঁর স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের কাছে, তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত বক্তব্যের কাছে, তাঁর উদার মুক্তচিন্তার উষ্ণতার কাছে আমি প্রায়ই পরাভব স্বীকার করতাম। ক্লাসের বাইরে তাঁর মেসে (পরবর্তীতে তাঁর বাসায়) তিনি ছিলেন অতি সজ্জন, বন্ধু-বৎসল, আলাপচারিতায় আমার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু। প্রায় প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁর সান্নিধ্যে কাটিয়েছি। তাঁর কোমল-মধুর-স্নেহশীল ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিদীপ্ত, যুক্তিশীল নিরলস আলাপচারিতায় আমি ছিলাম সর্বদা মুগ্ধ। এ জন্যই প্রায় প্রতিদিন ক্লাস শেষের অলস বিকেলগুলো তাঁর ড্রয়িং রুমে কাটাতাম। তিনিও এটা খুব পছন্দ করতেন। কোন দিন কোন কারণে যেতে না পারলে, পরবর্তী সাক্ষাতে এর কৈফিয়ত দিতে হতো। আমার সঙ্গে কখনো থাকতো আমার সহপাঠী আব্দুল ওয়াহেদ, নির্মলকুমার আবার কখনো বন্ধু নূরুল আলম রইসী। তবে তারা কেউ নিয়মিত ছিল না। আমি একাই যেতাম অধিকাংশ দিন।

শহীদ আনোয়ার পাশা আমার নিকট ছিলেন হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩২)-এর মতো। ডিরোজিও যেমন উনবিংশ শতকে নব্য শিক্ষিত বাঙালী তরুণদের মধ্যে মুক্তচিন্তা, যুক্তিশীলতা ও জ্ঞানান্বেষণের প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি

www.pathagar.com

করেছিলেন, আনোয়ার পাশাও তেমনি আমার মধ্যে এসব ক্ষেত্রে খানিকটা আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ কারণেই তাঁর সান্নিধ্য পেতে আমার আগ্রহ ছিল প্রবল। ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় মেতে উঠতাম। এবং এসব বিষয়ে আমি এত কিছু জানার সুযোগ পেয়েছি তাঁর কাছে, যা অনেক বই পড়েও জানা কঠিন। তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে তর্কে অবতীর্ণ হয়ে আমার বক্তব্য বিষয়কে তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য আমাকেও অনেক পরিশ্রম করতে হতো, আমার বক্তব্য নানা যুক্তি, বুদ্ধি ও দৃষ্টান্ত দিয়ে ক্ষুরধার করে তুলতে হতো। বলাবাহুল্য, সব বিষয়ে আমরা সর্বদা একমত হতে পারতাম না। আলোচনা-শেষে স্মিত হেসে পরম প্রাপ্তির সুরে তিনি প্রায়ই বলতেন : "দেখ মতিউর, (তিনি এ নামেই সম্বোধন করতেন আমাকে) দুই ব্যক্তি মতবাদের দুই বিপরীত প্রান্তে অবস্থান করেও তারা পরস্পর কত ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত তুমি আর আমি।"

সত্যিই তাঁর পরমতসহিষ্ণুতা ছিল অসাধারণ। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন অতি সরল-সহজ, নিরহংকার। ব্যবহারে ছিলেন মার্জিত—রুচিশীল। জ্ঞানান্বেষণ ও অধ্যয়নে তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। শিক্ষাদানে তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমী। গতানুগতিক শিক্ষাদান পদ্ধতির চেয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জ্ঞান-স্পৃহা সৃষ্টিতেই তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অধিক। এজন্য সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তিনি তেমন অসাধারণ জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন না। তবে তিনি ছিলেন প্রকৃত নিষ্ঠাবান শিক্ষক। প্রচুর পড়াশোনা করে যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে তিনি ক্লাসে আসতেন। তাই ক্লাসের নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর বক্তৃতা কখনো শেষ হতো না। জ্ঞান বিতরণের অদম্য আগ্রহ তাঁর থেকেই যেত। ক্লাসের শেষে তাঁর বৈঠকখানার নিভৃত কক্ষে আমাকে পেলে সেই অসমাপ্ত কাজটি তিনি সানন্দে সম্পন্ন করার প্রয়াস পেতেন।

আনোয়ার পাশা ছিলেন অনেকটা নিঃসঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদে তাঁর আদি নিবাস। ১৯২৮ সনের ১৫ এপ্রিল মুর্শিবাদের অন্তর্গত বহরমপুরে ডবকাই গ্রামে তাঁর জন্ম। হাই মাদ্রাসায় পড়াশোনার পরে তিনি কলেজে ভর্তি হন। বাংলায় এম.এ.পাশ করে তিনি নিজ এলাকায় একটি হাইস্কুলে অল্প বেতনে জুনিয়র শিক্ষক হিসাবে কোন মতে একটি চাকুরী জোগাড় করতে সক্ষম হন। কিন্তু সেটা তাঁর যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত ছিল না। পশ্চিম বাংলার বিদ্বিষ্ট পরিবেশে এর চেয়ে বেশি কিছু প্রত্যাশা করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। যেখানে সরকারী হিসাবেই পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৫ জন মুসলমান অথচ সেখানে সরকারী চাকরীতে মাত্র শতকরা ২ জন মুসলমান কোন মতে স্থান করে নিতে পেরেছে সেখানে এর চেয়ে বেশী আর কী আশা করা যায়! তাই নিজ ভাগ্য গড়ার অদম্য আকাংক্ষা নিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত জন্মভূমি পরিত্যাগ করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। আনোয়ার পাশার জীবনের এ বাস্তব অভিজ্ঞতারই বর্ণনা আছে তাঁর বিখ্যাত 'নীড় সন্ধানী' উপন্যাসে। প্রকৃতপক্ষে, এ উপন্যাসের নায়ক হাসানের চরিত্র-চিত্রণে আনোয়ার পাশা তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানই ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। এ উপন্যাসের নায়ক সম্পর্কে তিনি এক সময় আমাকে লেখা তাঁর এক চিঠিতে বলেছিলেনঃ

"একটি আধুনিক উদার মতাবলম্বী যুবক কোন ধর্মের ধার না ধেরে কেবল একজন মুক্ত মানুষ হিসেবে ভারতের মাটি আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল কিন্তু কেবল মুসলমানের ঘরে জন্ম এই অপরাধে ভারতে তার স্থান হল না– এই কথাটিই উপন্যাসে

www.pathagar.com

আমি দেখাতে চেয়েছি। আমার নায়ক যদি ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত হত এবং ভারতে তার নির্যাতন চলত তাহলে সেটা পাঠকের কাছে স্বাভাবিকতার উর্ধ্বে ভারতীয় মানসের কোনো বিশেষ পরিচয় বহন করত না। ওটা হিন্দুস্থান, অতএব ইসলামী আদর্শ ওখানে মার খাবেই–এই কথাই মনে হত। কিন্তু আমি দেখালাম, মুসলিম ঘরের কোনো যুবক সে যতোই উদারতা দেখাতে যাক–ভারতে তার নির্যাতন এবং অপমান অবশ্যম্ভাবী।" [পাবনা থেকে ২৯.০৩.১৯৬৫ তারিখে আমাকে লেখা চিঠির অংশবিশেষ]।

১৯৫৮ সনে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক গোলাম সাকলায়েন কলেজ থেকে দুই বছরের স্টাডি লীভ নিয়ে বাংলা একাডেমিতে রিসার্স ফেলো হিসাবে যোগদান করলে কলেজে একটি পদ শূন্য হয়। ঐ সময় আনোয়ার পাশাও স্বদেশ ত্যাগ করে এসে পাবনা কলেজে বাংলার অধ্যাপক হিসাবে অস্থায়ীভাবে ঐ শূন্যপদে যোগদান করেন। দু'বছর পর অধ্যাপক গোলাম সাকলায়েন আর স্বপদে যোগ না দেয়ায় আনোয়ার পাশাকে সেখানে স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হয়। ক্রমান্বয়ে তিনি সেখানে বাংলা বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রায় নয় বছর এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যাপনা করার পর ১৯৬৬ সনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে জুনিয়র লেকচারার পদে যোগদান করেন এবং ১৯৭০ সনে তিনি সিনিয়র লেকচারার হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন।

আনোয়ার পাশা পাবনা কলেজে চাকরী পেয়ে খুব খুশী হলেও পাবনার পরিবেশের সাথে নিজেকে খুব একটা খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি। একে তো তিনি ছিলেন বহিরাগত, এদেশে তাঁর কোন আত্মীয়-স্বজন, চেনাজানা লোক ছিল না বললেই চলে। কলেজেও তাঁকে খুব বেশী লোকের সংস্পর্শে আসতে দেখিনি। কলেজে তাঁর একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন তাঁরই স্বদেশী এবং প্রায় একই সময়ে যোগদান করা ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপক রাশিদুল হাসান। পরে তিনি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগে যোগদান করেন এবং একাত্তরে একই সাথে উভয়েই পাক-বাহিনীর হাতে শহীদ হন। বলাবাহুল্য উভয়ে ছিলেন বাল্যবন্ধু এবং মাদ্রাসা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশোনাও প্রায় একই সাথে করেছেন।

আমি ১৯৫৬ সনে ম্যাট্রিক পাশ করে এডওয়ার্ড কলেজে আই.এ ক্লাসে ভর্তি হই। আমি যখন আই.এ দ্বিতীয় বর্ষে তখন আনোয়ার পাশাকে আমাদের শিক্ষক হিসাবে পাই। আনোয়ার পাশা লেখাপড়া নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন, পাঠদান কাজেও ছিলেন অত্যন্ত একনিষ্ঠ। পড়াশোনা ছাড়াও তিনি নিজে কবিতা লিখতেন, গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ লিখতেন এবং আমাদেরকেও লেখালেখির কাজে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অনেকটা নিঃসঙ্গ। স্বদেশ ছেড়ে, নিজের সবকিছু ছেড়ে বিদেশ-বিভূঁইয়ে একটি অস্থায়ী চাকরীর উপর নির্ভর করে জীবন-যাপন করা, ফেলে আসা বাড়ি-ঘর, স্ত্রী-পুত্র (পরে অবশ্য স্ত্রী-পুত্রকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন) আত্মীয়-স্বজন, এমনকি, স্বদেশে মুসলমানদের নিদারুণ নিগ্রহ-বঞ্চনার কথা ভেবেও তিনি প্রায়ই বেদনায় ম্লান হয়ে যেতেন। একজন শিক্ষিত সংবেদনশীল বাস্তুহারা মুহাজিরের জীবনে যে সকরুণ আর্তি, দুঃসহ যন্ত্রণা হৃদয়-মথিত বেদনা আনোয়ার পাশাকে দেখে তা উপলব্ধি করেছি। আমি তাঁর খুব প্রিয় এবং ঘনিষ্ঠতম ছাত্র ছিলাম বলে আমার কাছে প্রায়ই অকপটে তিনি তাঁর এসব দুঃখ-বেদনার কথা বলতেন। আমি নিবিষ্ট মনে তাঁর কথা শুনতাম, তাঁর প্রতি গভীর সমবেদনা অনুভব করতাম এবং মনে মনে আল্লাহর

www.pathagar.com

শুকরিয়া আদায় করতাম এই ভেবে যে, আমি একটি স্বাধীন দেশের অধিবাসী, আমাকে বাস্তুহারা হতে হয়নি, মুসলমান হওয়ার জন্য আমাকে পদে পদে লাঞ্ছিত, অপমানিত, শোষিত, বঞ্চিত হতে হয় না, বৈষম্যের শিকার হতে হয় না। আমার স্বাধীনতা আমাকে দিয়েছে এক আত্ম-বিশ্বাসে পূর্ণ, মর্যাদাশীল স্বাভাবিক জীবন। আমার স্বাধীনতা আমাকে দিয়েছে আমার নিজস্ব বোধ-বিশ্বাস, তাহজীব-তমদ্দুন নিয়ে বেঁচে থাকার গর্বিত অহংকার। পক্ষান্তরে, পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের কথা শুনে, আনোয়ার পাশার নিজের জীবনের কথা শুনে দুঃখবোধ করা ছাড়া আমার অন্য কোন উপায় ছিল না।

একবার গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটিতে আনোয়ার পাশা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী অধ্যাপক রাশিদুল হাসানকে নিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকা এবং দর্শনীয় স্থানগুলো দেখে এলেন। নদী-সমুদ্র, পাহাড়-বনাঞ্চল পরিবেষ্টিত বিচিত্র সৌন্দর্যময় প্রকৃতি, মাঠভরা ফসলের সমারোহ, অসংখ্য মানুষের দুরন্ত জীবন-সংগ্রাম, শহর-বন্দর-গ্রাম জনপদের বিচিত্র জীবনযাপন দেখে তিনি মহাখুশী। বিশেষ করে চট্টগ্রামের দীর্ঘ সমুদ্র-সৈকত, উপকূলে পাথর ও ঝিনুক কুড়ানো, সমুদ্রগামী জাহাজ, বন্দর, পাহাড়, পাহাড়ী খরস্রোতা নদী, গিরি-পাদদেশে আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে চলা, পাহাড়ী উপজাতিদের বর্ণাঢ্য জীবন তাঁর শিল্পীমনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। অনেক দিন পর্যন্ত মুখে কেবলি তাঁর সফরের বর্ণনা, সফর-অভিজ্ঞতার নানা খুঁটিনাটি বিষয়ের বর্ণনা। তাঁর বর্ণনা শুনে আমরাও মুগ্ধ হতাম, কখনো রোমাঞ্চিত হতাম, আবেগে-আনন্দে দেশের প্রতি প্রীতিসিক্ত হতাম।

১৯৬০ সনের জুলাই মাসে আমি পাবনা ছেড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ প্রিলিমিনারীতে ভর্তি হই। পাবনা ছাড়লেও আমার প্রিয় শিক্ষকের কথা কখনো ভুলতে পারিনি। চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেছি। তিনিও আমার চিঠির জবাব দিতেন প্রায় নিয়মিতই। বহু দিন পরে আমার পুরনো ফাইল-পত্র ঘেটে অকস্মাৎ তাঁর লেখা কয়েকটি পোস্ট কার্ড খুঁজে পেলাম। এখানে তার হুবহু বিবরণ তুলে দিলাম। এখানে আমাকে লেখা তাঁর প্রথম চিঠির বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

"প্রীতিভাজনেষু,

ইতিপূর্বেই তোমাকে চিঠি দিয়েছি। আজ তোমার চিঠি পেলাম। তুমি যে 'নীড় সন্ধানী' প্রকাশের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছ এতে খুশী হয়েছি। একটি আধুনিক উদার মতাবলম্বী যুবক কোনো ধর্মের ধার না ধেরে কেবল একজন মানুষ হিসেবে ভারতের মাটি আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু কেবল মুসলমানের ঘরে জন্ম এই অপরাধে ভারতে তার স্থান হ'লনা-এই কথাটিই উপন্যাসে আমি দেখাতে চেয়েছি। আমার নায়ক যদি ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'ত এবং ভারতে তার নির্যাতন চলত তাহলে সেটা পাঠকের কাছে স্বাভাবিকতার ঊর্ধ্বে ভারতীয় মানসের কোনো বিশেষ পরিচয় বহন করত না। 'ওটা হিন্দুস্তান, অতএব ইসলামী আদর্শ ওখানে মার খাবেই'—এই কথাই মনে হ'ত। কিন্তু আমি দেখালাম, মুসলিম ঘরের কোনো যুবক—সে যতোই উদারতা দেখাতে যাক-ভারতে তার নির্যাতন এবং অপমান অবশ্যম্ভাবী'।—এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে পাকিস্তানে কোনো মুসলমানেরই কোনো অভিযোগ এর বিরুদ্ধে থাকবে না বোধ হয়। তাছাড়া, গোলাম মওলা সাহেবের (তাঁর 'নীড়হারা' উপন্যাসের একটি চরিত্র) মধ্যে যে আধুনিক যুগোপযোগী ইসলামের অভ্যুদয় হয়েছে সেটা তোমাদের দৃষ্টি এড়াল কেন? আমি দেখাতে চেয়েছি, ভারতীয় সমাজের প্রতিস্তরে কিভাবে মুসলমানদের জন্য সঞ্চিত

www.pathagar.com

রয়েছে শুধু ঘৃণা আর বিদ্বেষ। মজা কি জান, উপন্যাসখানি হিন্দুরা প্রত্যাখান করেছে Anti-Indian এবং Pro-Pakistani মনোভাব বহন করে এই অজুহাতে। আর এখানে তোমাদের মনে হচ্ছে বইখানি ইসলামী মনোভাবের বিরোধী। যাইহোক, তুমি যে বইখানি প্রকাশের জন্য অকৃত্রিমভাবেই চেষ্টা করছ সেটা বিশ্বাস করছি। এবং আশা করছি, তুমি কৃতকার্য হবে। আর একটি কথা, তোমাদের যে ধারণা রইটিতে আমি কোনো মতবাদ প্রচার করতে চেয়েছি সেটি ঠিক নয়। আমি শুধু ভারতীয় মুসলমানদের দুর্দশা আঁকতে চেয়েছি—যে দুর্দশায় প'ড়ে আজ তারা হয় ধ্বংসের পথে, না হয় Hinduism-এর দিকে এগোচ্ছে।

'নীড় সন্ধানী' অন্য কিছুই নয়– ভারতীয় মুসলমানদের দুর্দশা-চিত্র—এই দৃষ্টিকোণ থেকে একে দেখ। ইতি আনোয়ার।"

উপরোক্ত চিঠিটি ২৯.৩.৬৫ তারিখে পাবনা থেকে লেখা এবং আমার তৎকালীন ঠিকানা ৩৪, আগা মসীহ লেনে পাঠানো। আমি তখন সিদ্ধেশ্বরী নৈশ কলেজে অধ্যাপনা ও দিনের বেলা ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস্-এ চাকরি করি। ১৯৬২ সনে আমি আমার এম.এ. ফাইনাল পরীক্ষা শেষ করে ২৬.১১.৬২ তারিখে ঢাকাস্থ সিদ্ধেশ্বরী কলেজে (বর্তমানে সিদ্ধেশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ) যোগদান করি। এখানে আমাকে লেখা তাঁর পূর্ববর্তী একটি চিঠির উল্লেখ আছে। কিন্তু সেটি বর্তমানে আমার সংগ্রহে নেই। এ রকম তাঁর লেখা অনেক চিঠিই হয়তো আর কখনো খুঁজে পাব না। তাঁর প্রাপ্ত দ্বিতীয় চিঠিটি লাল দালান, রাধানগর, পাবনা থেকে ১৩.৪.৬৫ তারিখে লেখা। এতে তিনি লেখেন ঃ

পত্র নং- ১

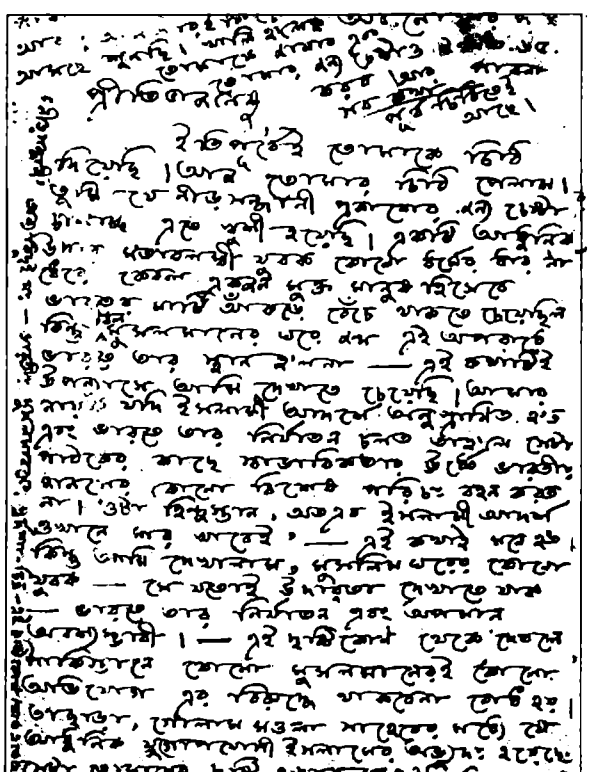

"পরম প্রীতিভাজনেষু,

তোমার চিঠি পেয়ে পরম প্রীত হয়েছি।

www.pathagar.com

পত্র নং- ১ (২য় পৃষ্ঠা)

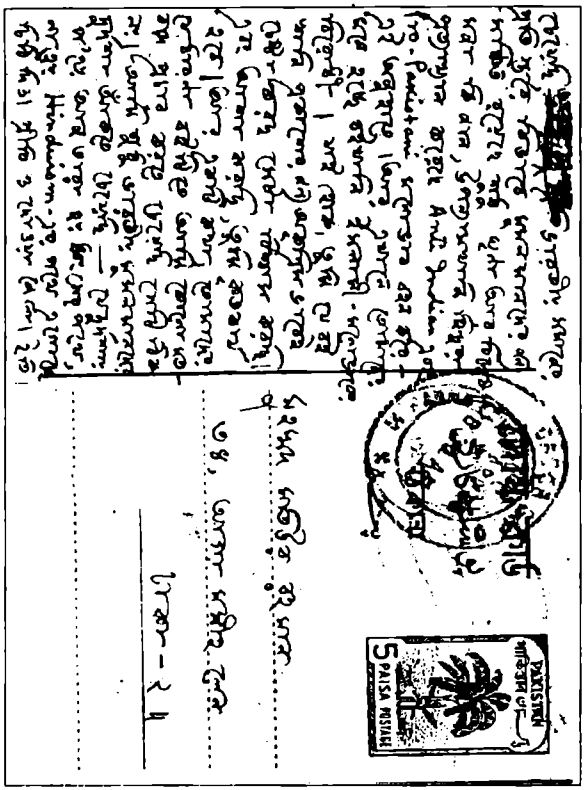

মতভেদটাকেও কতো সুন্দরভাবে মানিয়ে নেওয়া যায় সে প্রমাণ তুমি দিতে পেরেছ। আমি খুশী হয়েছি। এ শিক্ষাই আমি তোমাদের দিতে চেয়েছি। এখন তুমিও শিক্ষক হয়েছ। তুমিও আশা করি ছাত্রদের ঐ শিক্ষা দেবে। সমাজে একই সময়ে নানা মত নানা চিন্তা থাকবেই। আমরা সাধ্যমত যুক্তি চিন্তা প্রয়োগ করে তার একটাকে গ্রহণ করব। তার মানে এই নয় যে অন্যের সম্পর্কে আমাকে অসহিষ্ণু হ'তে হবে। সকলেই নিজের কথা বলুক। যেটা সত্য হবে সেটা আপনার জোরেই সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবে। আর আমার দিক থেকে এই আকাঙ্ক্ষা সব সময়ই মনে পোষণ করব যে, সত্যকে স্বীকার করতে পারার ক্ষমতা নিয়ে বিধাতা যেন আমার চিত্তকে পূর্ণ করে রাখেন। এই শিক্ষা জীবনে পেয়েছি যে, সত্য বড়ো কঠিন। সত্য হয়ে যিনি আমার অন্তরে এলেন, তিনি এতো নির্মম যে আমাকে হয়তো সকলেরই কাছে হেয় হতে হ'ল তার জন্য। সে অবস্থায় অনেকেই সত্যকে বর্জন ক'রে আত্মরক্ষা করে। সেই দুরবস্থা, সেই মিথ্যাচার থেকে খোদা আমাকে রক্ষা করুন।

একাডেমী পত্রিকাগুলি ও আঞ্চলিক ভাষার অভিধান পেয়েছি। পূর্বের চিঠিতে তোমাকে সবি লিখেছি। আমি তোমার কথা সব সময়ই মনে রাখব এবং আমার সাধ্য মতো তোমার জন্য চেষ্টা করব। 'নীড় সন্ধানী'–কে যে কোনো পত্রিকায় প্রকাশ করতে চেষ্টা কর। প্রীতি ও দোয়া জেনো। ইতি—আনোয়ার॥ "

এখানে একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত আছে। সেটা খুলে বলা প্রয়োজন। ঐ সময় এডওয়ার্ড কলেজে বাংলা বিভাগে একটি পদ খালি হয়। আমি তার জন্য দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম। ঐ কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক আমার একান্ত শ্রদ্ধাভাজন এম.এ. হামিদ ও পাবনার ইসলামী আন্দোলনের প্রাণ-পুরুষ মাওলানা আব্দুস সোবহানের একান্ত আগ্রহে আমি সেখানে দরখাস্ত পাঠাই।

www.pathagar.com

পত্র নং- ২

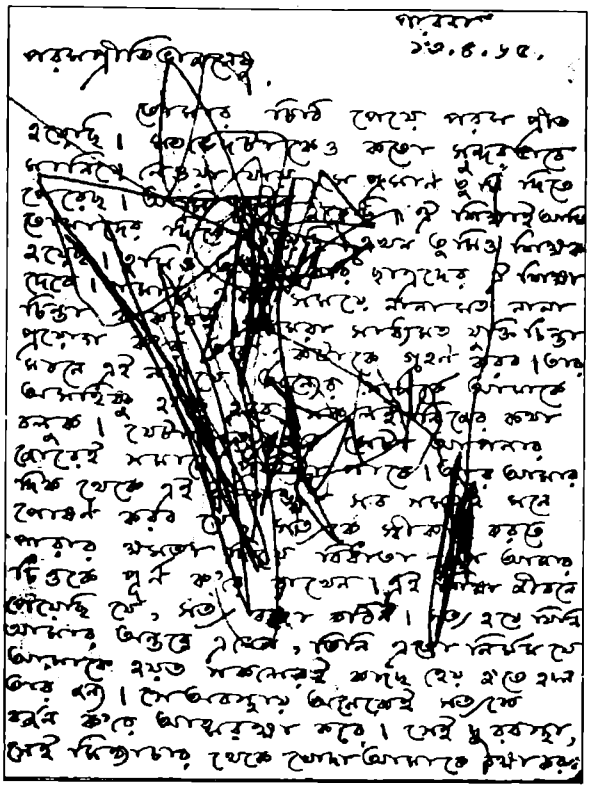

আনোয়ার পাশা তখন সেখানে বাংলা বিভাগের প্রধান। যথারীতি আমি ইন্টারভিউ কার্ড পেলাম। ইন্টারভিউ হলো এবং আমি সিলেকটেট হয়ে সেখানে কাজে যোগদানও করতে গেলাম। আমি তখন ঢাকাতে একাধারে সিদ্ধেশ্বরী নৈশ কলেজ ও দিনের বেলা ফ্রাংকলিনে চাকুরী করি। বেতনও ভাল পাই। ঢাকায় সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে গেছি। এখানে আমার শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে ফ্রাংকলিনের পরিচালক শ্রদ্ধেয় এম.এ. আজম, জনাব নূর মোহাম্মদ আকন, অধ্যাপক আবু হেনা মোস্তাফা কামাল প্রমুখ সকলেই আমাকে ঢাকায় থেকে যেতে বললেন। ফলে একিকে আমার প্রবল পিছু টান ছিল। তাই এডওয়ার্ড কলেজে জয়েন করতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ফিরে এলাম ঢাকায়। এটা আমার জীবনে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। যদি তখন এডওয়ার্ড কলেজে জয়েন করতাম তাহলে আজ আমার জীবনটাই হয়ত সম্পূর্ণ অন্যরকম হতো। ঐ সময় বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী প্রাজ্ঞ এম. এ. আজম আমাকে ফ্রাংকলিনের চাকুরি ছেড়ে না দিয়ে ঢাকায় থাকার পরামর্শ দিয়ে বলেন ঃ "No body is indispensible in this world, but I hope, you need to stay in Dhaka for your sake. I see a better future for you in Dhaka."

বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন এসিস্টেন্ট সেক্রেটারী আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু নূর মোহাম্মদ আকন উপদেশ ছলে যে কথাটি বলেছিলেন আমার মনে তা চিরদিনের জন্য দাগ কেটে আছে। তিনি বলেছিলেন ঃ "শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এবং বি.ডি হাবিবুল্লাহ উভয়ের বাড়িই বরিশাল। উভয়েই প্রতিভাবান রাজনীতিক ছিলেন। কিন্তু শেরেবাংলা 'শেরে বাংলা' হতে পেরেছিলেন এ জন্য যে, তিনি বরিশাল ছেড়ে রাজধানী কলকাতায় গিয়েছিলেন। আর বি.ডি হাবিবুল্লাহ 'বি.ডি হাবিবুল্লাহ'ই রয়ে গেলেন যেহেতু

www.pathagar.com

পত্র নং- ২ (২য় পৃষ্ঠা)

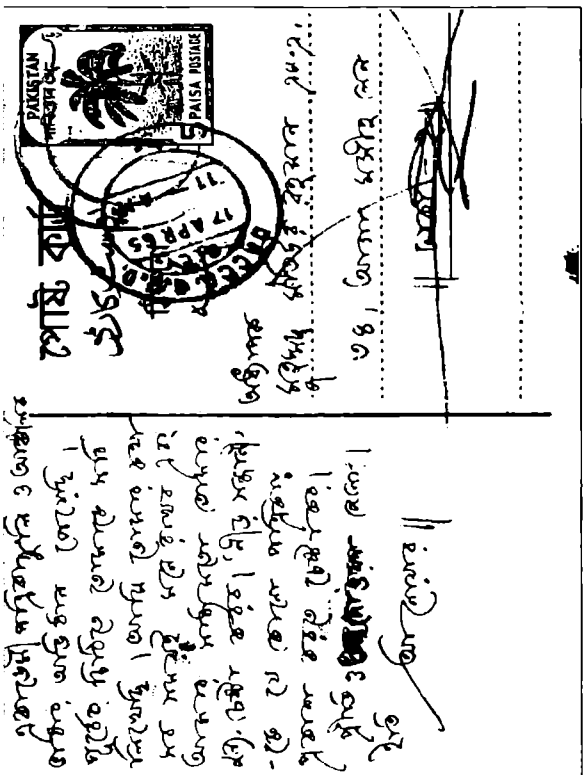

তিনি বরিশাল ছাড়তে পারেননি। অতএব, আপনি যদি বড় কিছু হতে চান, তাহলে রাজধানী ঢাকা ছেড়ে কোথাও যাবেন না।" কথাটা আমার খুব ভাল লেগেছিল।

আমার শ্রদ্ধেয় স্যার মরহুম আবু হেনা মোস্তফা কামাল আমার তখনকার চাকুরীর বেতন ও পাবনা গেলে কত বেতন পাব এ দুটোর তুলনামূলক হিসাব কষে রায় দিনের আমাকে ঢাকায় থেকে যেতে। বললেন ঃ "দেখুন, দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য টাকার প্রয়োজন আছে। খারাপ অবস্থা থেকে ভাল অবস্থায় সহজেই মানিয়ে নেয়া যায়, কিন্তু ভাল অবস্থা থেকে খারাপ অবস্থায় পড়লে মানিয়ে নিতে কষ্ট হয়।" বৈষয়িক চিন্তা যদিও আমাকে কখনো প্রভাবিত করেনি, তবু কথাটা আমাকে ভাবালো।

আমাকে লেখা আনোয়ার পাশার তৃতীয় চিঠিটি "লাল দালান,' রাধানগর, পাবনা থেকে ৯.৫.৬৫ তারিখে লেখা। বলাবাহুল্য, "লাল দালান' এডওয়ার্ড কলেজের সামান্য পশ্চিমে বড় রাস্তার পাশে অবস্থিত একটি বাড়ির নাম, যেটাতে তিনি ভাড়া থাকতেন সপরিবারে। উক্ত চিঠির বক্তব্য হুবহু তুলে দিলাম ঃ

"প্রীতিভাজনেষু,

তোমার দু'খানি চিঠিই পেয়েছি। উপন্যাসটি (নীড় সন্ধানী) সম্পর্কে 'পূবালীর' মতামতের পর তোমার কর্তব্য যেটা হবে সেটা তাড়াতাড়ি কোরো। ওরা প্রকাশ করতে চাইলে ভাল কথা (কোনো বিশেষ অংশ সামান্য রদবদলে আমার আপত্তি নেই)– না হ'লে যতোটা তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠিয়ে দেবে। কেননা ওটা পেলে, অন্য যে একটি সুযোগ পাচ্ছি, সেটার সদ্ব্যবহার করা যাবে। তোমার বেতার কথিকাটি শুনতে পারিনি। তুমি যদি আগে থেকে চিঠি দিয়ে দিনক্ষণ জানাতে তাহলে অবশ্যই ওটা শুনবার চেষ্টা করতাম।

www.pathagar.com

পত্র নং- ৩

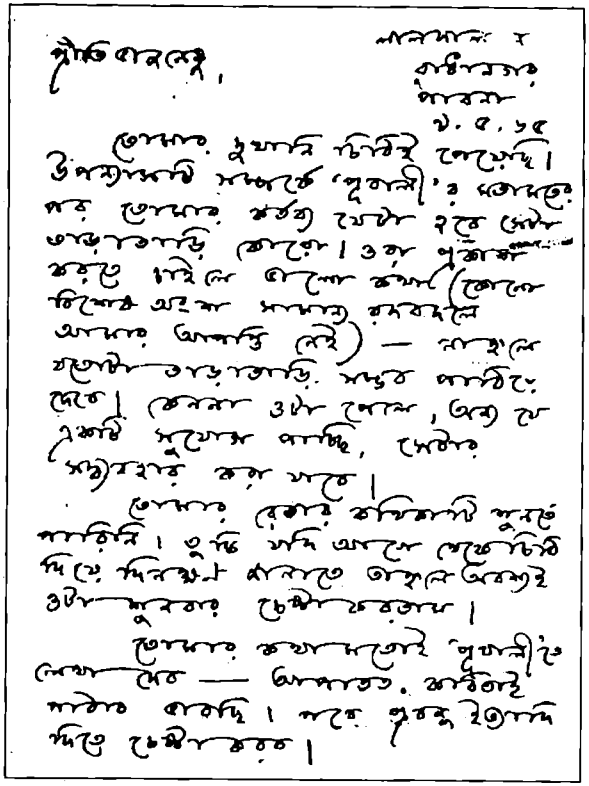

তোমার কথা মতোই 'পূবালী'তে লেখা দেব-আপাতত: কবিতাই পাঠাব ভাবছি। পরে প্রবন্ধ ইত্যাদি দিতে চেষ্টা করব। ইতি— আনোয়ার।"

এ চিঠিও আমার তৎকালীন ঠিকানা ৩৪ নং আগামসীহ লেনে পাঠানো হয়। আমি তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নীড় সন্ধানী' মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ-সম্পাদিত মাসিক 'পূবালী' পত্রিকায় (পত্রিকায় সম্পাদক হিসাবে নাম ছাপা হতো পত্রিকার মালিক নূরুল ইসলামের কিন্তু আসল সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ) ছাপানোর চেষ্টা করছিলাম, চিঠিতে তার উল্লেখ আছে। এরপর তাঁর চতুর্থ পত্রটি পাবনা থেকে ২১.৫.১৯৬৫ তারিখে লেখা। এতে তিনি লেখেন ঃ

"প্রীতিভাজনেষু,

তোমার চিঠি এই মাত্র পেলাম। হ্যাঁ তুমি ঠিকই করেছ, মাহফুজুল্লাহ সাহেব (বিশিষ্ট কবি-সমালোচক মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌) নিজেই প্রয়োজন মতো কিছু রদবদল করে নিন- সেই ভাল হবে। আপাতত: কোনো মতে বইটা প্রকাশিত হোক- এই আমি চাই। পরে গ্রন্থাকারে কখনো যদি বের করার সুযোগ মেলে তখন আমি নিজে যা ভালো বুঝি সেই রকম করব। বর্তমানে সম্পাদক সাহেব যেভাবে চান আমি তাতেই রাজি। মাহফুজুল্লাহ সাহেব ওটিকে কষ্ট করে পড়েছেন এবং নিজেই কিছু কিছু রদবদলের যে দায়িত্ব নিয়েছেন আমি তাতে খুশি হয়েছি। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ..... ইতি— আনোয়ার।"

পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যাপক আনোয়ার পাশা প্রায় নয় বছর সুনামের সাথে চাকুরী করলেও কিছু ব্যক্তিগত কারণে তিনি সেখানে খুব একটা স্বস্তিবোধ করছিলেন

www.pathagar.com

পত্র নং- ৩ (২য় পৃষ্ঠা)

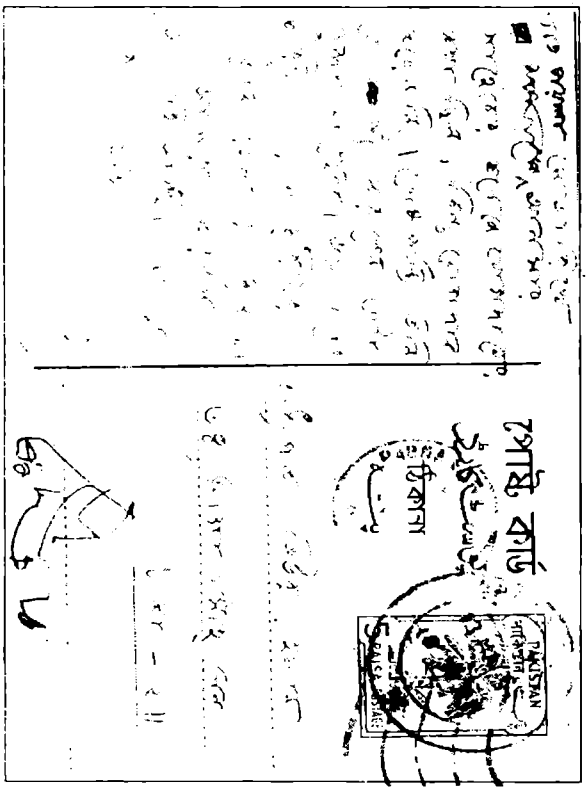

না। তাঁর দু'একজন সহকর্মী তাঁর প্রতি কিছুটা ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েন। কালক্রমে ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা সেখান থেকে ছিটকে পড়েন এবং তিনি নিজে বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত হন। ইতোমধ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীর চেষ্টা করতে থাকেন এবং আমার মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল হাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। হাই স্যার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার যেমন শিক্ষক ছিলেন, রাজশাহী কলেজে এক সময় তেমনি আনোয়ার স্যারেরও শিক্ষক ছিলেন। আনোয়ার স্যার আমার মাধ্যমে হাই স্যারের চিঠি বা মেসেজ পাঠাতেন। আমি তা হাই স্যারকে পৌঁছে দিতাম। হাই স্যার পরে আমাকে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে জানাতেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে আনোয়ার স্যারকে জানাতাম তা পালনের জন্য। এভাবে আমার দৌত্যগিরির ফলে এক সময় হাই স্যার আমাকে জানালেন আনোয়ার স্যারকে ঢাকায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। আমি যথারীতি আনোয়ার স্যারকে তা জানালে তিনি কালবিলম্ব না করে আমাকে তাঁর ঢাকায় আসার দিন-ক্ষণ জানালেন এবং এ-ও জানালেন যে, তিনি ঢাকায় এসে আমার বাসায়ই উঠবেন।

আমি তখন নয়া পল্টনে দৈনিক ইত্তেফাকের সাংবাদিক, ভাষা-সৈনিক হাসান ইকবালের বাসায় একটা রুম নিয়ে থাকি। হাসান ইকবালের স্ত্রী কিছুটা দীর্ঘ সময়ের জন্য তখন দেশের বাড়ি গেছেন। আমি ব্যাচেলর, সিদ্ধেশ্বরী কলেজে চাকরীরত। সেখানে আনোয়ার স্যার এসে আমার মেহমান হলেন। তখন শীতকাল। স্যারের স্বতন্ত্র বিছানা ও একটি কম্বল দরকার। স্যারকে নিয়ে সন্ধ্যার দিকে গেলাম বায়তুল মুকাররমে। স্যারের পছন্দ মতই পেশোয়ারে তৈরি একটি পশমী কম্বল কিনলাম। রাতে আমার

www.pathagar.com

বিছানায় স্যারকে শুইয়ে দিয়ে আমি নীচে বিছানা করে শুয়ে পড়লাম।

পত্র নং- ৪

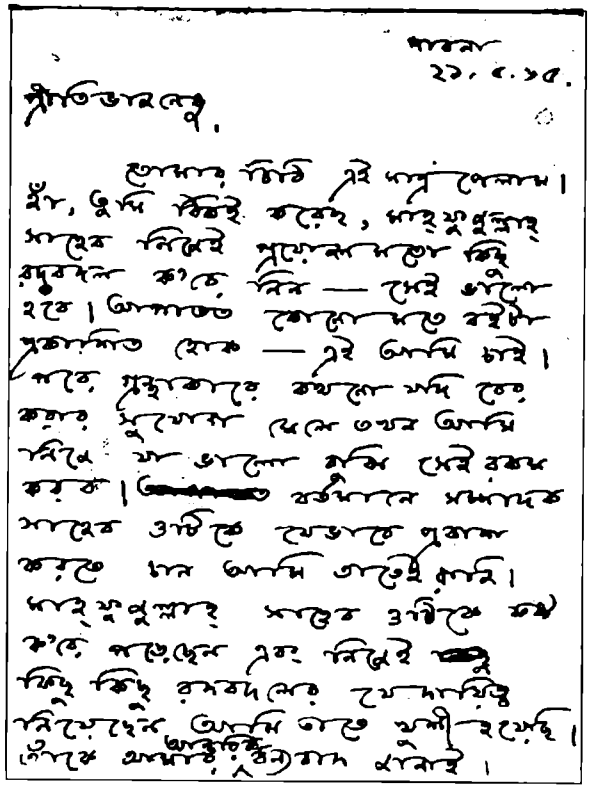

পরের দিন বিকেলে আনোয়ার স্যারকে নিয়ে হাই স্যারের বাসায় গেলাম। বিল্ডিংয়ের সামনে সবুজ চত্বরে কয়েকটি চেয়ার সাজিয়ে হাই স্যার সেখানে আমাদের দুজনকে নিয়ে বসলেন। চাকরীর দরখাস্ত ও আনুষঙ্গিক কাগজ-পত্র জমা দেয়ার পর সে সম্পর্কে হাই স্যার ও আনোয়ার স্যারের মধ্যে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা হয়। এর পর শুরু হয় নানা প্রসঙ্গে আলোচনা। চা-নাস্তা এলো। আলোচনা প্রসঙ্গে এক সময় আনোয়ার স্যার হাই স্যারকে উদ্দেশ্য করে বললেন : "স্যার আমি আবুল ফজলের 'রাঙা প্রভাত' উপন্যাস নিয়ে একটি বই লিখতে চাই, কিন্তু মতিউর বলছে ফররুখ আহমদকে নিয়ে লিখতে।" হাই স্যার বললেন : "ফররুখ আহমদকে নিয়ে লেখার সময় এখনো হয়নি, তুমি বরং আবুল ফজলকে নিয়েই লেখ।"

আনোয়ার স্যার খুব খুশী হলেন একথা শুনে, আমি তেমনি হলাম নিরাশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, তার কিছুদিন আগে থেকে আমি কবি ফররুখ আহমদের উপর একটি বই লেখার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানিয়ে আসছিলাম এবং তিনি তাতে অনেকটা রাজীও হয়েছিলেন। কিন্তু ঐদিন হাই স্যারের মতামত শুনে আমার সে প্রস্তাবে আর সায় দিলেন না। তারপর 'সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল' শীর্ষক একটি বই লিখে তিনি প্রকাশ করেন। অবশ্য পরে ফররুখ আহমদের উপরও তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

আনোয়ার পাশা ছিলেন একাধারে কবি, কথাশিল্পী, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাবিদ। তাঁর প্রকাশিত উপন্যাস হলো ঃ নীড় সন্ধানী, নিশুতি রাতের গাথা, রাইফেল রোটি আওরাত। গল্প ঃ নিরুপায়, হরিণী। কাব্য ঃ নদী নিঃশেষিত হলে। প্রবন্ধ ঃ সাহিত্যশিল্পী আবুল

www.pathagar.com

পত্র নং- ৪ (২য় পৃষ্ঠা)

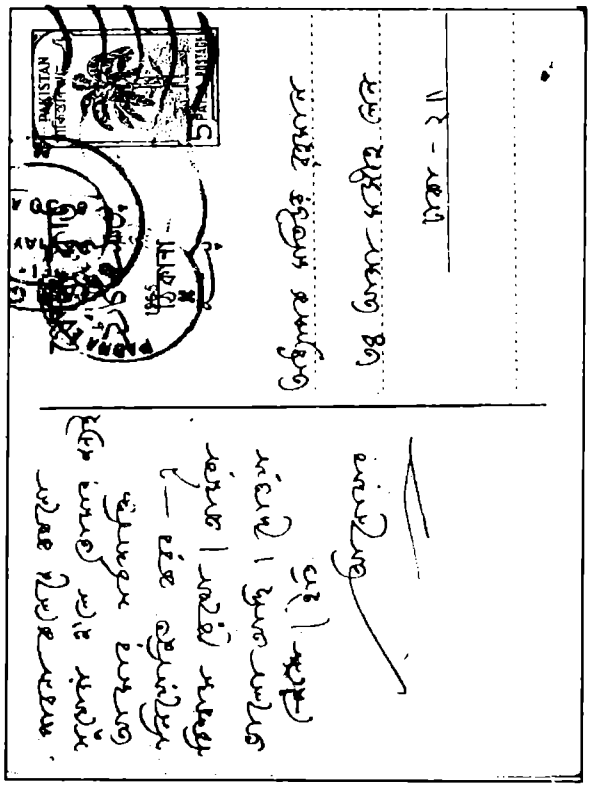

ফজল, রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা, ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড।

পুরস্কার ঃ বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার ১৯৭২ (মরণোত্তর)।

১৯৭১ সনের ১৪ ডিসেম্বর অধ্যাপক আনোয়ার পাশা পাক-বাহিনীর হাতে নিহত হন। তাঁর এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে আমি গভীর বেদনায় ভারাক্রান্ত হই। মৃত্যুর দুদিন আগে তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম এবং যথারীতি নানা প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে অনেকটা রাত করেই বাসায় ফিরে এসেছিলাম। প্রিয় বন্ধু, শিক্ষক ও অনুপ্রেরণাদাতা আনোয়ার পাশার সাথে সেই আমার শেষ দেখা। সেদিন কোনমতেই ভাবতে পারিনি যে মৃত্যুর হিংস্র থাবা এভাবে তাঁকে পৃথিবীর আলো-হাওয়া থেকে অকালে নিঃশেষিত করে দেবে। অথচ তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন। বাঁচার জন্য আজন্ম সংগ্রাম করেছেন, স্বপ্ন দেখেছেন। বাঁচার তাগিদেই হিন্দুস্থানের বৈরি পরিবেশ থেকে তিনি ছুটে এসেছিলেন এখানে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এখানেও তিনি নৃশংস মৃত্যুর কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না। এ উপলব্ধির কথাই কি তিনি তাঁর 'নীড়-সন্ধানী' উপন্যাসে লিখে গেছেন? তিনি লিখেছেন ঃ "মানুষের ইতিহাসে এইটেই বোধ করি বড় ট্রাজেডি যে কখনো অমৃত-সন্ধানে যাত্রা করে হলাহলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি।"

নিজের জীবন দিয়ে তিনি তাঁর এ উক্তির সারবত্তা প্রমাণ করে গেছেন।

www.pathagar.com

অন্তরঙ্গ আলোকে শাহেদ আলী

বাংলা সাহিত্যের অমর কথাশিল্পী অধ্যাপক শাহেদ আলী (জন্ম: ৪ঠা জুন, ১৯২৯ সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজিলায় মাহমুদপুর গ্রামে) দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর মঙ্গলবার ৬ নভেম্বর, ২০০১ ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৬২ সনে। তখন উনি ঢাকাস্থ ইসলামিক একাডেমীর (বর্তমান ইসলামিক ফাউন্ডেশন) প্রকাশনা বিভাগের দায়িত্বে। সে সুবাদে তিনি 'ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা'র সম্পাদক। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ শেষ বর্ষের ছাত্র। ১৯৬৩ সনে অধ্যাপক শাহেদ আলী ইসলামিক একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'মাসিক সবুজ পাতা'রও সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আমি ১৯৬২ সনেই এম.এ পাশ করে ঢাকাস্থ সিদ্ধেশ্বরী কলেজে (বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ) অধ্যাপনা শুরু করি। ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা ও সবুজ পাতায় লেখালেখির সুবাদে শাহেদ ভাইর সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় রূপ লাভ করে। প্রথম থেকেই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় এবং তাঁর অমায়িক আচরণে এত মুগ্ধ হই যে, তাঁকে একজন পরামাত্মীয় মনে হয়। ফলে তাঁকে শ্রদ্ধাভরে 'শাহেদ ভাই' সম্বোধন করি। তিনিও সম্ভবত আমাকে ছোট ভাইয়ের মতই স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। ১৯৬৩ সনে যখন তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'একই সমতলে' প্রকাশিত হয় তখন তৎকালীন মাসিক 'মাহে নও' এর সম্পাদক কবি তালিম হোসেন আমাকে বইটির একটি কপি দিয়েছিলেন সমালোচনা লেখার জন্য। সমালোচনাটি যথাসময়ে মাহে নও-তে ছাপা হয়েছিল।

আমি ১৯৭৭ সনের ১২ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৯৭ সনের ৫ জানুয়ারী দীর্ঘ প্রায় বিশ বছর জীবিকান্বেষণে দুবাইতে প্রবাসী জীবনযাপন করি। প্রথম এক বছর এটা-ওটা করার পর দুবাই চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিতে প্রকাশনা বিভাগে সম্পাদক হিসাবে চাকুরী পাই। প্রবাস-জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি উক্ত চাকুরীতে নিয়োজিত থাকি। ইতোমধ্যে ১৯৮১ সনে প্রবাসী বাংলাদেশী ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুবিধার্থে সেখানে 'বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুল' নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করি। স্কুলকে কেন্দ্র করে মাসিক সাহিত্য সভা, বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। ১৯৯০ সন থেকে স্কুলের পক্ষ থেকে প্রতি বছর বাংলা সাহিত্য সম্মেলন, বাংলা পুস্তক প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করি। সাহিত্য সম্মেলনে প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে একজন বিশিষ্ট কবি-

www.pathagar.com

সাহিত্যিককে প্রধান অতিথি হিসাবে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যাই এবং স্কুলের পক্ষ থেকে সে বছর তাঁকে সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করি।

১৯৯২ সনে দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে দাওয়াত দেয়া হয় প্রখ্যাত কথাশিল্পী, বিশিষ্ট লেখক, ইসলামী চিন্তাবিদ, ভাষা-সৈনিক অধ্যাপক শাহেদ আলীকে। ফেব্রুয়ারী ২৭ ও ২৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে প্রধান অতিথি শাহেদ আলী ছাড়া বিশিষ্ট মেহমান হিসাবে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী কর্নেল (অব) এ. এস.এম. মুস্তাফিজুর রহমান, সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আহমদ ফরিদ উদ্দিন, দুবাইর কনসাল-জেনারেল মাসুম আহমদ চৌধুরী, ভাইস-কনসাল তাজামূল হোসেন, দুবাই শিক্ষা বিভাগের পরিচালক রাশেদ আহমদ আল-মানসুরী ও প্রবাসী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত হওয়ার জন্য দাওয়াত দিয়ে শাহেদ ভাইকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম তা নিম্নরূপ ঃ

"শ্রদ্ধেয় শাহেদ ভাই.

আসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি আল্লাহর ফজলে সর্বাঙ্গীন কুশলে আছেন। ছুটিতে দেশে গিয়ে প্রবাসে বাংলা সাহিত্য সম্মেলনে এবং বাংলা পুস্তক প্রদর্শনীর বিষয়ে আপনার সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিশেষতঃ শ্রদ্ধেয় দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সাহেবের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি ও বক্তব্য আমাদের স্মৃতিপটে আজও জাগরূক। ইতোমধ্যে 'বাংলা সাহিত্য পরিষদে'র সভাপতি এবং পরিচালক, যথাক্রমে প্রবীণ সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ বন্ধুবর আবুল আসাদ ও আবদুল মান্নান তালিবের সংগে পত্র যোগাযোগ ও কয়েকবার টেলিফোনে আলাপ হয়েছে। এখানে বাংলাদেশ কনসাল জেনারেল মাননীয় মাসুম আহমদ চৌধুরীর সাথেও এবারের সাহিত্য সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। সকলের মতামত অনুযায়ী আমরা 'বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুল', দুবাইয়ের উদ্যোগে দুবাইতে দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য 'বাংলা সাহিত্য সম্মেলন ও পুস্তক প্রদর্শনী'তে আপনাকে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদানের আমন্ত্রণ জানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আগামী ২৭ ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠানের দিন ধার্য হয়েছে। এটি উদ্বোধনের জন্য বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে এবং তিনি তাতে সদয় সম্মতি জানিয়েছেন।

বাংলা ভাষা আন্দোলনে 'তমদ্দুন মজলিশে'র সক্রিয় ভূমিকার সাথে আপনার অবদান স্মরণীয়। এছাড়া, বাংলা সাহিত্য সাধনায় বিশেষতঃ বাংলা কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আপনার সৃষ্টি স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল। এ অবদান ও মূল্যবান ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা সাহিত্যানুরাগী প্রবাসীদের পক্ষ থেকে আমাদের কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আপনাকে এই সনির্বন্ধ আমন্ত্রণ। আশা করি, আমাদের এই আমন্ত্রণে আপনি আন্তরিক সাড়া দেবেন।

সম্মেলন অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগেই এখানে আপনার উপস্থিতি আবশ্যক। এছাড়া, সম্মেলনের পরে আমিরাতে বিভিন্ন অঞ্চলে আপনার উপস্থিতিতে সাহিত্য সভার আয়োজন করা হবে। অতএব, এখান থেকে যথাসময়ে ভিসা ও টিকেট পাঠাবার ব্যবস্থা করব। এছাড়া, এখানে অবস্থানকালে গরীবানা হালে আপনার থাকা- খাওয়ার ব্যবস্থাও করা হবে।

আপনার জীবনপঞ্জী বিশেষতঃ সাহিত্যকৃতির বিস্তারিত বিবরণ, পাসপোর্ট ফটোকপি ও ৫/৬ কপি পাসপোর্ট সাইজের ফটো যথাশীঘ্র পাঠাবেন। পুস্তক প্রদর্শনী উপলক্ষে আপনার প্রকাশিত সব বইয়ের একাধিক কপি পেলে আমরা আনন্দিত হব। এছাড়া, বাংলা সাহিত্য

www.pathagar.com

পরিষদ, প্রীতি প্রকাশন, শিল্পতরু ও অন্যান্য সহযোগী প্রকাশনা সংস্থার সহযোগিতাও এ ক্ষেত্রে একান্তভাবে কাম্য। আপনার মাধ্যমে আমরা এ সহযোগিতা লাভে প্রত্যাশী। সত্বর আপনার প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষায় রইলাম। ইতি,

আপনার প্রীতিধন্য
মুহম্মদ মতিউর রহমান
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুল, দুবাই
ও সভাপতি, বাংলা সাহিত্য সম্মেলন, দুবাই"।

সম্মেলন শেষে আমিরাতের রাজধানী আবুধাবী, আল আইন, শারজাহ, সোনাপুর প্রভৃতি স্থানে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও শাহেদ ভাই প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন এবং সেখানকার বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী বিশেষত সাহিত্যানুরাগীদের সাথে তাঁর অন্তরঙ্গ মেলামেশা ও মতবিনিময় ঘটে। প্রবাসী বাংলাদেশীরাও তাঁকে পেয়ে বিপুলভাবে উৎসাহিত হয় এবং শাহেদ ভাইর সাহিত্য সম্পর্কে ও সেই সাথে বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক অবস্থা ও গতিধারা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অনেক কিছু জানার সুযোগ পায়। প্রবাসীদের জন্য এটা ছিল এক অপূর্ব সুযোগ। ইতোপূর্বে এভাবে তারা দেশের কোন খ্যাতনামা কথাশিল্পীকে আর কখানো এমন নিকট-সান্নিধ্যে পায়নি। শাহেদ ভাইও প্রবাস-জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রবাসী কবি-সাহিত্যিকদেরকে গল্প-উপন্যাস লেখার উপদেশ দেন।

উক্ত সম্মেলনের বিস্তারিত খবর পরিবেশন করে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সবগুলো ইংরেজী পত্রিকা। তাছাড়া, সর্বাধিক প্রচারিত ইংরেজী দৈনিক 'খালিজ টাইম্‌স'- এ শাহেদ ভাইর সাক্ষাৎকার এবং সাপ্তাহিক 'গাল্‌ফউইকলি'তে শাহেদ ভাই সম্পর্কে সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হয়। ফলে বিদেশে সকল ভাষাভাষী মানুষ একজন বাংলাদেশী জনপ্রিয় লেখক সম্পর্কে জানার সুযোগ পায়। পত্রিকার সাক্ষাৎকারগুলো আমার বাসাতেই অনুষ্ঠিত হয়। পত্রিকার রিপোর্টারদেরকে আমার বাসায় দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসেছিলাম। 'খালিজ টাইমস' এ শাহেদ ভাই সম্পর্কে লেখা হয়ঃ

"Prof Shahed Ali writes short stories and novels about the wretched and the damned, the millions of poor people who inhabit his country. He has been writing about them since 1940 and his commitment to their cause is unswerving, despite the numerous awards and encomius he has won over the decades. The 67-year-old professor has written short stories, a score of novels, essays on religious and cultural issues and also translated English books. His own novels have been translated into Urdu, English and Russian.

"The author was at the forefront of the Bengali language movement in the then East Pakistan, way back in the early 1950s : We started a cultural movement to save our language and literature", he remarked.

দুবাই থেকে প্রকাশিত Daily Gulf News এবং Daily Emirates News- এ শাহেদ ভাই সম্পর্কে রিপোর্ট ছাপা হয়। এছাড়া, দুবাইর আবুধাবী থেকে প্রকাশিত Gulf Weekly Magazine শাহেদ ভাই সম্পর্কে পূর্ণ পৃষ্ঠাব্যাপী সচিত্র বিবরণ প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয় ঃ "Professor Shahed Ali, whose early writting coincided with the Pakistan movement and who has been recognised as one of the most

www.pathagar.com

outstanding literary figues in the movement to preserve the Bengali language, is not a man of long, complex or many words. By most Bengali standards, he is not even prolific.... That Professor Shahed Ali is effective is borne out by the impact which his pieces have evoked amongst his readers. His first short story, Tears (অশ্রু), was written when he was still in school. It was published in the monthly Shaugath in 1940 and immediately attracted attention because it was a simple, yet powerful tale. There were also other writings at this stage.

"..... Whatever the motivation, young Shahed Ali's pen continued to record the most significant impressions of his life. And gradually, he began to find his own niche within the literary circles of the new Pakistan. When the people of East Pakistan launched what has since come to be known as the Language Movement, Shahed Ali was at the forefront as the editor of a publication called 'Sainik', which soon became recognised as the leading exponent of this movement.

"But while speaking out to protect and enrich his mother tongue, the Professor did not restrict himself to the language movement alone. His writings began to reflect a wider, a more universal canvas. There were short stories, novels, translations and sevral works on the singular problems and experiences of Muslims in Bengal.

"My writings are about my experiences, about my environinment. There is a great deal about rural life but my themes are also urban. Often, I respond to my own feelings, about the anomalies in urban life, about the erosion of social values, in moral standards, he explains, adding that the sum total of his message is to illustrate and convey the sufferings, the pain and the tragedies which people are forced to bear and struggle against.

"But I do'nt believe that a writer can or should try to create anything outside the context of his own experience. To be authentic, you must be a product of your environment', he states, arguing against the theory that true poets and writers are bonded to humanity at large, not to a particular place or time. 'A writer', he states emphatically, 'born in a particular country, at a particular time and in a particular society."

উক্ত সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে শাহেদ ভাই ১৫ দিন দুবাইতে আমার ইউসুফ বাকেরস্থ বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। সেটা এখন আমার জীবনের এক মধুময় স্মৃতি হয়ে আছে। তাঁকে এত ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে পাব তা আগে কখনো কল্পনাও করতে পারিনি। দুবাই এয়ারপোর্টে তাঁকে বন্ধু-বান্ধবসহ রিসিভ করা থেকে শুরু করে, দুবাইসহ বিভিন্ন শহরে প্রায় অর্ধডজন অনুষ্ঠানে যোগদান, বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকদের দাওয়াত দিয়ে এনে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা, খাবার টেবিলে এবং প্রায় সর্বত্র, শয্যাগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় অষ্ট প্রহর তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে দুবাই এয়ারপোর্টে তাঁকে প্রগাঢ় বিদায় অভিনন্দন জানানো পর্যন্ত সব মধুময় স্মৃতিগুলো আমাকে এখনো আবেগাপ্লুত করে। আমার ও আমার পরিবারের প্রতি তাঁর অসাধারণ বিনয় ও সৌজন্যমূলক আচরণ আমাকে গভীরভাবে অভিভূত করেছে।

www.pathagar.com

আমার বড় ছেলে জাহিদ তখন আমেরিকায় লেখাপড়া করতো। বড় মেয়ে সুমাইয়া ছোট মেয়ে আফিয়া ও ছোট ছেলে আবিদকে নিয়ে তিনি প্রায়ই গল্প জমিয়ে বসতেন। কোয়েল পাখির গোশত তাঁর খুব পছন্দ ছিল। একদিন দোকান থেকে এক প্যাকেট ফ্রোজেন পাখি নিয়ে এলেন বাসায়। আমার স্ত্রী খালেদা রহমান খুব যত্ন করে তাঁর ইচ্ছামত ভূনা করে গোশ্তগুলো রেঁধে খাবার টেবিলে রাখলেন। শাহেদ ভাই সানন্দে তা খেলেন। তা দেখে আমিও খুব তৃপ্তি অনুভব করলাম।

ঐ দুই সপ্তাহ আমি তাঁর সঙ্গে বহু বিষয়ে মত বিনিময় করার সুযোগ পেয়েছি। বিশেষ করে তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, সাহিত্য-জীবনের উন্মেষ, ভাষা আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, তমদ্দুন মজলিশ, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় নানা প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে বারবার এসেছে আমাদের আলোচনায়। এসব বিষয়ে তাঁর প্রাজ্ঞ-অভিজ্ঞ মতামত আমাকে মুগ্ধ করেছে। সেসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। প্রবাস-জীবনে আমি তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। এখানে সেটা তুলে দিচ্ছি, এতে ওসব বিষয় অনেকটাই প্রতিফলিত হয়েছে। সাক্ষাৎকারটি ইতোপূর্বে 'বাংলা সাহিত্য সম্মেলন-সংকলন ১৯৯২' তে মুদ্রিত হয়েছে।

"প্রশ্নঃ আপনি নিঃসন্দেহে আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের অন্যতম শক্তিশালী লেখক। কিন্তু অনেকেরই অভিযোগ তুলনামূলকভাবে আপনার কাছ থেকে কম লেখা পাওয়া গেছে। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তরঃ অধ্যাপক শাহেদ আলীঃ এটি সত্য যে, আমার লেখার সংখ্যা খুব বেশি নয়, কমই বলা যায়। এ প্রসঙ্গে সমালোচক, কবি আব্দুল মান্নান সৈয়দের একটি উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি প্রায়ই আমার সম্পর্কে বলেন যে, আমি একজন স্বল্পপ্রজ লেখক। আমি তাঁর জবাবে বলি, এমন মানুষ আছে যাঁর অনেক সন্তান, কিন্তু কোন সন্তানই মানুষ হল না। আর, কেউ কেউ আছে, যার দু' একটি সন্তান, সন্তানগুলো মানুষ হল। পিতা হিসাবে কে বেশি সার্থক? আমি মনে করি দ্বিতীয় জনই পিতা হিসাবে সার্থক। আমার আরো বেশি লেখা সম্ভব হত। অনেক কারণ ঘটেছে জীবনে। যার জন্য সবসময় সে সুযোগ ঘটে উঠেনি।

প্রশ্নঃ আপনার সর্বাধিক আলোচিত গল্প 'জিবরাইলের ডানা'। এ গল্পটি সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তরঃ বিতর্কটি ঠিক বিভিন্ন সময়ে সৃষ্টি হয়েছে তা ঠিক নয়। গল্পটি ১৯৪৮ সালে আমি লিখি। তার পর গল্পটি ইউনিভারসিটিতে বি, এ-তে পাঠ্য হয়। সবগুলো কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশে পাঠ্য ছিল। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েও বাংলাতে পাঠ্য ছিল। তখন এ গল্প নিয়ে কোন বিতর্কের সৃষ্টি হয়নি। ১৯৮০/৮৫-র আগ পর্যন্ত এ গল্প নিয়ে কোন বিতর্ক হয়নি। অনেকে মনে করতেন এ গল্পটি এপারের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্প। কবি ফররুখ আহমদের কাছে এ গল্পটি অত্যন্ত প্রিয় ছিল। যে কারণে তিনি 'জিব্রাইলের ডানা' বইখানা সাথে সাথে রাখতেন। পাকিস্তান হওয়ার পর বলা যায় এ বইখানাই এপারের প্রথম গল্প গ্রন্থ। কবি ফররুখ আহমদ বলতেন, আমাদের গল্প শুরু হয়েছে জিব্রাঈলের ডানা থেকে। আসলে পরে যারা বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন, আমি মনে করি তারা সাহিত্য-বিচারক নন শুধুমাত্র ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পটি বিচার করেছেন। কিন্তু এটি কোন ধর্মীয় গল্প নয় এটি একটি creative art মাত্র।

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ বাংলাদেশে অন্য যাঁরা ছোট গল্প লিখছেন এদের মধ্যে কার লেখা আপনার সবচেয়ে ভাল লাগে?

উত্তরঃ এটা বলা মুশকিল। হাসান আজিজুল হক, শহীদ আকন্দ, হাসানাত আবদুল হাই, রাহাত খান, এদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ ছোট গল্পের জগতে যারা সবে পদচারণা শুরু করেছেন তাদের মধ্যে কাদেরকে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরঃ এটাও বলা মুশকিল। কেননা, আমার পাঠের যে পরিসর তা খুব সংক্ষিপ্ত তবে প্রায়ই নবীনদের গল্প পড়ার চেষ্টা করি। এসব পড়ে বিরাট প্রতিভাশালী কোন গল্পকারের সাক্ষাৎ আজো পাইনি। তবে কারো কারো মাঝে সম্ভাবনা আছে এবং তা পরিণতির অপেক্ষায় আছে।

প্রশ্নঃ আমাদের দেশে প্রকাশনা শিল্পে যে সংকট, দেশী লেখকদের বই প্রকাশে এক শ্রেণীর প্রকাশকের যে অনীহা এবং সেই সাথে সীমান্তের ওপার থেকে আসা অসংখ্য সস্তা দরের বই আমাদের বাজার ছেয়ে ফেলছে এবং তাতে যে সংকট সৃষ্টি হচ্ছে, সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তরঃ সত্যিকার অর্থে সাহিত্য-শিল্পকে ভালবেসে প্রকাশনায় নেমেছে, এরকম কোনো প্রকাশক আমাদের দেশে নেই। আমাদের দেশের প্রকাশনা-শিল্প প্রকৃত অর্থে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। শুধুমাত্র অধিক মুনাফা অর্জনের দিকেই আমাদের বেশির ভাগ প্রকাশকের ঝোঁক। মূলতঃ এরাই ওপারের রদ্দি সাহিত্য অনুমতি নিয়ে-না নিয়ে ছাপাচ্ছে। আমাদের পাঠকদেরও ওপারের সাহিত্যের প্রতি একটা ঝোঁক রয়েছে। একটা inferiority বা হীনমন্যতা এদেরকে গ্রাস করেছে। এছাড়া, ওপার থেকে পরিকল্পিতভাবে আমাদের মধ্যে হীনমন্যতা সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং আমাদের মগজ ধোলাইয়ের যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

প্রশ্নঃ ভাষা-আন্দোলনের সময় সাপ্তাহিক 'সৈনিক' এক বিপ্লবী মুখপত্র হিসেবে কাজ করেছিল এবং আপনি ছিলেন তার সম্পাদক। সেই সময়কার কথা কিছু বলুন।

উত্তরঃ ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম 'সৈনিক' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম পর্যায় ১৯৪৭ এর ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৮ এর ১৫ মার্চ পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্ব ছিল। এ সময়ে আমরা তমদ্দুন মজলিশের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করি। সে সময় তৎকালীন গভর্নমেন্ট নাজিমউদ্দিন চুক্তির মাধ্যমে আমাদের ৮ দফা দাবি মেনে নেন। এরপর সত্যিকার অর্থে পরবর্তী চার বছর কোনো ভাষা আন্দোলন হয়নি। কিন্তু এই চার বছর সাপ্তাহিক 'সৈনিক' ভাষা প্রশ্নটাকে গণচেতনায় প্রতিনিয়ত জাগরূক রেখেছে।

প্রশ্নঃ সে সময় 'সৈনিক'-এ কারা কারা লিখতেন?

উত্তরঃ 'সৈনিক'-এ তখন নিয়মিত লিখতেন কবি ফররুখ আহমদ, ইব্রাহিম খাঁ, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ। এমনকি বর্তমানের প্রোথিতযশা অনেক কবি-সাহিত্যিকের লেখার হাতেখড়িও হয়েছে ওই পত্রিকার মাধ্যমেই। যেমনঃ মাহফুজউল্লাহর প্রথম লেখা এ পত্রিকাতে ছাপা হয়। কবি শামসুর রাহমানের প্রথম কবিতা 'প্রুফ রীডার' এ পত্রিকাতেই ছাপা হয়। আলাউদ্দিন আল আজাদের লেখাও ছাপা হয়েছে তখন, বদরুদ্দীন উমরের এবং সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর লেখার সূচনা হয় প্রথম এ

www.pathagar.com

পত্রিকাতেই। এ সময়গুলোতে আমি 'সৈনিক'-এর সম্পাদক ছিলাম। আমি সম্পাদক ছিলাম ১৯৫১ সাল পর্যন্ত।

প্রশ্নঃ একজন কৃতি সাহিত্যিক হিসেবে আপনি বাংলাদেশের প্রায় সব জাতীয় পুরস্কারই অর্জন করেছেন। সেক্ষেত্রে, 'বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুল', দুবাই বিদেশের এই ছোট্ট স্কুলের পক্ষ থেকে ছোট্ট একটা পুরস্কার প্রাপ্তিতে আপনার অনুভূতি কি?

উত্তরঃ এটাকে আমি ঠিক পুরস্কার হিসেবে গণ্য করছি না। আমি মনে করি এটি একটি আন্তরিক ভালবাসার দান। সেজন্য এটার মূল্য আমার কাছে অনেক বেশি। দেশের পুরস্কারের চাইতে বিদেশের মাটিতে এ ভালবাসার দানের মূল্য অনেক অনেক বেশি আমার কাছে।

প্রশ্নঃ 'বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুল', দুবাই আয়োজিত দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত তৃতীয় বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলন ও পুস্তক প্রদর্শনী ১৯৯২ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তরঃ পুস্তক প্রদর্শনী খুব বড় করে প্রবাসে করাতো সম্ভব নয়। তবুও যে প্রদর্শনী হয়েছে তা, আমার খুব ভালো লেগেছে। প্রবাসে সহস্রাধিক বাংলা বই-এও কম নয়। কম নয় প্রদর্শনীর গুরুত্ব।

সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম দিনের শিশু-কিশোর সম্মেলনে ওদের মধ্যে যে মন-মানসিকতার পরিচয় পেয়েছি। তাতে আমি খুবই মুগ্ধ।

দ্বিতীয় দিনের প্রবাসী কবিবৃন্দের যে আসর বসেছিল, তা আমার অন্তরকে ছুঁয়ে গেছে। এদের অনেকের মধ্যেই আমি যথেষ্ট প্রতিভার সন্ধান পেয়েছি। তবে জানিনা, কে কতটুকু পরিশ্রম করবেন এবং টিকে থাকবেন।

প্রশ্ন ঃ প্রবাসী কবি-সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো বক্তব্য আছে কি?

উত্তরঃ হ্যাঁ, তাঁরা প্রবাসে রয়েছেন। কিন্তু দেশকে তাঁরা স্মৃতিতে জাগরূক রেখেছেন। দেশকে তাঁরা সবাই ভালবাসেন। লেখার মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। মূলতঃ লেখার ক্ষেত্র সীমিত নয়, বিদেশে থেকেও ভালো লেখা সম্ভব। গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা আরো বেশি। ইতোমধ্যে এখানে আমি যাদের মাঝে গদ্য রচনার প্রবণতা দেখেছি, তাদেরকে আমিরাতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের জীবনযাত্রা নিয়ে উপন্যাস লেখার পরামর্শ দিয়েছি। আমি মনে করি তা হবে বাংলা সাহিত্যের আর এক মহৎ সৃষ্টি।"

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, উপরোক্ত সাক্ষাতকারটি প্রকাশের পর খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্য-সমালোচক মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ আমাকে জানান যে, 'সৈনিকে' তাঁর লেখায় হাতেখড়ি নয়, এর আগেও তিনি অন্যান্য পত্রিকায় লিখেছেন। ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পর্কেও তিনি একই দাবী করেন। যাই হোক, শাহেদ ভাই এ সম্পর্কে অনবহিত থাকার কারণেই হয়ত উপরোক্ত মন্তব্য করে থাকবেন। তথ্যগতভাবে এ বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করেই এখানে তার উল্লেখ করা হলো।

১৯৯২ সনের ১৭ জুলাই ঢাকাস্থ 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ' আমার সম্মানে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শাহেদ আলী। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। বিশেষ অতিথি ছিলেন কবি আল মাহমুদ, কবি আব্দুল মান্নান সৈয়দ, সংগ্রাম-সম্পাদক আবুল আসাদ। ফুলকুঁড়ি সম্পাদক মাহবুবুল হক, ইতিহাস-গবেষক মোহাম্মদ

www.pathagar.com

আব্দুল মান্নান, কবি হাসান আলীম, কবি আসাদ বিন হাফিজ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক নূরুল আলম রইসী। সভাপতির ভাষণে শাহেদ ভাই যে কথা বলেন তা হুবহু 'বাংলা সাহিত্য সম্মেলন-১৯৯৬ সংকলনে' প্রকাশিত হয়। শাহেদ ভাইর স্মৃতিচারণ উপলক্ষে এখানে তা তুলে দিলামঃ

সভাপতির ভাষণঃ অধ্যাপক শাহেদ আলী ঃ

"জনাব মতিউর রহমানের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আলোচনার জন্য আজকের এ অনুষ্ঠান। এতে সংক্ষিপ্ত অথচ একটি চমৎকার প্রবন্ধ পড়েছেন অধ্যাপক নূরুল আলম রইসী এবং তার ওপর আলোচনা করেছেন কবি আল মাহমুদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবুল আসাদ, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাহবুবুল হক ও আসাদ বিন হাফিজ।

অবশ্য প্রধান অতিথির ভাষণের আগেই জনাব মতিউর রহমান তাঁর নিজের কিছু বক্তব্যও আপনাদের কাছে পেশ করেছেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ' জনাব মতিউর রহমানের সংবর্ধনার এ আয়োজন করেছে। জনাব মতিউর রহমানকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি দীর্ঘ দিন ধরে। আমি যখন ইসলামিক একাডেমিতে ছিলাম তখন থেকেই তাঁর সাথে আমার পরিচয়। তখন তাঁর বহু লেখা আমি 'ইসলামিক একাডেমি পত্রিকা'তে এবং 'সবুজ পাতায়' ছেপেছি। তাঁকে সব সময়ই আমার একজন কর্মী মানুষ মনে হয়েছে। তাঁর যে সাতিহ্য-তা ঠিক সাহিত্যের জন্য সাহিত্য নয়, তিনি আসলে একজন সমাজমনস্ক মানুষ। সমাজের চিন্তা, আদর্শের চিন্তা তাঁর কাছে বড়। সমাজের প্রয়োজনেই তিনি সাহিত্য করেন বলে আমার বিশ্বাস। জাতির, মানুষের প্রয়োজনে তিনি সাহিত্য চর্চা করেন। তিনি সাহিত্য সংস্কৃতি সংগঠক। তিনি প্রতি মুহূর্তে সমাজকে, জাতিকে, ঐতিহ্যকে সামনে রাখেন এটি অত্যন্ত বড় কথা।

মৌলবাদ সম্পর্কে কথা উঠেছে। এ ধরনের সাহিত্যকর্ম যাঁরা করেন তারা মৌলবাদী বলে চিহ্নিত, এঁরা মূল নিয়ে কারবার করেন, এসব সমালোচনা যাঁরা করেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন শেকড়-সন্ধানী। মূলতঃ তারা শিকড় খুঁজতে খুঁজতে মূল শুদ্ধ উপড়ে ফেলছেন। মূল উপড়ে এখন তাঁরা ছিন্নমূল হয়ে বসে আছেন। সাহিত্য, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এসব ছিন্নমূলদের কাছ থেকেই আক্রমণ আসছে মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে। জনাব মতিউর রহমানসহ আমরা সবাই মৌলবাদী আমরা মূল নিয়ে কারবার করি। আমরা আগাছা নিয়ে কারবার করি না। মৌলবাদীর বিপরীত একটা শব্দ আমি মাঝে মাঝে বলি। এরা পল্লববাদী বা আগাছাবাদী।

আমাকে যখন এই সব আগাছাবাদীরা মৌলবাদী বলে আমি তখন খুব গর্ববোধ করি. আমি লজ্জিত হই না। মতিউর রহমান এ ধরনের একজন মৌলবাদী সংগঠক। আমি মনে করি এতে তাঁর গর্ববোধ করার কারণ আছে। কারণ এই মূলের সাথে যাঁরা সম্পর্ক রাখে তাঁদের দিন আসছে বলে আমি মনে করি। সেদিন খুব বেশি দূরে নয়।

জনাব মতিউর রহমান মূলতই একজন সংগঠক। সমাজ এবং জাতিই হচ্ছে তার সামনে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। তিনি এখন বিদেশে আছেন। বিদেশে থেকেও তিনি সর্বক্ষণ দেশকে নিয়ে ভাবছেন; ভাবছেন বিশ্বের সকল মুসলমানকে নিয়ে, বিশ্বের সকল মানুষকে নিয়ে। ইসলাম সাম্প্রদায়িক কোন বিষয় নয়, জগতের সকল মানুষের মুক্তির পথ ইসলাম। এ নিয়ে তিনি চিন্তা করেন।

www.pathagar.com

তিনি দুবাইতে থাকলেও তাঁর যে মূল কাজ দেশের জন্য, সমাজের জন্য, জাতির জন্য, দেশের ভাষা সাহিত্য ও শিক্ষার জন্য কাজ– তা তিনি ভুলে যান নি। বরং অত্যন্ত সুন্দরভাবে তিনি সেখানে বাংলাদেশী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমি সেখানে 'বাংলা সাহিত্য সম্মেলনে' প্রধান অতিথি হয়ে যেয়ে সে স্কুল দেখেছি। এটি তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফল। প্রবাসী বাংলাদেশী ছেলেমেয়েদেরকে সত্যিকারভাবে বাংলাদেশের ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় ঘটাতে এবং তাদেরকে যথার্থভাবে বাংলাদেশের সৎ নাগরিক তৈরীর জন্য তিনি নিজের কষ্টার্জিত অনেক অর্থ ব্যয় করে প্রতিষ্ঠা করেছেন এ স্কুল। আমি ঐ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে যেয়ে প্রকৃতপক্ষে যেন বাংলাদেশকে পেলাম। তাদের গানে, স্বরচিত কবিতায় বাংলাদেশের নদী, পাখি, ফল, ফুল, প্রকৃতিকে পেয়েছি। তাদের অনেকেরই জন্ম দুবাইতে–প্রত্যেক ক্লাশের একজন-দু'জন ছাড়া কেউই বাংলাদেশকে দেখার সুযোগ পায়নি। অথচ তাদের মাঝে যে দেশপ্রেম তা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

দুবাইতে লেখকের বাসায় তাঁর সাথে কথা শিল্পী শাহেদ আলীর

মতিউর রহমান প্রধানতঃ প্রবন্ধকার। তাঁর সাহিত্যকর্ম 'বাংলা সাহিত্যের ধারা,' 'ফররুখ প্রতিভা', 'মহানবী (স)', 'ইবাদতের মূল ভিত্তি ও তার তাৎপর্য' বিশিষ্ট প্রবন্ধ গ্রন্থ।* প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি দেশকে, দেশের ভাষাকে, ইতিহাস, ঐতিহ্যকে ভোলেন নাই। এর মধ্যেও তিনি কাজ করে যাচ্ছেন নিরলসভাবে। দুবাই এবং বাংলাদেশের মধ্যে একটা সেতুবন্ধন তিনি রচনা করেছেন। প্রতি বছর দুবাইতে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন ও পুস্তক-প্রদর্শনী করে একটা বন্ধন তিনি সৃষ্টি করেছেন।

আমি দুবাইভিত্তিক বা আমিরাতের জীবন-যাত্রা ভিত্তিক গল্প, উপন্যাস রচনা করার জন্য এবং আমিরাতের স্থানীয় কবি-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে লেখার জন্য মতিউর রহমান এবং সেখানকার প্রবাসী কবি-সাহিত্যিকদেরকে আহবান জানাচ্ছি।"

শাহেদ ভাই ছিলেন এক অমর কথাশিল্পী। বিগত প্রায় ছয় দশক কাল ধরে আমাদের ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতি-সাংবাদিকতা-রাজনীতি ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তাঁর ইন্তিকালে জাতি হারিয়েছে এক কৃতী পুরুষকে। আমরা যারা তাঁর গুণমুগ্ধ-অনুরাগী তারা হারিয়েছি এক আন্তরিকতাপূর্ণ দরদী সজ্জন ব্যক্তিকে। মহান আল্লাহর রহমত এ মহৎ ব্যক্তির জন্য অবারিত হোক। আমিন!

---

*শাহেদ ভাই ১৯৯২ সনে এ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তারপর আমার আরো অনেকগুলো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো ঃ বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য, বাংলাভাষা ও ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, মহানবীর (স) আদর্শ সমাজ, মানবাধিকার ও ইসলাম, ইসলামে নারীর মর্যাদা, মাতাপিতা ও সন্তানের হক, ছোটদের গল্প, স্মৃতির সৈকতে রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি। –গ্রন্থকার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সদস্য হিসাবে তিনি ইংল্যান্ড, ইতালী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, জাপান, ইরান, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও পূর্ব ইউরোপীয় বিভিন্ন রাষ্ট্রসহ পৃথিবীর প্রায় ষাটটি দেশ ভ্রমণ করেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে পরিচালিত 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সমিতি'র তিনি যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া, বাংলা একাডেমী, জাতীয় প্রেসক্লাব, পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন, ইসলামিক একাডেমী, তমদ্দুন মজলিস, সাহিত্য সংসদ প্রভৃতি বহু সংস্থার তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৭৭ সন থেকে আমৃত্যু জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন ফুলকুঁড়ির কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি ছিলেন।

সাহিত্য-সাংবাদিকতা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সানাউল্লাহ নূরী ১৯৮২ সনে একুশে পদক, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন স্বর্ণপদক, কবি হাসান হাফিজুর রহমান স্বর্ণপদক, জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি সমিতি স্বর্ণপদক, অতীশ দীপংকর স্বর্ণপদক, কালচক্র স্বাধীনতা স্বর্ণ-পদক, শহীদ জিয়া স্মৃতি স্বর্ণ-পদক, এপেক্স ইন্টারন্যাশনাল পদক, বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা গুণীজন সংবর্ধনা পদক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ পদক- ১৯৯৭, স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদ পদক- ১৯৯৮ ইত্যাদিসহ দেশী-বিদেশী অর্ধশতাধিক পদক ও পুরস্কার লাভ করেন। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি-সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রাণ-পুরুষ।

নূরী ভাইর সাথে আমার পরিচয় ১৯৬৩ সনের গোড়ার দিকে। আমি তখন সিদ্ধেশ্বরী নৈশ কলেজে অধ্যাপনা করি। তৎকালীন ফ্রাংকলিন পাবলিকেশন্স-এর (পরবর্তীকালে ফ্রাংকলিন বুক প্রোগ্রামস) ডিরেক্টর মরহুম এ.টি এম. আব্দুল মতীন (পরবর্তীতে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ডেপুটি স্পীকার) একদিন আমাকে তাঁর বাসায় ডেকে পাঠালেন। পরের দিন আমি তাঁর সাথে দেখা করলাম। তিনি আমাকে ফ্রাংকলিনে কাজ করার কথা বললেন এবং এ ব্যাপারে নূরী ভাইর সঙ্গে দেখা করে সবকিছু চূড়ান্ত করতে বললেন। নূরী ভাই তখন ফ্রাংকলিন পাবলিকেশন্স-এর নিয়মিত বিভাগে সম্পাদক হিসাবে কাজ করতেন। আমি তাঁর তখনকার শান্তিনগরস্থ টিনের ঘরের বাসায় গেলাম দেখা করতে। তাঁর ছোট মেয়ে রচি (তখন তার বয়স ৩/৪ বছর) জানালার শিক ধরে কচি মুখে স্মিত হেসে মিষ্টি করে বলল, 'বাবু বাসায় নেই, আপিসে গেছেন।' তাঁর কথা এত মধুর মনে হলো যে, আমি তার নাম জিজ্ঞেস করলাম, পড়াশোনার খবর নিলাম, 'বাবু' কখন বাসায় থাকে ইত্যাদি বাক্য বিনিময় করে ফিরে এলাম।

পরের দিন সন্ধ্যায় আবার গিয়ে নূরী ভাইর দেখা পেলাম। সেদিনই তাঁর সাথে প্রথম দেখা ও পরিচয়। প্রথম দেখা ও পরিচয়েই তিনি আমাকে এমন আপন করে নিলেন যে, মনে হলো তিনি যেন অনেক দিনের চেনা। কথা বলতে বলতে রাত্রি হয়ে এলো এবং তিনি শেষ পর্যন্ত খানার টেবিলে বসিয়ে আমাকে নিয়ে রাতের খাবার খেলেন। এমন আন্তরিক অসাধারণ মায়া-মমতা ও উদারতায় গড়া প্রাণবন্ত মানুষটি প্রথম দিনেই আমাকে অসম্ভব রকম আকৃষ্ট করলো।

তখন থেকেই তাঁকে আমি আমার অগ্রজপ্রতীম মনে করে আসছি। অকৃত্রিম বন্ধু ও পরম হিতৈষী হিসাবে আমৃত্যু তাঁর উষ্ণ সান্নিধ্য আমাকে সর্বদা মুগ্ধ করে রেখেছে। ফ্রাংকলিনে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ পোণে সাত বছর এক সঙ্গে কাজ করেছি। তাঁর নিকট-সান্নিধ্যে এসে তাঁর পাণ্ডিত্য, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর স্বচ্ছজ্ঞান, পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব, মাধুর্যময় ব্যক্তিত্ব ও পরোপকারী উদার সহনশীল মনোবৃত্তি তাঁর মধ্যে যেমন

www.pathagar.com

দেখেছি এমনটি সচরাচর কখনো চোখে পড়ে না। তাঁর আচার-আচরণ, কথাবার্তা, সততা, কর্মনিষ্ঠা, বিনয় ও সহজ-সরল ব্যক্তিত্ব সকলকে সর্বদা কাছে টানতো। তিনি ছিলেন আদর্শবাদী, ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ, সংস্কৃতিবান, রুচিশীল মহত্ত্বম ব্যক্তিত্বের অধিকারী নিরহংকার মানুষ। যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে এসেছে সেই চুম্বকের মত তাঁর দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে। শত-সহস্র লোকের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল। ধনী-গরীব, উঁচু-নীচু, শিশু-কিশোর-যুবা-বৃদ্ধ সকল মানুষেরই তিনি ছিলেন পরম বন্ধু ও একান্ত সৃহৃদ। তাঁর কোন শত্রু ছিল না, দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষই তাঁর মহৎ-উদার হৃদয়ের সুশীতল ছায়ায় পক্ষপাতহীন আশ্রয় লাভ করেছে। ইসলামী আদর্শে ছিল তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস। সব রকম গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতার উর্ধে তিনি ছিলেন মহৎ, উদার প্রাণের একজন সত্যিকার নিষ্ঠাবান মুসলিম।

একবার ফ্রাংকলিনে আমাদের এক তরুণ সহকর্মী তার এক সহপাঠিনীর প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। পাত্রীর পরিবার সম্ভ্রান্ত ও উচ্চবিত্তের। পাত্রের সাহস ছিল না বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর। পাত্র-পাত্রী উভয়েরই আগ্রহ দেখে নূরী ভাই ও আমি তাদেরকে নিয়ে মগবাজার কাজী অফিসে হাজির হলাম একদিন। পরিস্থিতি আঁচ করে কড়া ও নীতিবান কাজী গোলাম কবীর সাহেব (বর্তমানে মরহুম) বিয়ে পড়াতে রাজী হলেন না। নূরী ভাই তখন নিজের পরিচয় দিয়ে, সকল দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়ার অঙ্গীকার করলে অবশেষে কাজী সাহেব বিয়ে পড়াতে রাজী হয়ে বর-কনেকে মূল্যবান কিছু উপদেশ দিলেন। সবকিছু ভালোয় ভালোয় সুসম্পন্ন হলো।

মানুষের মূল্য, হৃদয়ের মূল্য দিতে নূরী ভাই সর্বদা যে কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাই গ্রামের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, পরিচিত-অপরিচিত, মুসলিম-অমুসলিম, দলমত নির্বিশেষে বিপন্ন মানুষ নূরী ভাইর নিকট থেকে অকল্পনীয় ধরনের সাহায্য-সহানুভূতি পেয়ে অকাতরে তাঁর জন্য দোয়া করেছে। এমন মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ সত্যিই বিরল। মানবিক আচরণে তিনি সর্বদা মহানবীর (স) আদর্শ অনুসরণে সচেষ্ট ছিলেন।

১৯৬৫ সনে ফ্রাংকলিনের নতুন পরিচালক হয়ে এলেন আই, এল, ও-এর প্রাক্তন পরিচালক বিশিষ্ট সাহিত্যিক জনাব এম.এ. আজম (বর্তমানে মরহুম)। তিনি গুণীজনদের বিশেষ সমাদর করতেন। তিনি এসেই কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিভিন্ন উচ্চ পদে নিয়োগ করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন পুলিশ অফিসার বিশিষ্ট সাহিত্যিক আব্দুল হাফিজ, কবি সুফিয়া কামালের স্বামী কামাল উদ্দীন খান, প্রখ্যাত শিল্পী কাজী আবুল কাসেম প্রমুখ। পূর্বতনদের মধ্যে বাংলা বিশ্বকোষ প্রকল্পের খান বাহাদুর এম.এ. হাকিম ও নূরী ভাই তো ছিলেনই। এছাড়া, প্রতিদিন বিভিন্ন কাজে অর্থাৎ বিশ্বকোষ ও অনুবাদ কর্মের জন্য বহু বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক এসে ফ্রাংকলিনে ভীড় করতেন। আজম সাহেব এসে অফিসও স্থানান্তরিত করলেন ২৭ নং পুরানা পল্টন থেকে ধানমন্ডি ২নং রোডে এক দোতলা প্রশস্ত ভবনে। কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের আনাগোনায়, আলাপ-আলোচনায় ফ্রাংকলিন তখন যথার্থই হয়ে উঠেছিল এক মধুচক্র। নূরী ভাই তাঁর আন্তরিকতা, পরিচিতি ও প্রাণবন্ততার জন্য হয়ে উঠেছিলেন এ মধুচক্রের অনেকটা প্রধান আকর্ষণ। অফিসের কাজের ফাঁকে আমরা প্রায়ই রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দেশ-বিদেশের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে জমজমাট আলোচনায় মেতে উঠতাম। বড় আন্তরিক, সৃজনশীল ও প্রাণবন্ত পরিবেশ ছিল সেটা। আর নূরী ভাই প্রায়ই

www.pathagar.com

হয়ে উঠতেন সেখানকার মধ্যমণি। সব বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও বক্তব্য ছিল গভীর ও সাবলীল। নূরী ভাই ফ্রাংকলিনে এক বেলা কাজ করতেন, দ্বিতীয়ার্ধে ছুটে যেতেন তাঁর অন্য কর্মক্ষেত্র সংবাদপত্র অফিসে। অফিস শেষে আমিও চলে যেতাম সিদ্ধেশ্বরী নৈশ কলেজে। সে ছিল এক কর্মমুখর অসাধারণ সময়। অনেকটা অজান্তেই আমার জীবনের সেরা মুহূর্তগুলো সম্ভবত ঐসময়ই অবলীলায় কাটিয়ে এসেছি।

১৯৭৭ সনের ফেব্রুয়ারীতে আমি কর্ম-ব্যপদেশে দুবাই চলে যাই। ঐ সময় জাতীয় শিশু-কিশোর প্রতিষ্ঠান ফুলকুঁড়ির কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি পদের জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান করা হচ্ছিল। আমার মনে হলো নূরী ভাইর কথা। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট কথা পারতেই তারা রাজী হয়ে গেলেন। আমি নূরী ভাইর সঙ্গে কথা বলে তাঁকে সম্মত করালাম। তারপর আমৃত্যু তিনি সে পদে বহাল থেকে অত্যন্ত আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

আমার দীর্ঘ বিশ বছর দুবাই প্রবাসকালে ছুটিতে বাড়ীতে এলেই প্রায়ই সপরিবারে নূরী ভাইর বাসায় গেছি দেখা করতে। নূরী ভাই ও ভাবীর আন্তরিকতায় আমরা সর্বদাই মুগ্ধ হয়েছি। একবার দুবাই-এর এক হোটেল থেকে নূরী ভাইর টেলিফোন পেলাম। এক সাংবাদিক প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে তিনি ইরান সফর শেষে ঢাকায় ফেরার পথে দুবাইতে ট্রানজিট করছিলেন। টেলিফোন ছেড়ে সাথে সাথে ছোট ছেলে আবিদকে নিয়ে দৌড়ালাম হোটেলের দিকে। তখন সন্ধ্যাবেলা। নূরী ভাই সবে মাত্র বাইরে থেকে শপিং করে রুমে ফিরেছেন। ইচ্ছা ছিল তাঁকে নিয়ে বাসায় আসবো। স্ত্রীকে সে রকমই বলে এসেছিলাম। কিন্তু হোটেলে গিয়ে শুনলাম ঐ রাতেই তাঁদের ফ্লাইট। তাই নূরী ভাই ও তাঁর সফরসঙ্গী ইনকিলাবের সাংবাদিক খন্দকার হাসনাত করীম, অবজারভার পত্রিকার ইকবাল সোবহান এবং আরো এক-দুইজন কারা যেন ছিলেন, এখন নাম মনে করতে পারছি না, সবার সঙ্গে হোটেল লবীতে, খাবার টেবিলে রাত এগারোটা পর্যন্ত গল্পগুজব করে তারপর তাঁদেরকে বিমানের গাড়ীতে তুলে দিয়ে বাসায় ফিরে এলাম। নূরী ভাইকে সে সময়ই শারীরিকভাবে খুব দুর্বল মনে হচ্ছিল। তার লাগেজপত্র তাঁর বন্ধুরাই সব গুছিয়ে দিচ্ছিলেন। বিশেষ করে সাংবাদিক খন্দকার হাসনাত করীমকে দেখলাম নূরী ভাইর খুবই অনুরক্ত। তাঁকে সর্বোতোভাবে সাহায্য করছিলেন। এর কিছুদিন পরই তিনি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা-সিঙ্গাপুর চিকিৎসা করিয়ে অনেকটা শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। চলতে-ফিরতে অন্যের সাহায্য নিতেন।

১৯৯৭ সনের জানুয়ারীতে আমি একবারে ঢাকায় চলে আসার পর সভা-সমিতি ও বিভিন্ন উপলক্ষে প্রায়ই দেখা হতো নূরী ভাইর সঙ্গে। ১৯৯৮ সনে আমাকে 'স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদে'র সভাপতি করা হয়। ১৯৭২ সনে প্রতিষ্ঠার সময় আমি এ সংগঠনের সভাপতি ছিলাম। দীর্ঘদিন বিদেশ থাকার ফলে প্রতিষ্ঠানের সাথে আমার আর কোন সম্পর্ক ছিল না। দেশে ফিরে আসার পর আমাকে আবার সভাপতি করার প্রস্তাব দিলে আমি তা সানন্দে গ্রহণ করি। সভাপতি হয়ে প্রথম সুযোগেই আমি দেশের চারজন স্বনামধন্য প্রথিতযশা গুণী ব্যক্তিকে সংবর্ধনা ও স্বর্ণপদক দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এ বিশিষ্ট চার ব্যক্তির নাম ও সে অনুষ্ঠানের বিবরণ ইতোপূর্বে প্রদত্ত হয়েছে। তাই এখানে আর তার পুনরাবৃত্তি করলাম না।

১৯৯৯ সনে স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদের পক্ষ থেকে একটি সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পত্রিকার জন্য আমি নূরী ভাইর নিকট লেখা

www.pathagar.com

চাইলাম। নতুন পত্রিকার কথা শুনে উনি খুব খুশী হলেন। পত্রিকার উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের কথা শুনে আরো খুশী হলেন। আমাকে কিছু উপদেশ-পরামর্শও দিলেন। তিনি লেখা দিতে সম্মত হলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই একটি ধারাবাহিক লেখার প্রথম কিস্তি দিলেন। লেখাটির শিরোনাম 'বাংলাদেশে সমাজ-সংস্কৃতি এবং ভাষার বিবর্তন'। একটি অতি উন্নত মানের গবেষণামূলক লেখা। প্রাচীন ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, ভাষার বিকাশ ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জটিল বিষয় নিয়ে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখা। আমি তাঁর জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসা দেখে বিস্ময় বোধ করলাম। নূরী ভাইর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর ঐ লেখাটি আমার সম্পাদিত 'স্বদেশ সংস্কৃতি' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত লেখাটি তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। তাঁর ইচ্ছা ছিল এ ধারাবাহিক লেখাটি পরে বই আকারে প্রকাশ করবেন। পূর্ণাঙ্গ বই না হলেও যদি কখনো তাঁর রচনাবলী প্রকাশিত হয়–যা হওয়া একান্ত প্রয়োজন–তাহলে এ ধারাবাহিক লেখাটি তাতে সংকলিত হওয়া উচিত।

'স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদে'র নিয়মিত মাসিক সাহিত্য সভায় এবং কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে যখনই তাঁকে দাওয়াত দিয়েছি, তিনি এসেছেন এবং জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেছেন, বিশেষভাবে তরুণ লেখকদেরকে তিনি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর উষ্ণ, প্রাণবন্ত উপস্থিতি সকলের জন্যই ছিল একান্ত উৎসাহজনক।

১৯৯৯ সনে মিরপুর 'বধূ কমিউনিটি সেন্টারে' স্থানীয় 'অগ্নিবীণা সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদে'র পক্ষ থেকে এক সাহিত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আমাকে অনুরোধ করা হয় নূরী ভাইকে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে দাওয়াত দেয়ার জন্য। আমি দাওয়াত দিয়েছিলাম এবং তিনি যথাসময়ে এসে তাঁর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ রেখেছিলেন। অনুষ্ঠানে আমি সভাপতি ছিলাম। অনুষ্ঠান শেষে নূরী ভাইকে আমার বাসায় নিয়ে এলাম। আমার গিন্নী বেগম খালেদা রহমান তো হঠাৎ তাঁকে দেখে অবাক। সঙ্গে সঙ্গে তাড়াহুড়ো করে পোলাও-কোর্মা তৈরী হয়ে গেল। মনে হলো নূরী ভাই খুব তৃপ্তির সাথে খেলেন। অনেক রাত পর্যন্ত চুটিয়ে গল্প করলেন। তারপর চলে গেলেন বাসায়।

২০০১ সনের জুন সংখ্যা 'ফররুখ একাডেমী পত্রিকা'র জন্য নূরী ভাইর নিকট লেখা চাইলাম। তিনি একটা নির্দিষ্ট দিনে লেখা সংগ্রহের জন্য লোক পাঠাতে বললেন। সে নির্দিষ্ট দিনে একজনকে পাঠালাম। সে গিয়ে দেখে নূরী ভাইর লেখা তখনো শেষ হয়নি। আমার পাঠানো লোককে বসিয়ে রেখে, তাকে চা-নাস্তা-দুপুরের খানা খাইয়ে লেখা শেষ করে তার হাতে তুলে দিয়ে নূরী ভাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। নূরী ভাইর লেখা 'ব্যক্তি ও কাব্য-শিল্পী ফররুখ' একাডেমী পত্রিকায় যথাসময়ে ছেপেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পত্রিকার কপিটি তাঁর হাতে পৌঁছার আগেই তিনি পরকালের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান। সম্ভবত এটা ছিল নূরী ভাইর সর্বশেষ লেখা অথবা সর্বশেষ লেখাগুলো অন্যতম।

নূরী ভাইয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে জাতি হারিয়েছে তাঁর এক মহত্ত্বম ব্যক্তিত্বকে, সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি-সংবাদপত্রের জগৎ হারিয়েছে তাদের এক অক্লান্ত নির্ভীক দিশারীকে, ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই হারিয়েছে তাদের এক পরম সুহৃদকে, আমিও হারিয়েছি আমার অভিভাবক তুল্য এক বড় ভাইকে। স্মৃতির আলোময় ভুবনে সেই প্রিয় মানুষটি এখন কেবলি এক উজ্জ্বল দ্যুতি। পরম করুণাময় আল্লাহ তাঁর আত্মার মাগফিরাত দান করুন।

www.pathagar.com

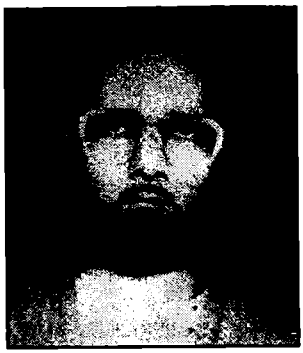

একান্ত অনুভবে আবদুল মান্নাব তালিব

পাতলা, একহারা, রোগাটে চেহারা। মুখ, মাথা ভর্তি ঘন কালো কুচকুচে দাড়ি-চুল। শান্ত, নির্বিরোধ, সৌম্য কান্তির একজন সদালাপী ব্যক্তি। নিম্নস্বরে কথা বলেন। সকলের সাথেই চলেন-ফেরেন কিন্তু কারো সাথেই তাঁর কোন বিরোধ নেই। অনেক বিষয় সম্পর্কেই তার জানা-শোনা, কথা বলায় পারঙ্গম, রূপ-রস-গন্ধে ভরা পৃথিবীর প্রতি নির্মোহ একজন ব্যক্তি অথচ পৃথিবী সম্পর্কে মোটেই নির্বিকার নন।

সন-তারিখ সঠিক মনে নেই– উনিশ শো ষাট কিংবা একষট্টি। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. ক্লাসের ছাত্র। ঈদের নামায পড়ে ঘরে ফিরলাম। মনে হলো বাইরে বেরিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করে আসা যাক। প্রথমেই গেলাম ১৩নং কারকুন বাড়ি লেনে। যে সময়কার কথা বলছি, সে সময় ঐ বাড়িটি নানা কারণে ছিল বিখ্যাত ও বিশেষ আকর্ষণীয়। ইসলামী আন্দোলনের একমাত্র মুখপত্র 'সাপ্তাহিক জাহানে নও' ওখান থেকেই প্রকাশিত হতো, ইসলামী আন্দোলনের একটা গুরুত্বর্পূণ কেন্দ্র ছিল ওটা। সেখানে গিয়ে দেখি বিশাল বাড়িটা একেবারে শূন্য, যেন খাঁ খাঁ করছে। ভাবলাম আসাটাই বৃথা হলো, কারো দেখা পাওয়া যাবে না। ইতস্তত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে কাঠের দোতলায় উঠলাম। দেখি দরজা খোলা, আশা-নিরাশায় দরজার ফোকর দিয়ে ঘরে ঢুকলাম। দেখি নিবিষ্ট মনে তিনি খচ খচ করে লিখে কাগজের পাতা ভর্তি করে চলেছেন। আমার আগমনে তাঁর লেখায় ছেদ পড়লো। আমি অবাক-বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকালাম। বিস্ময়ের ঘোরে বোধ করি তাঁকে সালাম দিতেও ভুলে গেলাম। তিনিই আমাকে সালাম জানিয়ে স্মিত হাস্যে সম্ভাষণ জানালেন। চাদরটা একটু নাড়া-চাড়া করে বিছানার এক পাশে আমাকে বসার জায়গা করে দিলেন।

বিস্ময়ের ঘোর তখনো আমার কাটেনি। অনেকটা অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস করলাম ঃ

'তালিব সাহেব, এ ঈদের দিনে আপনি একা একা ঘরে বসে লেখালেখি করছেন?'

'কী আর করবো, ঈদের নামায পড়েছি এখন নিরিবিলি লেখাপড়া করছি। লেখাপড়ার জন্য এ নির্জনতা তো খুবই ভাল। তাছাড়া হাতে কিছু কাজ আছে। ছুটির দিন ছাড়া তো অবসর নেই। ভাবলাম এ ঈদের ছুটিতেই কাজটা সেরে ফেলি।'

www.pathagar.com

আমার দম বন্ধ হবার যোগাড়। মনে হচ্ছিল ছুটে বেরিয়ে আসি ঐ নিরানন্দ, নির্জনপুরী থেকে আনন্দ, কোলাহলময় খোলা পৃথিবীর বুকে। কিন্তু পারলাম না। তাঁর স্মিত হাস্যময়, স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের কোমল উষ্ণতা ক্রমে আমাকে আকর্ষণ করতে লাগলো। সে আকর্ষণ কি মায়ার, শ্রদ্ধার, ভালবাসার না সহানুভূতির? আমি সঠিক বলতে পারবো না। হয়ত সব রকম অনুভূতির একটা যোগফল।

যে সময়ের কথা বললাম সে সময় আবদুল মান্নান তালিব সাপ্তাহিক 'জাহানে নও' পত্রিকার সাব এডিটর। দিনরাত কাজ করেন। বেতন সত্তর টাকা। দায়িত্বের বোঝা অপরিসীম। বিপ্লবের ঝাণ্ডাবাহী আদর্শবাদী পত্রিকা। পয়সা নেই। কিন্তু পয়সার চিন্তা তাঁর মধ্যে কখনো আছে বলেও মনে হয়নি। ১৩নং কারকুন বাড়ির নীচের তলায় 'জাহানে নও' পত্রিকার অফিস। উপর তলায় তিনি থাকেন। রাতদিন কাজ করেন। শোবার সময় হলে উপরে গিয়ে ঘুমান। এর কিছুদিন আগে তিনি এসেছেন লাহোর থেকে। সম্পূর্ণ একা। আপনজনরা কেউ সঙ্গে আসেনি। জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলায়। আদর্শের সৈনিক হিসেবে মহানবীর (স) সুন্নত পালনার্থে তিনি হিজরত করেন প্রথমে লাহোরে, পরে ঢাকায়। ঢাকার সংখ্যাগুরু মুসলিম সমাজে ইসলামের কাজ নির্বিঘ্নে করা যাবে বলে। এখানে তিনি কাজের অনুকূল পরিবেশ পেয়েছিলেন। তাই থেকে গেলেন। ধীরে ধীরে এ সমাজের সাথে একাত্মভাবে মিশে গেলেন। শান্তিবাগের আর এক আদর্শবাদী ব্যক্তির একমাত্র কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তার পরিবারের একজন হয়ে গেলেন। সেটাই হলো তাঁর স্থায়ী ঠিকানা। ছেলেমেয়ে নাতি-নাতকুর নিয়ে নিরিবিলি শান্তির নীড় গড়ে উঠলো তাঁর ওখানেই।

আমার সাথে যখন তাঁর প্রথম পরিচয় তখন তিনি কবি আবদুল মান্নান তালিব নামে খ্যাত। প্রচুর কবিতা লেখেন। মহাকবি ইকবালের ভাবশিষ্য। ইকবাল সম্পর্কে তাঁর প্রচুর পড়াশোনা। মাদ্রাসায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করার ফলে আরবী, উর্দু, ফারসী ভাষায় তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা জন্মে। এসব ভাষায় নামকরা লেখকদের অনেকের লেখা কেতাবাদি তিনি পড়েছেন। পড়াশোনা, জানাশোনার প্রতি তাঁর অদম্য আগ্রহ। বাংলা ভাষায়ও তিনি প্রচুর পাড়শোনা করেছেন। কাব্য-চর্চার ক্ষেত্রে তিনি ইকবাল ও ফররুখের অনুসারী। এ দুই মহান কবির দ্বারা তিনি অনেকখানি প্রভাবিত। এ দু'য়ের প্রভাবের অন্তরালে তাঁর নিজস্ব স্বকীয়তাও জ্যোৎস্নালোকের মত স্মিত হাসি ছড়ায়। পাঠকের মনে তা অমল মাধুর্যের গভীর দোলা সৃষ্টি করে।

আবদুল মান্নান তালিবের জন্ম ১৯৩৬ সনে ১৫ মার্চ চব্বিশ পরগনা জেলার অর্জুনপুর গ্রামে। তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সনে শিউড়ির 'জিয়াউল ইসলাম' পত্রিকায়। স্বরচিত কবিতা ছাড়া কাব্যানুবাদে তাঁর যথেষ্ট পারদর্শিতা পরিলক্ষিত হয়। লাহোর থাকাকালে নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহমদের বহু কবিতা উর্দু ভাষায় অনুবাদ করে সেখানকার পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ইকবালের ফার্সী কবিতাগ্রন্থ "রমূযে বেখূদী" বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহকারে প্রকাশ করেন। করাচীর ইকবাল একাডেমীর তত্ত্বাবধানে ইকবালের অন্য আরো একটি কাব্য ছাড়াও ইকবালের বহু সংখ্যক কবিতার অনুবাদ করেন। ১৯৫১-৭১ পর্যন্ত তিনি কাব্য-চর্চায় বিশেষ সক্রিয় ছিলেন। পরবর্তীতে এক্ষেত্রে ভাটা পড়ে, কারণ তখন তিনি মননশীল রচনা, অনুবাদ, গবেষণা ও শিশু-কিশোর সাহিত্য-চর্চায় অধিক মনোনিবেশ করেন।

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান তালিবের কবি-খ্যাতি খুব একটা বিস্তৃতি লাভ করেনি। এর দুটো কারণ হতে পারে। প্রথমত তিনি মাত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় (যেগুলোর প্রচার সংখ্যাও দুর্ভাগ্যবশতঃ নানা কারণে সীমিত) লিখেছেন। ফলে বৃহত্তর পাঠক-সমাজ তাঁকে জানার তেমন সুযোগ পায়নি। দ্বিতীয়ত ইদানীং কম লিখলেও এক সময় প্রচুর কবিতা লিখেছেন, অথচ এ যাবত তাঁর একটি কবিতার বইও প্রকাশিত হয়নি। একাধারে দারিদ্র্য এবং কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে প্রকাশকদের অনীহাই এজন্য দায়ী। ফলে তাঁর অনেক কবিতা শুধুমাত্র পত্র-পত্রিকার কালো কালো অক্ষরের জালে আবদ্ধ হয়ে আছে। এখন তাঁর সব কবিতা সংগ্রহ করা সম্ভব কিনা জানি না, কিন্তু সংগ্রহের চেষ্টা করা উচিত এবং তা প্রকাশের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। এ কাজের মাধ্যমে পাঠক সমাজ কবি আবদুল মান্নান তালিবের সঠিক পরিচিতি লাভ করবে শুধু তাই নয়, তার দ্বারা বাংলা কাব্য-সাহিত্যও যথেষ্ট সমৃদ্ধ হবে।

আবদুল মান্নান তালিব শুধু কবি নন, প্রায় অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী তিনি সাংবাদিকতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ১৯৫৭ সনে লাহোরে উর্দু দৈনিক 'রোজনামা তাসনীম'-এ সাব-এডিটর হিসেবে তাঁর সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। ১৯৫৯ সনে লাহোর থেকে ঢাকায় এসে তিনি দৈনিক 'ইত্তেহাদ' পত্রিকায় সাব-এডিটর হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৬০ সনে ইত্তেহাদ বন্ধ হয়ে গেলে সাপ্তাহিক 'জাহানে নও' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৬২ সনে 'জাহানে নও'-এ সম্পাদনার দায়িত্ব লাভ করেন। একই সাথে ১৯৭০ এর জানুয়ারীতে 'দৈনিক সংগ্রাম' আত্মপ্রকাশ করলে সেখানে শিশু-কিশোর বিভাগের সম্পাদনার দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৭৩ সনে কলকাতায় সাপ্তাহিক 'মীযান' প্রকাশে সহায়তা করেন এবং ১৯৭৪ পর্যন্ত এ প্রকাশনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৭ সনে ত্রৈমাসিক ও পরবর্তীতে মাসিক 'কলম' এবং একই সাথে ১৯৮১ সনে মাসিক 'পৃথিবী' পুনঃপ্রকাশের পর এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একই সাথে ১৯৭৭ সনে 'দৈনিক সংগ্রাম' পুনঃপ্রকাশের পর এর শিশু-কিশোর বিভাগ সম্পাদনার সাথে সাথে পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগেও যোগ দেন। মাঝে শিশু বিভাগের দায়িত্ব অন্যের উপর ন্যস্ত হওয়ায় তিনি শুধু ফিচার বিভাগ 'ইতিহাস ঐতিহ্য' বিভাগের দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে আবার শিশু বিভাগের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত হয়েছে।

পরিচ্ছন্ন সাংবাদিকতা, সুস্থ সমাজ ও সাহিত্য-চিন্তা আবদুল মান্নান তালিবের সাংবাদিকতার প্রধান লক্ষ্য। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবন অতিবাহিত হলেও তা গতানুগতিক পেশাগত দায়িত্ব পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটা তাঁর জীবনের এক নিরবচ্ছিন্ন মিশন। এ মিশন এক নতুন প্রত্যয় ও আলোর শপথে দীপ্ত। আবদুল মান্নান তালিব সে প্রত্যয়দীপ্ত আলোর শপথে উদ্দীপ্ত এক প্রাণময় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। নিজে দারিদ্র্য-সংকুল সাংবাদিকতার বন্ধুর, শ্বাপদঘেরা জনারণ্যে পথ করে নিয়েছেন তাই নয়, অনেককেই সে পথের সন্ধান দিয়েছেন, হাত ধরে একত্রে পথ চলার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তাই সাংবাদিক হিসেবে তাঁর সার্থকতাও কম নয়।

সাহিত্যিক আবদুল মান্নান তালিবের খ্যাতি সমধিক। সাহিত্য ও সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক গবেষণা-প্রসূত লেখা বিদগ্ধ, মননশীল পাঠককে যথার্থই অভিভূত করে। তবে অনুবাদ সাহিত্যেই তাঁর অবদান সর্বাধিক। আরবী ও উর্দু ভাষা থেকে তিনি বহু সংখ্যক মূল্যবান গ্রন্থ অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর

www.pathagar.com

অনুবাদ অত্যন্ত সহজ ও স্বচ্ছন্দ। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে তাঁর অবদান অসাধারণ। তাঁর রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের তালিকা নিম্নরূপঃ

মৌলিক রচনা

প্রবন্ধগ্রন্থ ঃ ১. অবরুদ্ধ জীবনের কথা, ১৯৬২, ২. মুসলমানের প্রথম কাজ, ১৯৭৫, ৩. বাংলাদেশে ইসলাম, ১৯৭৯, ৪. ইসলামী সাহিত্যঃ মূল্যবোধ ও উপাদান, ১৯৮৪, ৫. আমল ও আখলাক, ১৯৮৬, ৬. ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সংগ্রামী জীবন, ১৯৮৭, ৭. ইসলামী আন্দোলন ও চিন্তার বিকাশ, ১৯৮৮, ৮. সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা ঃ ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট, ১৯৯১, ৯. ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন, ১৯৯৪, ১০. সত্যের তরবারি ঝলসায়, ২০০০, ১১. আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম ২০০১।

সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ ১২. আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, ১৯৬৯, ১৩. সহীহ আল বুখারী, ১ম খণ্ড, ১৯৮২, ১৪. সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, ১৯৯৬, ১৫. রিয়াদুস সালেহীন, ১ম খণ্ড, ১৯৮৫, ১৬. মুসলিম শরীফের মুকদ্দমা, ১৯৮৬, ১৭. নির্বাচিত গল্প, ১৯৮৫, ১৮. সত্য সমুজ্জ্বল, ১৯৮১, ১৯. রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা, ১ম খণ্ড, ১৯৯৫, ২০. রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা ২য় খণ্ড ২০০২।

শিশু-কিশোর সাহিত্য ঃ ২১. সহজ পড়া, ১৯৮২, ২২. ছোটদের ইসলাম শিক্ষা, ১ম ভাগ, ১৯৮০, ২৩. ছোটদের ইসলাম শিক্ষা, ২য় ভাগ, ১৯৮১, ২৪. ছোটদের ইসলাম শিক্ষা, ৩য় ভাগ, ১৯৮২, ২৫. ইসলাম শিক্ষা, ১ম ভাগ, ১৯৭৬, ২৬. ইসলাম শিক্ষা, ২য় ভাগ, ১৯৭৬, ২৭. এসো জীবন গড়ি, ১ম ভাগ, ১৯৭৫, ২৮. এসো জীবন গড়ি, ২য় ভাগ, ১৯৭৬, ২৯. পড়তে পড়তে অনেক জানা, ২০০০, ৩০. মা আমার মা, ২০০১, ৩১. আমাদের প্রিয় নবী, ১৯৭৫, ৩২. মজার গল্প, ১৯৭৬, ৩৩. কে রাজা ? ১৯৮১, ৩৪. হাতিসেনা কুপোকাত, ১৯৯০, ৩৫. আদাবু আরাবীয়া, ১৯৮৪।

অনুবাদ সাহিত্য ঃ ৩৬. খতমে নবুওয়াত, ১৯৬২, ৩৭. পয়গামে মোহাম্মদী, ১৯৬৭, ৩৮. ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ, ১৯৬৪, ৩৯. ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন, ১৯৬৫, ৪০. ইসলামের দৃষ্টিতে জীবন বীমা, ১৯৬৬, ৪১. ইসলামের সমাজ দর্শন, ১৯৬৭, ৪২. সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, ১৯৭৯, ৪৩. আত্মশুদ্ধির ইসলামী পদ্ধতি, ১৯৭৬, ৪৪. আত্মশুদ্ধি কিভাবে? ১৯৭৬, ৪৫. ভাষাভিত্তিক জাহেলিয়াতের পরিণাম, ১৯৭৫, ৪৬. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি, ১৯৬৮, ৪৭. মুসলিম নারীর নিকট ইসলামের দাবী, ১৯৮২, ৪৮. মহররমের শিক্ষা, ১৯৭৭, ৪৯. ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী, ১৯৭৫, ৫০. কুরবানীর শিক্ষা, ১৯৭৬, ৫১. চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান, ১৯৬৮, ৫২. রাসায়েল ও মাসায়েল, ২য় খণ্ড, ১৯৯১, ৫৩. যরবে কলীম, ১৯৯৪, ৫৪. সীরাতে সারওয়ারে আলম, ১ম খণ্ড, ১৯৮১, ৫৫. রাসায়েল ও মাসায়েল, ৩য় খণ্ড, ১৯৯১, ৫৬. রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা, ৩য় খণ্ড ১৯৯৪, ৫৭. রিয়াদুস সালেহীন, ২য় খন্ড, ১৯৮৬, ৫৮. রিয়াদুস সালেহীন, ৩য় খণ্ড, ১৯৮৬, ৫৯. রিয়াদুস সালেহীন, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৮৭, ৬০. ইরান বিপ্লব ঃ একটি পর্যালোচনা, ১৯৮২, ৬১. সহীহ আল বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৮২, ৬২. তাফহীমুল কুরআন, ১ম খণ্ড, ১৯৮৯, ৬৩. তাফহীমুল কুরআন, ১৯ খণ্ড, ১৯৯১, ৬৪. তাফহীমুল কুরআন, ২য় খণ্ড, ১৯৯৩, ৬৫. তাফহীমুল কুরআন, ৩য় খণ্ড, ১৯৯৪, ৬৬. তাফহীমুল কুরআন, ৪র্থ খণ্ড, ৬৭. তাফহীমুল কুরআন, ৫ম খণ্ড, ৬৮. তাফহীমুল কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬৯. তাফহীমুল

www.pathagar.com

কুরআন, ৭ম খণ্ড, ৭০. তাফহীমুল কুরআন, ৮ম খণ্ড, ৭১. তাফহীমুল কুরআন, ৯ম খণ্ড, ৭২. তাফহীমুল কুরআন, ১০তম খণ্ড, ৭৩. তাফহীমুল কুরআন, ১১তম খণ্ড, ৭৪. তাফহীমুল কুরআন, ১২তম খণ্ড, ৭৫. তাফহীমুল কুরআন, ১৩তম খণ্ড, ৭৬. প্রত্যয়ের সূর্যোদয়, ২০০০।

উপরোক্ত গ্রন্থসমূহের বিভিন্ন তালিকা থেকে আবদুল মান্নান তালিবের সাহিত্য-চর্চা সম্পর্কে একটা মোটামুটি পরিচয় লাভ করা যায়। অনেকটা লোকচক্ষুর অন্তরালে, অবিচল নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ দশক কাল ধরে প্রায় অর্ধশত গ্রন্থ রচনা অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজে নিয়োজিত থেকে তিনি বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছেন তা আমাদেরকে বিস্ময়-আনন্দে নিরতিশয় অভিভূত করে। ফলে কৌতূহলী পাঠকের শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে তিনি স্থায়ী আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছেন বলে আমার ধারণা।

তাঁর রচিত 'বাংলাদেশে ইসলাম' একটি অতি মূল্যবান গবেষণামূলক গ্রন্থ। লেখকের ইতিহাস-দৃষ্টি এবং তত্ত্বানুসন্ধান আমাদেরকে অনেক অজানা বিষয়ের সন্ধান দিয়েছে। আমরা যতটা জেনেছি, তার চেয়ে অধিক আমাদের জিজ্ঞাসাকে তিনি জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছেন। সেদিক দিয়ে তিনি ইতিহাস-পাঠকের সামনে এক নতুন দিক-নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছেন। 'ইসলামী সাহিত্য ঃ মূল্যবোধ ও উপাদান' এবং 'সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা ঃ ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট' এ দুটো গ্রন্থ সাহিত্য-সংস্কৃতি চিন্তার ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণাপ্রসূত দুটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা। আধুনিক সমস্যা-সংকুল জীবনে পরিপূর্ণরূপে এর বাস্তবায়ন কীভাবে সম্ভব তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-গবেষণা চলছে। ইসলামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা-ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে সাহিত্য-সংস্কৃতির কী রূপ, পরিচয়, উপাদান ও প্রেক্ষিত হতে পারে আবদুল মান্নান তালিব তা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করেছেন। তাঁর আগে এ সম্পর্কে দু'চারটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচিত হলেও কোন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হয়নি। এ বিষয়ে পরবর্তীতে হয়ত আরো অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হবে, হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু আবদুল মান্নান তালিবের উপরোক্ত দুটি গ্রন্থ এ ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করবে বলে আমার ধারণা।

শিশু-কিশোর সহিত্যেও আবদুল মান্নান তালিবের অবদান কম নয়। তাঁর রচিত শিশু-কিশোর সহিত্যের তালিকা থেকে আমরা এ ক্ষেত্রে তাঁর মূল্যবান অবদান সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারি।

আবদুল মান্নান তালিবের সম্পাদনায় যে কয়টি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সে ক্ষেত্রে তাঁর নিষ্ঠা, শ্রম ও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

অনুবাদ কর্মেও আবদুল মান্নান তলিবের নৈপুণ্য অসাধারণ। বিভিন্ন ভাষায় তাঁর দক্ষতা, কঠিন বিষয়কে সহজ, মনোগ্রাহী ভাষায় রূপান্তর এবং অনুবাদকে মূল রচনার মত সাবলীল গতিসম্পন্ন করে তোলার অনায়াস সক্ষমতা আবদুল মান্নান তালিবের অনুবাদকে পাঠকের কাছে অতিশয় আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

সংগঠক হিসাবে আবদুল মান্নান তালিবের ভূমিকাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইসলামের দৃষ্টিতে সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে সংগঠনের ভূমিকা

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬০ সনে আমি পাবনা থেকে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। পাবনা ত্যাগের আগ পর্যন্ত আমি 'পাবনা জেলা সাহিত্য পরিষদে'র সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। ঢাকাতে এসেই বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে একটি আদর্শবাদী সাহিত্য সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্য উঠেপড়ে লাগি। সংগঠনের একটি গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র তৈরী করা হয়। সর্বসম্মতভাবে সবকিছু অনুমোদনের পর কমিটি গঠিত হয়। আবদুল মান্নান তালিব তখন সাপ্তাহিক "জাহানে নও"- এর সহকারী সম্পাদক এবং কবি হিসাবে যথারীতি খ্যাতি অর্জন করেছেন। আমরা তাঁকেই নবগঠিত "পাক সাহিত্য সংঘের" সভাপতি নির্বাচন করলাম। আমি সাধারণ সম্পাদক। কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন জনাব শাহ আব্দুল হান্নান, সহ-সভাপতি (সাবেক সচিব ও বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান), অধ্যাপক নূরুল আলম রইসী, সালেহ উদ্দিন আহমদ (জহুরী), কোষাধ্যক্ষ। প্রায় এক দশক কাল প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত সক্রিয় ছিল এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে ইসলামী চেতনার বিকাশ ও ইসলামী ভাবধারায় সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা দানে এর সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

বাংলাদেশ আমলে প্রতিষ্ঠিত 'বাংলা সাহিত্য পরিষদে'র তিনি পরিচালক এবং প্রধান প্রাণ-পুরুষ। একদিকে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সাহিত্য সৃষ্টি, অন্যদিকে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একদল আদর্শনিষ্ঠ তরুণকে সাহিত্য-চর্চায় উৎসাহী করে তোলা, তাদের বই-পুস্তক প্রকাশ ও প্রবীণদেরকে যথাসাধ্য পৃষ্ঠপোষকতা দানের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠান আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। এ প্রতিষ্ঠানের সকল কর্ম-প্রচেষ্টার সাথে আবদুল মান্নান তালিবের আন্তরিক প্রয়াস অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। বাংলাদেশে সুস্থ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাস কখনো লেখা হলে সেক্ষেত্রে তার গঠনমূলক উজ্জ্বল ভূমিকার কথা অবশ্যই বিশেষ স্থান লাভ করবে।

১৯৭০ সনের জানুয়ারীতে 'দৈনিক সংগ্রাম' প্রকাশিত হলে আবদুল মান্নান তালিবের সাথে আমার আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ হয়। আমি সাহিত্য সম্পাদক এবং উনি শিশু-কিশোর পাতার সম্পাদক হিসাবে দৈনিক সংগ্রামে আমাদের কাজ শুরু হয়। আমাদের দায়িত্ব দু'বছর স্থায়ী হয়। পরবর্তীতে নব পর্যায়ে দৈনিক সংগ্রাম যখন আবার আত্মপ্রকাশ করে তখন আবদুল মান্নান তালিব পুনরায় সেখানে যোগদান করেন আমি জীবিকান্বেষণে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দুবাই চলে যাই এবং সেখানেই শুরু করি আমার জীবনের নতুন অধ্যায়। কিন্তু আবদুল মান্নান তালিবের সাথে আমার সংযোগ ছিন্ন হয়নি। তাঁর সাহিত্য-চর্চা এবং সাংগঠনিক তৎপরতার সাথে আমি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি। বিগত তিন দশকে তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য-কর্ম সম্পন্ন হয়েছে বলে আমার ধারণা। সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি এখনো অতিশয় সক্রিয়। আমি মনে করি, নব্বই-এর দশকে এবং পরবর্তীতে তিনি অনুবাদ-কর্মের দিকে বেশী মনোযোগী হন। পরিণত বয়সে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অনুভব দিয়ে তিনি আমাদের সাহিত্যের ভাণ্ডারকে আরো বেশী সমৃদ্ধ করবেন এ প্রত্যাশা সঙ্গতভাবেই করা চলে।

আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সাংগঠনিক তৎপরতার ক্ষেত্রে আবদুল মান্নান তালিব দীর্ঘ প্রায় অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সাংগঠনিক কাজের ক্ষেত্রে আমি দীর্ঘকাল তাঁর সহযাত্রী হিসাবে কাজ করেছি। মাঝখানে দীর্ঘ বিশ বছর আমি প্রবাসে কাটাই বলে এক্ষেত্রে কিছুটা ছেদ ঘটে। কিন্তু আমি সব সময়ই তাঁর সাথে

www.pathagar.com

যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেছি। দুবাইতে আমার প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুলে'র উদ্যোগে আমি ১৯৯০-১৯৯৬ পর্যন্ত যে বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলন ও পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করি, সেখানে প্রধান অতিথি নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমি সর্বদা তাঁর ও বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণ করেছি। যদিও এ কাজটা আমি সরাসরি করতে পারতাম, কিন্তু তাঁর এবং বাংলা সাহিত্য পরিষদের সাথে সম্পর্ক রাখার উদ্দেশ্যেই আমি তাদের সহয়োগিতা নিয়েছি। 'বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ' সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে আমি বাংলা সাহিত্য পরিষদকে একবার লেখক-ভাতা দেবার প্রস্তাব করি। প্রস্তাবে উল্লেখ ছিল যে, মাসিক এক হাজার টাকা হিসাবে বছরে বার হাজার টাকা প্রদান করা হবে এবং তা দিয়ে কোন একজন যোগ্য লেখককে দিয়ে কবি ফররুখ আহমদের উপর একটি বই লেখানো হবে। সে হিসাবে আমার প্রস্তাব মত এক বছরের জন্য বার হাজার টাকা আমি একসাথে তালিব সাহেবের মাধ্যমে চেক মারফত বাংলা সাহিত্য পরিষদকে প্রদান করি। আমার উপস্থিতিতেই বাংলা সাহিত্য পরিষদের নির্বাহী কমিটি বিশিষ্ট সাহিত্য-গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদকে নির্বাচন করে উদ্দীষ্ট কাজটি করার জন্য। জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ যথারীতি ফররুখ আহমদের উপর একটি মূল্যবান গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখে বাংলা সাহিত্য পরিষদে পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছিলেন বলেও শুনেছি।

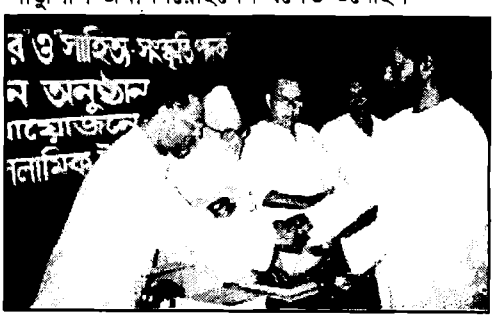

বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুল, দুবাই-এর পক্ষ থেকে আব্দুল মান্নান তালিবকে সাহিত্য পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন লেখক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

এভাবে আমি বিদেশে থেকেও আবদুল মান্নান তালিবের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। ১৯৯৪ সনে আমি তাঁকে "বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুল, দুবাই" সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করি। পুরস্কার প্রদান উপলক্ষে উক্ত সনে জুলাই মাসে ঢাকাস্থ 'জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে' এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বহু গণ্যমান্য কবি-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিসেবীর উপস্থিতিতে সেদিন অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে আমি তাঁর হাতে পুরস্কারের টাকা ও সনদ তুলে দিয়েছিলাম। সাহিত্য-কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ, আমার জানামতে, এটাই ছিল তার প্রথম পুরস্কার।

২০০০ সনে আবদুল মান্নান তালিব 'কিশোর কণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার' লাভ করেন। তাঁর মত নিরলস সাহিত্য ও সংস্কৃতি-কর্মী এ যাবত যেসব পুরস্কার ও স্বীকৃতি পেয়েছেন তার চেয়ে বড় পুরস্কার ও স্বীকৃতি তাঁর পাওনা বলে মনে করি। তবে পুরস্কার ও স্বীকৃতির দ্বারাই সব সময় সবকিছুর মূল্যায়ন হয় না, হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়। যথার্থ প্রতিভাবান ব্যক্তিরা কখনো পুরস্কার পাওয়ার উদ্দেশ্যে কোন কাজ করেন না, তাঁদের কাজের পেছনে একটা অনুপ্রেরণা ও লক্ষ্য কাজ করে। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নেই তাঁরা যথার্থ আনন্দ লাভ করে থাকেন। আবদুল মান্নান তালিবও তাঁর জীবনের মিশন পূরণের জন্য নিরলসভাবে একাগ্র চিত্তে কাজ করে যাবেন এটাই সকলের একান্ত প্রত্যাশা।

www.pathagar.com

কবি আফজাল চৌধুরী স্মরণে

মৃত্যু অনিবার্য– প্রত্যেক জীবকেই এ অনিবার্য মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। মৃত্যুর নির্দিষ্ট কোন দিন-ক্ষণও নেই। যে কোন সময়, যে কোন ব্যক্তিই অনিবার্য মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারে। তাই জ্ঞানীজনেরা সর্বদা মৃত্যুর কথা স্মরণ করে পৃথিবীতে মুসাফিরের মত বসবাস করেন। অর্বাচীনেরাই কেবল পৃথিবীর কুহকী মায়ায় মোহাবিষ্ট থাকেন।

বিগত ১০ জানুয়ারি, ২০০৪ প্রত্যূষে পত্রিকা খুলতেই প্রথম পৃষ্ঠায় ছবিসহ একটি ছোট খবরের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। 'কবি আফজাল চৌধুরী আর নেই'। ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ-হতবাক হয়ে গেলাম। এমন বলিষ্ঠ পৌরুষদীপ্ত বড় মাপের মানুষটি সকলের অলক্ষ্যে নিভৃতে সিলেট শহরের একটি হসপিটাল কক্ষে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৯.১.২০০৪ তারিখ সন্ধ্যায় আকস্মিকভাবে ইন্তিকাল করেন– ইন্নালিল্লাহি ওইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর জন্ম ১০ মার্চ ১৯৪২, সে হিসাবে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৬২ বছর।

ছোট খবরটি বার বার পড়লাম। খুটে খুটে শ্মশ্রুমন্ডিত টুপিপরিহিত যৌবনদীপ্ত তাঁর ফুটফুটে ছবিটির দিকে বার বার তাকালাম। না কোনই ভুল নেই। অনিবার্য মৃত্যুর শীতল হাত তাঁকে নশ্বর পৃথিবীর আলো-বাতাস থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে অনন্ত ধামে তাঁর প্রভুর সান্নিধ্যে। হত-বিহ্বল চিত্তে নানা কিছু ভাবছিলাম। এমন সময় ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠলো। রিসিভার তুলতেই পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। 'দৈনিক সংগ্রামে'র সাহিত্য সম্পাদক স্নেহাস্পদ সাজ্জাদ হুসাইন খান বললেন, 'মতি ভাই খবর শুনেছেন?' –বললাম 'হ্যাঁ। দেশের জন্য, আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি হলো। আল্লাহ তাঁর আত্মার উপর রহম করুন।'

সাজ্জাদ বললেন, 'আগামী জু'মাবার দৈনিক সংগ্রাম কবি আফজাল চৌধুরীর উপর বিশেষ সংখ্যা বের করবে, আপনি লেখা দিবেন।' বললাম, 'নিশ্চয় দেব।' টেলিফোনে মরহুম কবি সম্পর্কে আরো অনেক কথা হলো। মাত্র অল্প কয়েকটি বছর ছাড়া সরকারী কলেজে কার্যোপলক্ষে কবি আফজাল চৌধুরী দীর্ঘকাল মফঃস্বল শহরেই কাটিয়েছেন। যে কটি বছর তিনি লিয়েনে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা হিসাবে ঢাকায় কর্মরত ছিলেন সে কটি বছর তিনি ঢাকার সাহিত্য-সংস্কৃতি মহলে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। বিগত কিছুদিন যাবৎ তিনি ঢাকায়

www.pathagar.com

আসার জন্য খুব ব্যগ্র ছিলেন। ঢাকায় এলে ঢাকার সাহিত্য-সংস্কৃতি মহল তাঁর পদচারণে আবার প্রাণ-চঞ্চল হয়ে উঠতো। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, ইতোমধ্যেই তিনি তাঁর প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন, আমাদের সকলকে শোকাচ্ছন্ন করে।

এ শোকাবহ খবরটি জানাবার জন্য টেলিফোন করলাম বিশিষ্ট কবি, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক জনাব মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহকে। শুনে তিনিও খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন। তাঁর তাৎক্ষণিক মন্তব্য হলো ঃ 'আফজাল চৌধুরী অনেকটা নিভৃতচারী ছিলেন, তিনি লিখতেন খুবই কম, কিন্তু ছিলেন একজন শক্তিশালী কবি, ষাটের দশকের সম্ভবত তিনিই ছিলেন সর্বাধিক শক্তিশালী কবি। কাব্য-নাট্য রচনায়ও তাঁর পারঙ্গমতা ছিল অসাধারণ।' প্রসঙ্গত তিনি আরো অনেক কথা বললেন কবি আফজাল চৌধুরী সম্পর্কে।

দুপুরে কার্যোপলক্ষে মগবাজারে গেলাম। সেখানে দেখা হলো শরীফ আব্দুল গোফরানের সাথে। আশির দশকের একজন কবি। দেখা হতেই সে বললো ঃ 'মতি ভাই আজ বিকেলে বাংলা সাহিত্য পরিষদ কবি আফজাল চৌধুরীর উপর এক দোয়া ও আলোচনা সভার আয়োজন করেছে, আপনি আসবেন।' বিকেল পৌনে তিনটায় বাসায় ফিরে শুনলাম 'বাংলা সাহিত্য পরিষদে'র পরিচালক বিশিষ্ট গবেষক আব্দুল মান্নান তালিব ও আশির দশকের বিশিষ্ট কবি সোলায়মান আহসানও টেলিফোন করেছিলেন একই উদ্দেশ্যে বাংলা সাহিত্য পরিষদের দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠানে আমাকে দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে। সকলেই মর্মাহত। তাই সকলের আন্তরিক অনুভূতি ব্যক্ত করার জন্য এই তাৎক্ষণিক আয়োজন।

মাগরিবের অল্প একটু পরে উপস্থিত হলাম বাংলা সাহিত্য পরিষদে। সেখানে 'কবি গোলাম মোহাম্মদ হলে' দোয়া ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। কনকনে শীত আর বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে একে একে অনেকেই হাযির হলো। সকলের চোখে-মুখেই বিষণ্নতার ছাপ। প্রিয়জন হারানোর বেদনায় আকুল।

আব্দুল মান্নান তালিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হলো। ভাব-গম্ভীর, ব্যথা-মলিন পরিবেশে একে একে স্মৃতি-চারণ করলেন আশির দশকের পাঁচ প্রতিভাবান কবি– শরীফ আব্দুল গোফরান, তমিজ উদ্দীন লোদী. মুকুল চৌধুরী, হাসান আলীম ও সোলায়মান আহসান, বিশিষ্ট সংগঠক, সাংবাদিক ও কথাশিল্পী মাহবুবুল হক। তমিজ উদ্দীন লোদী, মুকুল চৌধুরী ও সোলায়মান আহসান কলেজ-জীবনে কবি আফজাল চৌধুরীর ছাত্র ছিলেন। কবিতা-চর্চা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও দিক-নির্দেশনা পেয়েছে তারা। মরহুম কবির সাথে তাদের দীর্ঘ ঘনিষ্ঠতা ও সাহচর্যের কথা স্মরণ করে তারা বেদনার্ত কণ্ঠে অনেক স্মৃতির কথা স্মরণ করলো। ভাব-গম্ভীর পরিবেশে তাদের আবেগাকুল উচ্চারণ সকল শ্রোতার হৃদয়কে ছুয়ে গেল। শরীফ আব্দুল গোফরান ও মাহবুবুল হক মরহুম কবির সাহসিকতা, ঈমানী তেজদীপ্ততা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের কিছু পরিচয় তুলে ধরলেন।

সবশেষে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে আমি মরহুমের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করার সুযোগ পেলাম। এরপর অনুষ্ঠানের সভাপতি আব্দুল মান্নান তালিব মরহুমের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে উপস্থিত সকলকে নিয়ে তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া করলেন। অনুষ্ঠানে জাতীয় পর্যায়ে নাগরিক শোক-সভার আয়োজন, স্মরণিকা প্রকাশ ও বাংলা একাডেমী কর্তৃক মরহুম কবির রচনাবলী প্রকাশের দাবী জানানো হয়।

www.pathagar.com

কবি আফজাল চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার তেমন সুযোগ আমার হয়নি। ষাটের দশকের একজন বলিষ্ঠ কবি-কণ্ঠ হিসাবে আমি তাঁকে জানতাম। তিনি লিখতেন কম, প্রকাশ করতেন আরো কম। তাই আত্ম-প্রচার বিমুখ এই কবিকে অনেকেই জানার তেমন সুযোগ পায়নি। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি মফঃস্বলে কাটিয়েছেন বলে সাহিত্য-সংস্কৃতির বৃহত্তর অঙ্গনে তাঁর পরিচিতি তেমনভাবে ঘটেনি। ফলে তাঁর মত এমন বড় মাপের প্রতিভার পক্ষে যতটুকু স্বীকৃতি পাওয়া উচিত ছিল, দুর্ভাগ্যবশত তিনি তা পাননি। বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক ইত্যাদি কোন কিছুই তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। এমনকি, সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন করার প্রয়াসও তেমন একটা লক্ষ্য করা যায়নি।

প্রায় এক যুগ আগে কবি আফজাল চৌধুরীর সাথে আমার আকস্মিক প্রথম পরিচয়। আমি তখন প্রবাসে থাকি। বাৎসরিক ছুটিতে এসে একদিন দৈনিক সংগ্রাম অফিসে গেলাম। সংগ্রামের সাহিত্য সম্পাদক সাজ্জাদ হুসেইন খানের সামনে আফজাল চৌধুরী বসা। আমাকে দেখেই সাজ্জাদ পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর সঙ্গে। আমি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম বুকে। অনেক শুনেছি তাঁর সম্পর্কে, কিন্তু ঐ প্রথম দেখা তাঁর সাথে। অনেক কথা হলো। তখন তাঁর হাতে একটি ইংরেজি বই ছিল– 'বার্নাবাসের বাইবেল' (The Bible of Bernabus)। তিনি ওটার অনুবাদ করেছেন। বইটির প্রতি আমার আগ্রহ লক্ষ্য করে অবলীলায় তিনি আমাকে ওটা দিয়ে দিলেন। প্রথম দেখাতেই এক স্মরণীয় উপঢৌকন। আমি বইটি সাথে করে নিয়ে গেলাম দুবাই। তন্ন তন্ন করে বার বার ওটা পড়েছি, আমার বিভিন্ন লেখায় ওটা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি। খৃস্টধর্মের আসল রহস্য উদ্ঘাটনে এবং হযরত ঈসাকে (আ) জানার জন্য বইটি বিশেষ সহায়ক।

কবি আফজাল চৌধুরীর সাথে আমার দ্বিতীয় বার সাক্ষাত ঘটে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারে 'নতুন কলম' পত্রিকার সম্পাদক কবি মোশাররফ হোসেন খানের কামরায়। তখন নতুন কলমে তাঁর 'সিলেট বিজয়' নামক একটি নাটক ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল। ১৯৯৭ কিংবা ১৯৯৮ সন। দিন-তারিখ সঠিক মনে নেই। সেদিনও অনেক কথা হলো তাঁর সাথে। তাঁর সাহিত্য-চর্চা সম্পর্কে আলোচনা হলো। তাঁকে আরো বেশি বেশি লেখার অনুরোধ করলাম। আমি তখন আমার 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য' শীর্ষক বইটি নিয়ে কাজ করছিলাম। তিনি এ ব্যাপারে আমাকে উৎসাহ দিলেন। ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার বইটি প্রকাশ করে।

কবি আফজাল চৌধুরীর সাথে আমার তৃতীয় বার সাক্ষাৎ ঘটে হবিগঞ্জে খুব সম্ভবত ১৯৯৯ সনে। হবিগঞ্জের এক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। আমি সেখানে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেছিলাম। সে উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে অনেক কথা হলো। আমি তাঁকে আমার সম্পাদিত 'ফররুখ একাডেমী পত্রিকার' জন্য ফররুখ-বিষয়ক লেখা চাইলাম। তাঁকে আরো অনুরোধ করি ফররুখ আহমদের উপর একটি বই লিখতে। তিনি আমার উভয় প্রস্তাবেই রাজি হন এবং বলেন, ফররুখ আহমদের উপর তাঁর কয়েকটি লেখা আছে। আর কয়েকটি লেখা হলেই একটি বই হতে পারে। আমি শুনে খুব খুশি হলাম এবং যথাশীঘ্র তা সমাপ্ত করে আমার নিকট পাঠাতে অনুরোধ করলাম এবং কথা দিলাম যে, একাডেমীর পক্ষ থেকে তা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে।

www.pathagar.com

এর কিছুদিন পর পত্রিকায় তাঁর নামে একটি বিজ্ঞাপন দেখলাম। সিলেটে 'দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ একাডেমী'র পক্ষ থেকে মরহুম আজরফের উপর প্রকাশিতব্য একটি স্মরণিকার জন্য লেখা চাওয়া হয়েছে। আমি কুরিয়ারে লেখা পাঠালাম। লেখার সাথে আফজাল চৌধুরীর নামে একটি চিঠিও পাঠালাম। চিঠিতে উপরোক্ত দুটি বিষয় ছাড়াও আর একটি অনুরোধ ছিল। আমি কবি আফজাল চৌধুরীর উপর একটি প্রবন্ধ লেখার আগ্রহ ব্যক্ত করে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি আমাকে পাঠাতে অনুরোধ করেছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত আমি তাঁর কাছ থেকে কোন জবাব পাইনি। কবি মুকুল চৌধুরীর নিকট থেকে টেলিফোন নম্বর সংগ্রহ করে সিলেটে তাঁকে টেলিফোন করলাম। কিন্তু তখন তিনি ছিলেন হবিগঞ্জে। তাই কথা হয়নি।

কবি আফজাল চৌধুরীর সাথে আমার ব্যক্তিগত স্মৃতি এতটুকুই। স্বল্পপ্রজ হিসাবে তাঁর একটি পরিচিতি আছে। কিন্তু তিনি একজন আত্মমগ্ন কবি ছিলেন। তিনি যেমন ছন্দ-সচেতন ছিলেন, তেমনি ছিলেন শব্দ-সচেতন, বিষয়-সচেতন, আঙ্গিক-সচেতন ও ইতিহাস-সচেতন। এছাড়া, তিনি ছিলেন ফররুখ আহমদের মত ঐতিহ্যনিষ্ঠ। তাঁর মত প্রতিভাদীপ্ত কবির সংখ্যা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অতিশয় বিরল। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র ছয়টি। এগুলো হলো ঃ

১. কল্যাণব্রত (কাব্যগ্রন্থ, ১৯৬৯)
২. হে পৃথিবী নিরাময় হও (তিনাঙ্গ কাব্য নাটক, ১৯৭৯)
৩. শ্বেতপত্র (কাব্য, ১৯৮৩)
৪. সামগীত দুঃসময়ের (কাব্য, ১৯৯৬)
৫. ঐতিহ্যচিন্তা ও রসূল প্রশস্তি (প্রবন্ধ, ১৯৭৯)
৬. বার্নাবাসের সুসমাচার (বার্নাবাসের বাইবেলের অনুবাদ, ১৯৯৬)

কবির অপ্রকাশিত গ্রন্থের একটি তালিকা দিয়েছেন কবি মুকুল চৌধুরী। তার দেওয়া তালিকাটি নিম্নরূপঃ

১. বন্দী আরাকান ও অন্যান্য কবিতা
২. নয়া পৃথিবীর জন্য (কবিতা)
৩. খোশহাল খান খটকের জন্য (কবিতা)
৪. আরেক গোলার্ধে হৃদয় (কবিতা)
৫. শবমেহেরের মুক্তি (কবিতা)
৬. শেষ নবীর গৃহাঙ্গণ (কবিতা)
৭. শাশ্বতের পক্ষে (কবিতা)
৮. জালালুদ্দিন কবির কবিতা (অনুবাদ)
৯. আলী শরীয়তীর কবিতা (ঐ)
১০. বাঁশী (কাব্য-নাটক)
১১. সবুজগম্বুজে ঢাকা ফুল (গীতি-নকশা)
১২. সিলেট বিজয় (নাটক)
১৩. কবিতার সংসারে জটিলতা (প্রবন্ধ)
১৪. প্রতিশ্রুতি কথকতা (প্রবন্ধ)

এছাড়াও হয়ত তাঁর আরো পাণ্ডুলিপি থাকতে পারে। তাঁর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সকল গ্রন্থের তালিকা অবিলম্বে তৈরি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

www.pathagar.com

কবি আফজাল চৌধুরীর একান্ত স্নেহভাজন ছাত্র কবি মুকুল চৌধুরী জানালেন, ফররুখ আহমদের উপর লেখা তাঁর একটি বইও নাকি তিনি আমাকে প্রকাশার্থে দেয়ার জন্য প্রায় প্রস্তুত করে ফেলেছিলেন। তাঁর সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের জন্য এখন বাংলা একাডেমী এবং অন্যান্যদের এগিয়ে আসা উচিত।

আফজাল চৌধুরী ছিলেন একাধারে কবি, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাবিদ। তাঁর কাব্যগ্রন্থ কল্যাণব্রত প্রকাশের পর ষাটের দশকের কবি ও সংগঠক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ ১৯৭০ সালে 'কণ্ঠস্বর' পত্রিকার কবিতা সংখ্যায় লেখেন ঃ "আমাদের কাব্যক্ষেত্রে ষাটের অঙ্গন যেসব উদ্যোগী তরুণের আশান্বিত পদভারে সরব হয়েছিল, আফজাল চৌধুরী তাদের অন্যতম। অন্য অনেকের মতো আমরাও... যারা সেই নতুন কবিতা চেষ্টার প্রতিটি অনিবার্য ও সজীব প্রণতাকে উদগ্রীব প্রত্যাশা নিয়ে লক্ষ্য করে চলছিলাম সে সময়, নিশ্চিতভাবে অনুভব করেছিলাম, আফজাল চৌধুরীর সপারগ হাত এমন কিছু উল্লেখযোগ্য উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি দেখাচ্ছে যা সজীব ও প্রাণবন্ত এবং যা আগামী সময়ের আকাঙ্ক্ষিত দিনগুলোয় কবিতার সচ্ছল প্রয়াসে আমাদের কাব্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে। আফজাল চৌধুরী সম্বন্ধে আমাদের এককালের সেই উদ্বুদ্ধ আশাবাদ যখন আজ সুনিশ্চিত সন্দেহের সম্মুখীন, কবি নিজেই যখন নিস্পৃহ হয়ে আসছেন কবিতা রচনার সক্রিয় প্রচেষ্টা থেকে, যখন কবিতার সব রঙিন পালক হারিয়ে আফজাল চৌধুরী এখন কেবল একটা নাম... শুধু নাম... তাঁর কবিতা আস্বাদনের উত্তপ্ত আলোড়নগুলোও আমাদের হারানো অতীতের অনেক জীবন্ত ঘটনার মতো, ম্লান হতে হতে দূর থেকে দূরে অপসৃয়মান, সেই সময় হঠাৎ আফজাল চৌধুরীর কাব্য সংকলন অতীতের সব পুরোনো স্বাদ ও উত্তাপ নিয়ে ফিরে এসে আমাদের আস্তিন ধরে নাড়া দিয়েছে।

"কল্যাণব্রত' আফজাল চৌধুরীর গত কয়েক বছরে রচিত কবিতার সংকলন। আঙ্গিকের দিক থেকে এই কবিতাগ্রন্থ একটা কারণে আমাদের সমকালে প্রকাশিত অন্যসব কবিতার বই থেকে স্বতন্ত্র। সেটা হলো প্রতিটি কবিতা রচনার পূর্ব মুহূর্তে যে বোধ ও প্রেরণা তাকে অস্বস্ত ও আলোড়িত করেছে, এই গ্রন্থের প্রতিটি কবিতার প্রারম্ভে তিনি সেই আলোড়নের ইতিহাস দিয়েছেন স্বচ্ছন্দ ও কবিতাময় গদ্যে। কবিতার ভূমিকা সংযোজনের এই রীতিকে বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে অভিনব বলবো না, তবে সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে অন্য কোনো কবি এই আঙ্গিক গ্রহণ করেছেন বলে মনে করতে পারছি না। এদিক থেকে আফজাল চৌধুরীর এই আঙ্গিক সমকালীনতার প্রেক্ষাপটে নতুনত্বের দাবী করতে পারে। এর ফলে প্রতিটি কবিতা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে কবিতা রচনার মুহূর্তে লেখক যে ভাবনা ও অভিজ্ঞতার স্পর্শে উজ্জীবিত হয়েছিলেন, অনুরণিত হয়েছিলেন যেসব বোধ ও বিশ্বাসের দ্বারা... তার পরিচয় পাঠকের চোখে পুরোপুরি ধরা পড়ায় কবিতার পূর্ণাঙ্গ আস্বাদন সহজতর হয়ে ওঠে।

"কল্যাণব্রত' পাঠের সময় এই কাব্যের যে গুণটি বড় হয়ে পাঠকের চোখের সামনে ভাসে তা হলো ঃ এর স্বকীয়তা। আফজাল চৌধুরীর কণ্ঠস্বর আলাদা ও স্বকীয়, স্বাদে ও চরিত্রে গতানুগতিক কবিতা থেকে আলাদা। তার কবিতার ডালে ডালে শব্দের যে অবাক বিস্ময় গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে ফুটে আছে... তা যে কোন পাঠককেই আকর্ষণ করবে।

"আফজাল চৌধুরীর কবিতা যে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র তার কারণ শুধু এই নয় যে, যে শব্দশরীরকে আশ্রয় করে কবিতার বিকাশ... তার কবিতার সেই শব্দশরীর অন্যদের

www.pathagar.com

কবিতার শব্দশরীর থেকে আলাদা। তার কবিতা আলাদা, তার কারণ তার জীবনানুভূতি আলাদা। তার কবিতা পড়তে বসে টের পাই, এক সজীব বিশ্বাসময়তা ছুঁয়ে আছে তার কবিতার হাত, এক রোমাঞ্চিত অসীমের চঞ্চল উন্মুখ শিহরণ উত্তাল হাওয়ার মতো দোল দিয়ে যাচ্ছে তার কবিতার বিস্রস্ত পাতায় পাতায়। আমাদের সমকালের ব্যাপ্ত নৈরাজ্য, অবিশ্বাস, আস্থাহীনতা ও বস্তুসর্বস্বতার মধ্যে যাদের বিস্রস্ত আত্মা ক্রন্দন করছে 'আনন্দের অমৃতময় উৎসবে' সমর্পণের ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষায়, যাদের পথের দুই পাশে 'রাশি রাশি পুলক' আর 'নভোচারী আনন্দ' ঝরে যায় সকাল-বিকেল, আফজাল চৌধুরী তাদের একজন। আমাদের সাম্প্রতিক কবিতার ক্ষেত্রে যে কয়টি নিঃসঙ্গ হৃদয় 'অমৃতের সফল আরতির' আকাশে স্বাস্থ্যময় হাত বাড়াতে চেষ্টা করেছেন, তাদের মধ্যে আফজাল চৌধুরীর নাম অন্তর্ভুক্ত।

"তার কবিতার একটা প্রধান গুণ ঃ দৃঢ়, সংবদ্ধ বাঁধুনি। একটা সংহত ক্ল্যাসিক্যাল স্বাস্থ্য আছে তার কবিতায়... যেন পাথর কেটে তৈরি করা। ভারসাম্যময়, স্মিত ও উদাত্ত তার কবিতা... আবেগকে ঘনীভূত করে শব্দ ও পংক্তির বাঁধনে সুসংবদ্ধ করা হয়েছে অবলীলায়।"

বাংলা একাডেমী থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯৭১-এ প্রকাশিত ও ডক্টর রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত 'আধুনিক কবিতা'য় ষাটের দশকের কবিদের মধ্যে আফজাল চৌধুরীর স্থান ছিল শীর্ষে। রফিকুল ইসলাম তাঁর ভূমিকায়ও আফজাল চৌধুরীর নাম ও তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায় ঃ "ষাট দশকে আমাদের কাব্যক্ষেত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল সাময়িক পত্র-পত্রিকার অভাব পূরণার্থে নিয়মিত ও অনিয়মিত কাব্য-সংকলন বা কেবলমাত্র কবিতার জন্যে পত্রিকার প্রকাশ। .....ঐ সব নিয়মিত-অনিয়মিত কবিতা সংকলন ও পত্র-পত্রিকা থেকে ষাট দশকের শেষপাদে বেশকিছু প্রতিভাবান তরুণ কবি আত্মপ্রকাশ করেছেন। এই কবিদের মধ্যে আফজাল চৌধুরী, আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, মোহাম্মদ রফিক, রফিক আজাদ, আসাদ চৌধুরী, মহাদেব সাহা, আবু কায়সার, হুমায়ুন আযাদ, নির্মলেন্দু গুণ, আবুল হাসান, সাযযাদ কাদির, রাজীব আহসান চৌধুরী, ফরহাদ মজহার, হুমায়ুন কবির আমাদের সমকালীন কাব্যক্ষেত্রে অতি পরিচিত নাম। এর মধ্যে উক্ত কবিদের অনেকেরই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বা হচ্ছে যথা আফজাল চৌধুরীর 'কল্যাণব্রত', আবদুল মান্নান সৈয়দের 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' ও 'জ্যোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা' মোহাম্মদ রফিকের 'বৈশাখী পূর্ণিমা' রফিক আজাদের 'অন্তরংগ দীর্ঘশ্বাস', নির্মলেন্দু গুণের 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই', সাযযাদ কাদিরের 'যথেচ্ছধ্রুপদ' ইত্যাদি। উক্ত কাব্যগ্রন্থসমূহ কবিতা শিল্পের নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সমৃদ্ধ। বস্তুত সত্তর দশকের আমাদের কবিতা কোন খাতে প্রবাহিত হবে তার আভাস পাওয়া যায় আমাদের তরুণতম কবিদের ঐ সৃষ্টিধারা থেকেই।" (পৃষ্ঠা ৯১-৯২)

আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদের সম্পাদনায় নলেজ হোম, ঢাকা থেকে ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয় 'এক দশকের কবিতা'। সেখানে ষাটের দশকের ৩৮জন কবির কবিতা সংকলিত হয় এবং এ ৩৮ জনের তালিকায় আফজাল চৌধুরীর স্থান ছিল তৃতীয়। আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ তাঁর উক্ত সংকলনের ভূমিকায় আফজাল চৌধুরীকে 'সুসংহত প্রত্যয়স্মিত কবি' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

www.pathagar.com

বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্য-সমালোচক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বাংলা একাডেমীর 'উত্তরাধিকার' পত্রিকায় শহীদ দিবস ১৯৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর পঁচিশ বছরের কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে আফজাল চৌধুরীকে মূল্যায়ন করেন এভাবে ঃ "আফজাল চৌধুরী কবিতায় শুধু রূপরচনা করেই তৃপ্তি বোধ করেন না, অধিকন্তু নৈরাশ্য, হতাশা, বিষাদবোধ ও মানসিক-সংকটের আলেখ্য রচনাও তার উদ্দেশ্য নয়, তিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে বিশেষ বক্তব্য উপস্থিত করতে চান; আস্তি ও নাস্তির দ্বন্দ্ব, আশা-নৈরাশ্যের টানাপোড়েন এবং মানবিকবোধকে তিনি কবিতায় উৎসারিত করতে চান- তাই প্রায় প্রতিটি ছন্দে সমর্পিত কবিতার পাশাপাশি গদ্যে রচনা করেন সে সবের ভাষ্য। 'কল্যাণব্রতে' উদ্বুদ্ধ বলেই তাঁর কবিতায় হতাশা-নৈরাশ্যের আঁধিকে বিদীর্ণ করে ঝলকিত যেন আশাবাদের আলো... আফজাল চৌধুরীর কবিতায় আলোর প্রার্থনা এবং সত্যলোকে উৎসারিত হবার আকাঙ্ক্ষাই নানাভাবে রূপ পেয়েছে। তিনি এক ধরনের দার্শনিক অভিজ্ঞান ও আর্তিতে মানব-যাত্রীদের ইতিহাস-পরিক্রম ও পর্যটন করেন, সভ্যতার অগ্রযাত্রার স্বরূপ অন্বেষণ ও পর্যবেক্ষণ করেন এবং আকাঙ্ক্ষা উচ্চারণ করেন মানবমুক্তির– নাস্তি থেকে আস্তিতে উত্তরণের মাধ্যমেই যে এই মুক্তি আসতে পারে এই বিশ্বাসে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ী।" (উত্তরাধিকার, শহীদ দিবস সংখ্যা, ১৯৭৪)।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ অন্যত্র আফজাল চৌধুরী সম্পর্কে বলেন ঃ "আফজাল চৌধুরী ষাট এবং সত্তরের দশক থেকেই মানবতাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন, 'কল্যাণব্রত'ই তার সাহিত্য সাধনার ও কাব্য-চর্চার উদ্দীষ্ট বা অভীষ্ট লক্ষ্য হয়ে ওঠে। রোমান্টিক মানস প্রবণতার অধিকারী, স্বপ্ন ও সৌন্দর্যবোধের রূপকার হলেও আফজাল চৌধুরী নিছক 'শিল্পের জন্য শিল্প' নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি ছিলেন জীবননিষ্ট, রহস্য সন্ধানী এবং ক্রমাগত এক মহাশক্তির অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে আস্থাবান। প্রতীক ও রূপকের আশ্রয়ে এবং কিছুটা রহস্যময় ভাষায় তিনি উচ্চারণ করেছেন, 'কে যেন শূন্যলোকে ডেকে গেল কাছে আয় কাছে আয় নারে/ হেমন্তের একরাশ পাতা ঝরে যাওয়া গেরুয়ায়/.... চারিভিতে নির্জনতা অস্বচ্ছ শূন্যতা কেঁপে যায় শুধু ...কে যেন বারম্বার নাম ধরে ডেকে যায় তবু/ কাছে আয় আয় নারে' (স্বর, কল্যাণব্রত, ডিসেম্বর ১৯৬৯)। পরবর্তীকালে আফজাল চৌধুরী এই অদৃশ্য 'স্বর'কে অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার আহ্বানকে শুধু শ্রুতিতে নয়, হৃদয়ের গভীরে অনুধাবন ও আবিষ্কার করেছেন, তিনি হয়ে উঠেছেন মানব 'কল্যাণব্রতী' এবং ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী। আফজাল চৌধুরী ছিলেন শুধু কাব্যের নয়, বিশ্ব ইতিহাসের মানব সভ্যতার অগ্রগতির বিচিত্রধারার অভিনিবিষ্ট পাঠক। তাঁর খণ্ড কবিতার গ্রন্থ 'কল্যাণব্রত' এবং কাব্য নাটক 'হে পৃথিবী নিরাময় হও'-এর অর্জনও কবিতাবলীতে রয়েছে একজন মানব কল্যাণকামী এবং ইসলামের মানবতাবাদে বিশ্বাসী ও শান্তিকামী মানুষের আর্তি-আকুলতা এবং শান্তির অন্বেষ। আফজাল চৌধুরী যে ইতিহাসের অভিনিবিষ্ট পাঠক এবং মানব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ তারও স্বাক্ষর আছে তাঁর কবিতায়। আফজাল চৌধুরীর গভীর পর্যবেক্ষণ ঃ "তোমার নিজের গোত্র কাল হতে কালান্তরে ঈগল বংশের/ শিকারীরা রমণীরা ভেসে গেছে জীবনের অরন্তুদ স্রোতে। শরাব ও সান্ত্বনার অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারে। (কল্যাণব্রত).....

আফজাল চৌধুরী ছিলেন তাঁর আদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী, আদর্শবোধে উজ্জীবিত এবং এক ধরনের 'মিশনারী জ্বিল' (Missionary Zeal)-এ উদ্দীপিত। তিনি ছিলেন

www.pathagar.com

একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ও সংগঠক।..... আফজাল চৌধুরীর 'কল্যাণব্রত', 'শ্বেতপত্র' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ পাঠ করে একজন শক্তিমান, মননশীল ও ছন্দ-দক্ষ কবিকে আবিষ্কার করেছিলাম, অনুধাবন করেছিলাম যে, সম্পূর্ণ প্রথাগত রীতির ও প্রচলিত ধারার অনুসারী কবি না হলেও তিনি নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেও এক ধরনের সুমিতি ও সুসাম্য বজায় রাখেন। তাঁর কাব্য-নাটক 'হে পৃথিবী নিরাময় হও' পাঠ করে একজন শক্তিমান এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দক্ষ কবিকেই আবিষ্কার করলাম, উপলব্ধি করলাম যে আফজাল চৌধুরীর কবি-হৃদয় শান্তি-অন্বেষী, সত্য, ন্যায়, শুভ ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠায় প্রত্যাশী এবং এ যুগের পৃথিবীর এবং সমকালীন মানব সভ্যতার তথা নাস্তিক্যবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী জড় সভ্যতার অসুস্থতায় তিনি ব্যথাহত এবং এই রোগের নিরাময়কারী।" (দৈনিক সংগ্রাম, ১৬ জানুয়ারি, ২০০৪)

কবি আফজাল চৌধুরীর কাব্য-নাটক "হে পৃথিবী নিরাময় হও" সম্পর্কে বিশিষ্ট কবি তালিম হোসেন বলেন ঃ "কাব্য নাটকের আঁধারে প্রাকৃত বস্তু ও অতি প্রাকৃত মর্মকে মুখোমুখি করা হয়েছে। এ দু'টোর মুখ্য প্রতিনিধি যথাক্রমে নাটকের প্রধান চরিত্র এবং নেপথ্য প্রধান 'পূণ্যাত্মা'। সঙ্গ, বিসঙ্গ ও অনুসঙ্গ চরিত্রে এসেছে কয়েকজন নিকটের মানুষ ও প্রিয়জন, ইতিহাস ঐতিহ্যের কতিপয় অতীত পুরুষ, 'পূণ্যাত্মা'র বিপরীত মেরুতে স্তিত 'দাজ্জাল' এবং প্রকৃতির উপশমী প্রতীকবৃন্দ। আখতার বর্তমান কালের ফসল, বর্তমান সভ্যতার ফসল হিসেবে একজন প্রতিভাবান শিল্পী। তার শিল্পকৃতি আধুনিক মানস ও চরিত্রে অনবদ্য। কিন্তু তার সৃষ্টিশীলতা আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন অভীজ্ঞার নিরন্তর অগ্রগমনের দিক-চিহ্নহীন অনুশীলনেরই সতীর্থ মাত্র। আর এই অনুশীলন আপন বৃত্তে অন্ধ আবর্তক বলে তার ফলশ্রুতি মানবতার জন্য বয়ে আনছে না উৎক্রান্তির কোন প্রয়োজনীয়, বাঞ্ছিত ফসল। শুধু তাই নয়, তার সৃষ্টি ও আবিষ্কারের বুদ্বুদ সারা বিশ্বকে এক জলাবদ্ধ পললের প্রেক্ষিত করে তোলে, তাতে আপন পচনশীলতাকে ক্রমশঃ আরোগ্য নয়- অপমৃত্যুর হাতে ছেড়ে দিচ্ছে।

এই অনিবার্য প্রক্রিয়ার শিকার হয়েই আধুনিক সৃষ্টিধর শিল্প-প্রতিভা আখতার নিজেকে শাস্ত্রোক্ত 'দাজ্জালের' মুখোমুখি দেখতে পাচ্ছে। এই মহাপরাক্রান্ত অশুভ শক্তির প্রজাস্বত্ত্ব মেনে নিলে অর্থাৎ তার বৈজয়ন্তী কাঁধে তুলে নিতে পারলে, আখতার তার অশান্ত চিত্ত বৈকল্যের হাত থেকে আপাতঃ সুখ সমৃদ্ধির নিশ্চিন্ত বলয়ে উত্তীর্ণ হতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। গতানুগতিকতা থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা বর্তমান বিশ্বের কতিপয় বিদ্রোহী স্ফুলিঙ্গের মতোই সে সহসা নিজের উৎস ও গন্তব্য সন্ধানে উদ্‌ভ্রান্ত। দাজ্জাল তাকে অমোঘ শক্তিতে নিজের দিকে টানছে; কিন্তু প্রচণ্ড নির্বেদে তাকে উপেক্ষা করে পরম পথের অবিচল অনুসন্ধিৎসায় সে চাচ্ছে পূণ্যাত্মার সান্নিধ্য ও তার উপশমী প্রভাব।"

গ্রন্থের অগ্রলেখায় বিধৃত কবির বক্তব্য উদ্ধৃত করে কবি তালিম হোসেন আরও লেখেন ঃ "এই বিবৃতি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় 'আপন ঘরে পরবাসী' এক উন্মন কবি ব্যক্তিত্ব পরবাসীকেই আপন ঘরে স্থিত প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন। তাঁর কাব্যে, তাই যতোই বৈরী পরিবেশ হোক 'পূণ্যাত্মা' এবং তার সহমর্মিরা উদ্‌ভ্রান্ত ঘর ছাড়া আখতারকে ঘরে ফিরে সহধর্মিনী প্রিয়ার বাহুবন্ধনেই নতুন পৃথিবী রচনা করতে প্রেরণা ও দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন।

www.pathagar.com

'হে পৃথিবী নিরাময় হও' থেকে কবি-কল্পনার হাতে দিকভ্রান্ত রুগ্ন পৃথিবী নিরাময়ের যে দিগাভাস পাচ্ছে, তা নতুন না হলেও আমাদের আধুনিক কবিতায় তার হাতছানি অভিনব। আজকের সাহিত্য বস্তুবাদের কলরোলে প্রায় বধির। তার পাশাপাশি অধ্যাত্মের ইশারা, সমৃদ্ধ সাহিত্যও আমাদের আছে। কিন্তু যা নেই বা থাকলেও খুবই দুর্নীরিক্ষ্য, তারই উজ্জ্বল উপহার বয়ে এনেছে এই কাব্য। বস্তুবিদ্ধতা থেকে অজর অধ্যাত্মে উত্তরণ। কবি এখানে অধমনের শরীক হয়েই উত্তমর্ণের ভূমিকা পালন করেছেন। এবং 'হে পৃথিবী নিরাময় হও' শুধু এক অসহায় জীবন অভীপ্সা মাত্র নয়। পাঠকের কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, এই কাব্যের কবি আপন অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় না হলেও অন্ততঃ সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় অতীন্দ্রিয় বিশ্বাসে বলীয়ান। তাই তাঁর আহ্বানে সংশয় বা দৌর্বল্যের চিহ্ন মাত্র নাই। আমি মনে করি কাব্যে কবির চরিত্র-বিভূতিই পাঠকের কাছে তাঁর অমোঘ ও অনিবার্য প্রভাব নিয়ে দেখা দেয়। এই অনিবার্য প্রভাবের উপযুক্ত বাহন হতে পারাতেই আঙ্গিক, প্রকরণ ও বাচন শৈলীর চরম সিদ্ধি। প্রাণ ও আত্মা ছাড়া বাহনের কোন ধ্রুপদী মূল্য বা উপযোগিতা নাই।

আমি শুধু নিজের এই বিশ্বাসের কথাই উচ্চারণ করতে পারি যে, কবি আফজাল চৌধুরী তাঁর বক্তব্যের অসাধারণত্বকে ভাষা, শৈলী ও আঙ্গিকের অত্যন্ত উপযুক্ত বাহনেই পাঠকের কাছে উপস্থিত করতে পেরেছেন। 'হে পৃথিবী নিরাময় হও' এর প্রকাশ মাধ্যম পদ্যমাত্র নয়, তার হৃদয় সংবেদ্য ও রস-সম্পূর্ণ কবিতা।"

কাব্য-নাট্য থেকে দীর্ঘ উদ্বৃতি পেশ করে কবি তালিম হোসেন তাঁর আলোচনার উপসংহার টেনেছেন এভাবে ঃ "প্রধানতঃ দৃঢ় সংবদ্ধ অথচ সাবলীল অক্ষরবৃত্ত মহাপয়ারে এই কাব্য রচিত হলেও এতে স্থান-কাল-পাত্রের মেজাজের সঙ্গে সহজ ও সংলগ্ন হতে গিয়ে কবি কখনো কখনো মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত ছন্দও ব্যবহার করেছেন। ছন্দপাতের ঘটনা এতই ক্বচিৎ যে অনায়াসে তুচ্ছ করা চলে এবং কোথাও নাটকের সংলাপ উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যে প্রয়োগসিদ্ধও বলা যায়। ভাষা সৌকর্য প্রাগ্রসর আধুনিক ধারাকে অস্বীকার করে, কখনো নবতর আভাসের প্রতিশ্রুতি বহন করে। অভিনব দৃশ্য পরিকল্পনা, নাটকীয় সংঘাত, প্রাণবন্ত সংলাপ এবং গীতল ও চিত্রল আবহের জন্য এই কাব্য নাটকের মহৎ সাফল্য সম্পর্কে আমি আশাবাদী।

বাংলা সাহিত্যের এক উন্নত ও স্থায়ী আসনের সোপান-মূলে আমি কবিকে সংবর্ধনা ও অভিনন্দন জানাই।" [তালিম হোসেন ঃ কবি আফজাল চৌধুরীর কাব্য নাটক; 'হে পৃথিবী নিরাময় হও', দৈনিক সংগ্রাম, ১১ এপ্রিল, ১৯৮২]।

কবি আফজাল চৌধুরী আধুনিক বাংলা কাব্যের এক অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মৌলিক প্রতিভাধর কবি। দুর্ভাগ্যবশত নানা কারণে তাঁর সম্পর্কে আমাদের জানাশোনা খুবই সীমাবদ্ধ। এ কারণে পাঠকের সুবিধার্থে উপরে কয়েকজন বিশিষ্ট সমালোচকের আলোচনা থেকে একটু বিস্তৃত আকারে উদ্বৃতি পেশ করা জরুরী মনে করলাম। তাঁর কাব্যের যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া এখন বাংলা কাব্যের অনুরাগী পাঠকদের জন্যে একান্তই আবশ্যক।

www.pathagar.com

প্রত্যয়দীপ্ত এক অসাধারণ তরুণের উজ্জ্বল জীবনালেখ্য

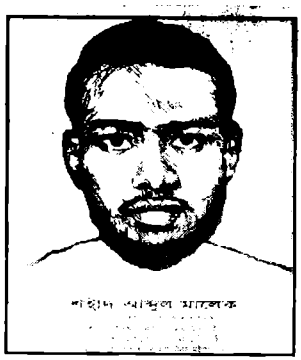

"আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না।" (সূরা বাকারা, আয়াত-১৫৪)।

"তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হলে অথবা ইন্তিকাল করলে, যা তারা জমা করে, আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া অবশ্য তা অপেক্ষা শ্রেয়। (সূরা বাকারা, আয়াত-১৫৭)।

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত।" (সূরা আল ইমরান, আয়াত-১৬৯)।

আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে যারা নিজের জীবন উৎসর্গ করেন বা শহীদ হন আল্লাহ তাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহে সুসংবাদ প্রদান করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূলেরও (স) বহু সংখ্যক হাদীস রয়েছে। এখানে একটি হাদীসের উল্লেখ করা হলোঃ

"নবী করীম (স) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নেক আমলসহ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, জান্নাতে তার এমন আনন্দ ও সুখময় জীবন যাপনের সৌভাগ্য ঘটে যে, তারপর সে আর দুনিয়ায় ফিরে আসার কথা ভাবেনা। কিন্তু শহীদগণ এর ব্যতিক্রম। তারা এ আশা পোষণ করে যে, তাকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানো হোক যাতে সে আল্লাহর পথে জীবন দেয়ার সৌভাগ্য ও আনন্দ বার বার লাভ করতে পারে।" (মুসনাদে আহমদ)।

শহীদের এত মর্যাদা ও পরকালে অসীম কল্যাণের কথা চিন্তা করে ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূলের (স) সাহাবাগণ শহীদ হওয়ার তামান্না পোষণ করতেন। যুগে যুগে আল্লাহর মু'মিন বান্দাগণও আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য এভাবে শাহাদতের তামান্না পোষণ করেছেন। এ কারণেই অসংখ্য শহীদের খুন-রাঙা পথে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম হয়েছে, জাহিলিয়াতের অন্ধকাররাশি বিদূরিত হয়ে দ্বীনের সমুজ্জ্বল আলোক-বিভায় দুনিয়া রওশন হয়েছে। বাংলাদেশেও আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য এ যুগে যে প্রতিভাদীপ্ত তরুণ সর্বপ্রথম বুকের তাজা খুন ঢেলে আল্লাহর রাহে শাহাদতের নজরানা পেশ করেছিলেন তাঁর নাম আব্দুল মালেক শহীদ। সে প্রথম শহীদের পথ অনুসরণ করে বাংলার যমীনে দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যে পরবর্তীতে আরো অনেক তরুণ-যুবা-বৃদ্ধ অকাতরে শাহাদতের পেয়ালা পান করে চলেছেন।

www.pathagar.com

শহীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শহীদ আব্দুল মালেকের জন্ম ১৯৪৭ সনের মে মাসে বগুড়া জেলার অন্তঃর্গত ধুনট থানার খোকসাবাড়ী গ্রামে। তাঁর আব্বার নাম মুন্‌শী মোহাম্মদ আলী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু, পরহিজগার ও সজ্জন ব্যক্তি। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে না পারলেও আরবী, উর্দু ও বাংলা ভাষায় তাঁর মোটামুটি দখল ছিল। শহীদের আম্মা ছবিরণ নেছাও ছিলেন অতিশয় ধর্মপরায়ণ। গ্রামের মক্তবে আরবী-উর্দু শিক্ষা লাভের পর সংসার-কর্মের ফাঁকে ফাঁকে তিনি গ্রামের ছোট মেয়েদেরকে আরবী তথা কুরআন শরীফ পড়াতেন। তাঁদের পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে শহীদ আব্দুল মালেক ছিলেন ছেলেদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ। বাবা-মায়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তারা সকলেই শৈশবে আরবী ও ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে। গ্রামের স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করে গ্রাম থেকে চার মাইল দূরে গোসাইবাড়ী স্কুলে শহীদ আব্দুল মালেক তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। এ স্কুলে পড়াকালে জোড়খালী গ্রামের মৌলভী মহিউদ্দিনের বাড়িতে তিনি কিছুদিন জায়গীর থাকেন। মৌলভী সাহেব তাঁকে নিজের সন্তানের মত স্নেহ করতেন এবং ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন। শহীদ আব্দুল মালেকও তাঁকে আজীবন শ্রদ্ধা করেছেন এবং তাঁর উৎসাহে ক্রমান্বয়ে ইসলামকে জানা এবং ইসলামী আন্দোলনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন।

১৯৬০ সনে আবদুল মালেক গোসাইবাড়ী স্কুল থেকে অষ্টম শ্রেণী পাশ করে জুনিয়র স্কলারশীপ লাভ করেন। ১৯৬১ সনে তিনি বগুড়া জেলা স্কুলে নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হন। ১৯৬৩ সনে এ স্কুল থেকে অংক ও রসায়ন বিষয়ে লেটারসহ তিনি এস. এস. সি পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ডে একাদশ স্থান অধিকার করেন। এরপর রাজশাহী কলেজে ভর্তি হয়ে সেখান থেকে ১৯৬৫ সনে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন ও অংকে লেটারসহ এইচ.এস.সি পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ডে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। ১৯৬৫ সনেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জৈব রসায়ন বিভাগে অনার্স ক্লাসে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনে নেতৃত্বদান কালে ১৯৬৯ সনের ১২ আগস্ট ছাত্র নামধারী কতিপয় ইসলাম-বিরোধী সন্ত্রাসী তাঁকে নির্মমভাবে লাঠিসোটা, লোহার বড় দিয়ে পিটিয়ে তাঁর মাথা ও সারা শরীর রক্তাক্ত করে দেয়। অজ্ঞান হয়ে তিনি রমনা রেসকোর্সের সবুজ চত্বরে লুটিয়ে পড়েন। শহীদের পবিত্র রক্তে বাংলার যমীন রক্তাক্ত হয়। সেখান থেকে অজ্ঞান অবস্থায়ই তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে ভর্তি করা হয়। করাচী থেকে বড় ডাক্তার আসে। কিন্তু ডাক্তারদের প্রাণপণ সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অজ্ঞান অবস্থায়ই ১৫ আগস্ট পড়ন্ত বিকেলে আব্দুল মালেক দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে জান্নাতবাসী হন। একটু পরেই মসজিদের মিনার থেকে আযানের সুর ভেসে আসে। মুহূর্তের মধ্যে বাংলার ঘরে ঘরে তার শাহাদত বরণের খবর ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামী আন্দোলনের অগণিত নেতা-কর্মীর বিগলিত অশ্রুধারায় সারা বাংলার যমীন সিক্ত হয়। প্রিয়জন হারানোর আর্ত কলরোল আর আযানের সুরেলা ধ্বনি একাত্ম হয়ে মিশে যায় গোধূলি আকাশের নিঃসীম অন্ধকারে।

বহুমুখী প্রতিভাদীপ্ত এক আদর্শ তরুণ

ছোটবেলা থেকে শহীদ আব্দুল মালেকের মধ্যে বহুমুখী প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। ছাত্র হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। ফলে গ্রামের পাঠশালা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত

www.pathagar.com

সকল স্তরে তাঁর শিক্ষকগণ তাঁকে বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞানানুশীলন এবং বিভিন্ন, বিচিত্র বিষয় সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসা সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর মধ্যে কোন অহংকার ছিল না, অন্যের কাছে নিজেকে প্রদর্শন করার মনোবৃত্তি তাঁর আদৌ ছিল না। তিনি ছিলেন স্বভাব-বিনয়ী, ভদ্র, নম্র, মিষ্টভাষী ও নিরহংকারী। মুহূর্তের মধ্যে অন্যকে এমন কি, শত্রুকেও বন্ধুতে পরিণত করার অসাধারণ মাধুর্যময় ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর। সহযোগী, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যদের প্রতি তাঁর মন ছিল আন্তরিক সহানুভূতিতে পূর্ণ। তাঁর সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবন ছিল সকলের জন্য অনুসরণীয়। সাদা পায়জামা, পাঞ্জাবী ও স্পঞ্জের স্যান্ডেল ছিল তাঁর ভূষণ। গ্রীষ্মের দারুণ দাবদাহ, বারিসিক্ত বর্ষা কিংবা প্রচণ্ড শীত সব ঋতুতেই তাঁর ছিল ঐ একই পোষাক। সারা দিন কঠোর কর্ম-ব্যস্ততা ও পড়াশোনা শেষে মধ্য রাত্রিতে তিনি নিজ হাতে কাপড় কেচে শুকাতে দিতেন। পরের দিন ভোরে সেই পরিষ্কার শুভ্র বসন পরে তার কর্মব্যস্ত জীবনের শুরু হতো।

দারিদ্র্য ছিল তাঁর আজীবনের সঙ্গী। স্কলারশীপের টাকা দিয়ে পড়াশোনার ব্যয়-নির্বাহ, নাস্তার পয়সা বাঁচিয়ে ও অন্যান্য খরচ কাট-ছাট করে প্রতি মাসে তিনি কিছু টাকা মায়ের জন্য পাঠাতেন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-মেহমানদের জন্য সাধ্যমত ব্যয় করতেন। আর এ সবই হতো তাঁর নিজের কঠোর কৃচ্ছসাধনার বিনিময়ে। তাঁর বিছানা বলতে যে ছোট্ট একটি চাদর ও বালিশ ছিল তাতে গা এলিয়ে শোবার সৌভাগ্য তার খুব কমই হয়েছে। প্রায়ই তাঁর ঘরে মেহমানদের আনাগোনা হতো, মেহমান বলতে সংগঠনের সহকর্মী ও বন্ধু-বান্ধবই ছিল বেশি। তিনি তাঁর নিজের বিছানা মেহমানদের জন্য ছেড়ে দিয়ে মেঝের উপর খবরের কাগজ বিছিয়ে কয়েকটি ম্যাগাজিন একত্র করে বালিশ বানিয়ে অনায়াসে ঘুমিয়ে পড়তেন। খুব ভোরে বিহঙ্গকুল জাগার আগেই তিনি গাত্রোত্থান করতেন, অন্যদেরকেও জাগিয়ে দিতেন, এক সঙ্গে সবাই মিলে ফযরের নামাজ আদায় করে দিনের কাজ শুরু করতেন। কথা-বার্তা, আচার-আচরণে তিনি ছিলেন এক অসাধারণ আদর্শ যুবক, মহানবীর (স) আদর্শের পতাকাবাহী, সাহাবায়ে কেরামের পদাংকানুসারী।

শহীদ আব্দুল মালেকের কক্ষের দরজার দু'পাশে লাল অক্ষরে লেখা দুটি উদ্ধৃতি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতপ্রার্থী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। তার একটি ছিল মহাগ্রন্থ আল্-কুরআনের সেই বিপ্লবী নির্দেশঃ "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকতেই হবে যারা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে–এরাই হবে প্রকৃত সফলকাম।" অপর দিকে লেখা ছিল মিসরের ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী নেতা শহীদ সাইয়েদ কুতুবের অমর বাণীঃ "আমরা ততদিন পর্যন্ত নিস্তব্ধ হব না, নীরব হব না, নিথর হব না যতদিন আল্-কুরআনকে এক অমর শাসনতন্ত্র হিসাবে দেখতে পাই। আমরা এই কাজে সফলতা অর্জন করবো নয় জীবন উৎসর্গ করবো।"

শহীদ আব্দুল মালেক যথার্থ অর্থে এ দুই অমর বাণীর জীবন্ত প্রতীক ছিলেন। আল্-কুরআনে বিধৃত উক্ত সফলকাম দলের তিনি ছিলেন এক পরম নিষ্ঠাবান কর্মী ও নেতা। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলনে নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলনের জন্য চাই পর্যাপ্ত ইসলামী জ্ঞান। আব্দুল মালেক প্রচলিত কোন দ্বীনী মাদ্রাসায় পড়াশোনা না করলেও কুরআন-হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করে তিনি পর্যাপ্ত ইসলামী জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। কুরআন-হাদীসের দরস ও ইসলামী বিষয়ের উপর তার যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনে সকলেই মুগ্ধ হতো ও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতো। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অন্য ধর্মের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য তাঁর আন্তরিক প্রয়াস ছিল অন্তহীন। সকল বাতিল আদর্শের মুকাবিলায় আল্লাহর দেয়া নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থাকে বিজয়ী করার জন্য যে ধরনের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, যোগ্যতা, সাহস, সংকল্পের দৃঢ়তা, নেতৃত্বের বলিষ্ঠতা ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা দরকার আব্দুল মালেক তা পূর্ণ মাত্রায় অর্জনের জন্য নিরন্তর সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর আমল-আখলাকের মধ্যে ইসলামের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছিল। তাঁর কথা ও কাজে কখনো অমিল লক্ষ্য করা যায়নি। মিথ্যা ও বাতিলের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সত্যের আপোষহীন, অকুতোভয় নির্ভীক সৈনিক। সুদৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের উজ্জ্বল আলোয় তাঁর চিত্ত ছিল প্রোজ্জ্বল। তাঁর অনতিদীর্ঘ শরীর তেমন বলিষ্ঠ ছিল না। গায়ের রঙ ছিল মিশমিশে কালো। তাঁর অনতিহ্রস কালো দাড়ি-গোফের ফাঁকে সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাঁর মাধুর্যময় চরিত্রের প্রতিফলন ছিল স্পষ্ট । তাঁর মেঘ-মেদুর কোমল চোখের দৃষ্টিতে স্বপ্ন-কল্পনার সুস্পষ্ট আভাস ছিল। সবদিক দিয়ে আল্-কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের তিনি ছিলেন উপযুক্ত অনুসারী। অপর দিকে, শহীদ সাইয়েদ কুতুবের উপরোক্ত অমর বাণীর তিনি যথার্থ অনুসরণ করেছেন আল্লাহর দ্বীনের জন্য তাঁর প্রিয় জীবনকে উৎসর্গ করে।

স্বল্পায়ু জীবনে বেশী লেখার অবকাশ তাঁর হয়নি। মাসিক 'পৃথিবী' পত্রিকায় 'আধুনিক বিশ্ব' শীর্ষক একটি নিয়মিত কলাম লেখা ছাড়াও কতিপয় প্রবন্ধ, দুটি ব্যঙ্গ রচনা ও বিভিন্ন জনের নিকট লেখা তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যে তাঁর যে গভীর জ্ঞান, প্রখর বুদ্ধিদীপ্ততা, মার্জিত রসবোধ ও আদর্শ ইসলামী জীবন-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে, তা অসাধারণ। নীচে কতিপয় উদাহরণ পেশ করছি। বগুড়ায় স্কুলে ভর্তি হবার পর চৌদ্দ বছরের কিশোর আব্দুল মালেক বাড়ীতে যে চিঠি লেখে তার অংশবিশেষঃ

"বাড়ীর কথা ভাবি না, আমার শুধু এক উদ্দেশ্য, খোদা যেন আমার উদ্দেশ্য সফল করেন। কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছি এবং কঠোর সংগ্রামে অবতীর্ণ, দোয়া করবেন খোদা যেন সহায় হন। আমি ধন-সম্পদ কিছুই চাইনা, শুধু মাত্র যেন প্রকৃত মানুষ রূপে জগতের বুকে বেঁচে থাকতে পারি।" (বগুড়া ২০.১২ ১৯৬১) ।

তাঁর জায়গীরদার ও পরম শুভাকাংক্ষী মৌলভী মহিউদ্দীনের নিকট লেখা তাঁর একটি চিঠির অংশবিশেষঃ "জানি আমার কোন দুঃসংবাদ শুনলে মা কাঁদবেন, কিন্তু উপায় কি বলুন? বিশ্বের সমস্ত শক্তি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। আমরা মুসলমান যুবকেরা বেঁচে থাকতে তা হতে পারে না। হয় বাতিলের উৎখাত করে সত্যের প্রতিষ্ঠা করবো, নচেৎ সে চেষ্টায় আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে। আপনারা আমায় প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করুন–জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও যেন বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারি। কারাগারের নিরন্ধ্র অন্ধকার, সরকারী যাঁতাকলের নিষ্পেষণ আর ফাঁসির মঞ্চও যেন আমায় ভড়কে দিতে না পারে।" (ঢা. বি. ২৪.২.১৯৬৬)।

www.pathagar.com

উপরে যে চিঠি লিখেছেন শাহাদতের পেয়ালা পান করে তিনি তার যথার্থতা প্রতিপন্ন করেছেন :

তাঁরই হাতে গড়া ইসলামী আন্দোলনের এক কিশোর কর্মী বিলালের কাছে লেখা তাঁর একটি চিঠির অংশবিশেষঃ "ইসলামের ইতিহাস পড়ে দেখো, রক্তের লাল স্রোত শুধু কারবালায়ই মিশে শেষ হয়ে যায়নি। আজও পৃথিবীর বুকে সহস্র কারবালার সৃষ্টি হচ্ছে। আজও মুসলমান ফাঁসির মঞ্চে নিজের জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে খোদার দ্বীনকে টিকিয়ে রাখার জন্য। তোমরা তো পৃথিবী দেখনি। দেখনি মুসলমানের উপর নির্যাতন, শোননি তাদের হাহাকার। যে ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্যে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মহামানব নিজের জীবন তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলেন, যার জন্যে হাজারো মুজাহিদের তপ্ত রক্ত পৃথিবীর মাটি লাল করে দিয়েছে, সেই ইসলামই লাঞ্ছিত হচ্ছে মুসলমানের হাতে।" (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৬৭)।

ইসলামী আন্দোলনের আর এক তরুণ কর্মীর নিকট লেখা তাঁর একটি চিঠির অংশবিশেষঃ "তোমাদের মত সতেজ প্রাণ মুজাহিদদের কথা স্মরণ হলে মনে অনেকটা আশার সঞ্চার হয়। জানি, যে স্বপ্নে আজ আমরা বিভোর সেই স্বপ্ন তোমাদেরও। .... আমরা চাই দুনিয়ার বুকে একটি ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করতে। ... প্রৌঢ়দের দ্বারা কোন বিপ্লব হবে না আলী, খালেদ, তারিক, মুহাম্মদ বিন কাসিম আর কোতায়বার মত নওজোয়ানরাই কেবল ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে। সব তমসার বুক চিরে যেদিন আমরা পথ করে নিতে পারব- সেদিন আমরা পৌঁছব এ দুর্গম পথের শেষ মঞ্জিলে। আর সেদিনই হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন " (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৬৭)।

'ধর্ম ও আধুনিক চিন্তাধারা', 'প্রত্যয়ের আলোকে আমাদের জীবন,' 'আদর্শ জীবন' প্রভৃতি শিরোনামে লেখা তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধে বুদ্ধিদীপ্ত প্রজ্ঞা, যুক্তি, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও ইসলামের সারবত্তা প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া, 'ইসলামী কমিউনিজম'-এর প্রবক্তাগণ ও বিবর্তনবাদের প্রবক্তা ডারউইনকে উদ্দেশ্য করে লেখা তাঁর দুটি ব্যঙ্গ রচনা 'হুজুর কেবলার দরবারে' এবং 'জনৈক বিজ্ঞান গুরুকে লিখছি' এর মধ্যে তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ ও তীক্ষ্ম যুক্তি ও তথ্যের সমাহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ দুটি লেখা উন্নতমানের বুদ্ধিদীপ্ত প্রহসনমূলক রচনা। আধুনিক জ্ঞান, চিন্তা-বুদ্ধি ও যুক্তির আলোকে জীবন-জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান ও ইসলামের বিপ্লবী আদর্শকে বিজয়ী ও সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিক প্রয়াস ছিল ক্লান্তিহীন ও নিরন্তর।

মানবতার সেবায় শহীদ আব্দুল মালেক

শহীদ আব্দুল মালেক ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন সম্পূর্ণ নির্মোহ। নিজের প্রয়োজন, অভাব ও দারিদ্র্য কখানো তাঁর মনকে ভাবাক্রান্ত করতো না। তাঁর সকল চিন্তা, ব্যস্ততা ও আগ্রহ-উদ্যম ছিল ইসলামী আন্দোলনের প্রচার-প্রসার ও সাফল্যকে নিয়ে। বাতিল আদর্শ, মত ও চিন্তাধারার উপর ইসলামের শাশ্বত আদর্শ, মানবতার চির কল্যাণকর বিধান ও সুন্দরতম, শান্তিপূর্ণ সামাজিক ব্যবস্থার বিজয়কে অবশ্যম্ভাবী করে তোলার কাজেই তাঁর একাগ্র প্রচেষ্টা ছিল নেতৃত্বের প্রতি তাঁর এতটুকু স্পৃহা ছিল না। অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ বা প্রশংসা পাওয়ার জন্য নয়, একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই তিনি মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এক কথায় তিনি ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত-প্রাণ এক

www.pathagar.com

আদর্শ কর্মী। অন্যদের নিকট তিনি ছিলেন এক অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। অন্যের সেবায় তিনি নিজেকে কীভাবে উৎসর্গ করে দিতেন এখানে তার দু'একটি দৃষ্টান্ত পেশ করবো।

একবার ঢাকার অদূরে জিঞ্জিরায় ইসলামী যুব-আন্দোলনের কর্মীদের জন্য একটি শিক্ষা-শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে খাদ্য বিভাগের দায়িত্ব পড়ে শহীদ আব্দুল মালেকের উপর। খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করা, বাজার করা, রান্না করা ও পরিবেশনা থেকে সকলের হাত ধোয়ানো পর্যন্ত সকল কাজ তিনি এমন নিষ্ঠা, ধৈর্য, বিনয়-নম্রতা ও সুষ্ঠুভাবে আনজাম দেন যে সকলে তা দেখে অভিভূত হয়। মানুষের সেবার মধ্যে যে আনন্দ খেদমতে-খাল্‌কের মাধ্যমে যে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যায়, আব্দুল মালেকের আচরণে তারই অকৃত্রিম প্রকাশ ঘটে।

আরেক বার শিক্ষা-শিবির অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার গুলশানে বিলের ধারে খোলা মাঠে। এবারে শিবিরের পরিচালকের দায়িত্ব ছিল শহীদ আব্দুল মালেকের উপর। একজন এসে তাকে জানালো, পায়খানাগুলোর অবস্থা নড়বড়ে। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, কিছুই বললেন না; কাউকে ডেকে সেগুলো ঠিক করার নির্দেশও দিলেন না। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, তিনি নিজেই মাজা পানিতে নেমে ময়লাযুক্ত পানির মধ্যে অতি যত্নের সাথে পায়খানাগুলো ঠিক করছেন। কর্মীরা দেখে তো অবাক! কোন কাজে কাউকে আদেশ করার আগে তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে সে কাজটি সম্পন্ন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা পছন্দ করতেন। এ রকম অসংখ্য ঘটনা আছে তাঁর জীবনে যা মহানবী (স) ও সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র জীবনাদর্শের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৯৬৯ সনে ১লা বৈশাখ ঢাকা শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রচণ্ড ঝড় হলো। ঝড়ের তাণ্ডবলীলায় ডেমরা, নাখালপাড়া, রামপুরা প্রভৃতি এলাকায় বহু লোক মারা গেল, অসংখ্য লোক আহত হলো, হাজার হাজার লোক হলো গৃহহীন, নিরাশ্রয়। খাবার পানি ও খাদ্যের অভাবে আর্ত মানুষের চীৎকারে করুণ অবস্থার সৃষ্টি হলো। আব্দুল মালেক এক মুহূর্ত দেরী না করে তাঁর সাথীদের নিয়ে গুলিস্তান, নিউমার্কেটের রাস্তায় মানুষের নিকট থেকে সাহায্য সংগ্রহ করে বিপন্ন মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, খাদ্যহীনকে খাদ্য, তৃষ্ণার্তকে পানি পান করাতে লাগলেন। মৃত গলিত লাশ সযত্নে কাঁধে তুলে তার গোসল ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করলেন। সাথীদের নিয়ে ঝড়ে বিধ্বস্ত ঘর-বাড়ী মেরামত করে দিলেন। এভাবে দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত সঙ্গীদের নিয়ে সারা দিনে প্রত্যেকে মাত্র আধ পাউন্ড করে পাউরুটি খেয়ে আর্ত-মানবতার সেবায় তারা নিজেদের উৎসর্গ করে দেয়। মানবতার সেবায় এভাবে আত্মোৎসর্গ করে দেবার নিদর্শন এ যুগে কেবল বিরলই নয়; একরূপ অকল্পনীয়। আব্দুল মালেক ছিলেন এক্ষেত্রে এক জ্বলন্ত অনুপ্রেরণার মহত্তম উৎস। তাঁর কাজ-কর্মে, আচরণে কোন কৃত্রিমতা ছিল না, প্রদর্শনেচ্ছা ছিল না, নেতৃত্বের মোহ তো ছিলই না, একমাত্র মহান আল্লাহর রেজামন্দী হাছিল করাই ছিল তাঁর জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। এ জন্যই অকাতরে তিনি সব সময় নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার জন্য উদগ্রীব থাকতেন।

ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনে শহীদ আব্দুল মালেক

শহীদ আব্দুল মালেক ছিলেন একজন অনলবর্ষী যুক্তিবাদী বক্তা। তাঁর ক্ষুরধার, জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে অনেকেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। ১৯৬৯ সনের শুরুতে যখন দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন শুরু হয় তখন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আউয়ুব খান

www.pathagar.com

ঐ বছর ২৫ মার্চ সামরিক শাসন জারী করেন। সামরিক সরকার দেশের জন্য নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের ঘোষণা দেয়। সামরিক সরকারের শিক্ষামন্ত্রী এয়ার মার্শাল নূর খান এ ব্যাপারে জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। এক পর্যায়ে তিনি ঢাকায় আসেন। শহীদ আব্দুল মালেকসহ দশজন ছাত্র প্রতিনিধির একটি দল নূর খানের সাথে সাক্ষাত করে। আব্দুল মালেক তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি ও বাচনভঙ্গীর মাধ্যমে এদেশের মুসলিম জনতার প্রাণের দাবী ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থার অপরিহার্যতার বিষয় তাঁর সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরেন। এর কিছুদিন পর সামরিক সরকার যে খসড়া শিক্ষানীতি ঘোষণা করে তা বহুলাংশে ছিল ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থার সপক্ষে। আব্দুল মালেক এ শিক্ষানীতির চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এর ইসলামী ধারাগুলোর গুরুত্ব সকলের সামনে তুলে ধরেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি হলে তাঁর তথ্যপূর্ণ যৌক্তিক আলোচনা সাধারণ ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৬৯ সনের ২রা আগস্ট ঢাকার নিপা মিলনায়তনে শিক্ষানীতির উপর আলোচনার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের দাওয়াত দেয়া হয়। ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রী ছাত্ররা সেখানে 'আধুনিক, বিজ্ঞান-ভিত্তিক, ধর্মনিরপেক্ষ' শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী তোলে। আব্দুল মালেক তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থার অপরিহার্যতা সম্পর্কে এক ওজস্বিতাপূর্ণ বক্তৃতা পেশ করেন। মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে তাঁর বক্তৃতা শেষ হয়। তাঁর বলিষ্ঠ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় শ্রোতারা বিস্ময়-বিমুগ্ধ। ফলে ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থার পক্ষে প্রস্তাব সহজেই পাশ হয়। কিন্তু আব্দুল মালেকের এ অসাধারণ সাফল্য ইসলাম-বিরোধীরা সহজে মেনে নিতে পারলো না। এ সাফল্য তাদের মনে জাহান্নামের আগুন জ্বালিয়ে দিল।

১২ আগস্ট তারা ডাকসুর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির প্রস্তাব পাশ করার উদ্দেশ্যে ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। কিন্তু বক্তারা ছিল পূর্ব-নির্ধারিত। সেখানে সাধারণ ছাত্র বা ইসলামপন্থী ছাত্রদেরকে আলোচনার সুযোগ দেয়া হলো না। বক্তাদের ইসলাম-বিরোধী বক্তৃতায় আব্দুল মালেকের নেতৃত্বে সাধারণ ছাত্ররা প্রতিবাদমুখর হয়। এক পর্যায়ে ইসলামপন্থী ছাত্ররাই হলে প্রাধান্য বিস্তার করে। বক্তৃতা ও যুক্তির বদলে ইসলাম-বিরোধীরা তাদের উপর হামলা চালায়। সভা লন্ড-ভন্ড হয়। নিরস্ত্র সাধারণ ছাত্ররা পলায়ন করে। কিন্তু সত্যের নির্ভীক সিপাহসালার আব্দুল মালেক তাঁর কতিপয় সঙ্গীকে নিয়ে জিহাদের ময়দানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন। শত্রুরা চতুর্দিক থেকে হামলা করে তাঁদেরকে তাড়া করে নিয়ে যায় রেসকোর্স ময়দানে। মাঠের মাঝখানে শত্রুরা লাঠি, লোহার রড ইত্যাদি দিয়ে আব্দুল মালেক ও তাঁর সাথী ইদ্রিসকে নির্মমভাবে পিটিয়ে সংজ্ঞাহীন করে ফেলে চলে যায়। দুর্বৃত্তেরা চলে গেলে পথচারীরা তাদেরকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। হাসপাতাল লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে।

আমি তখন ঢাকাস্থ সিদ্ধেশ্বরী নৈশ কলেজে অধ্যাপনা করি আর দিনের বেলায় চাকরী করি আমেরিকান প্রকাশনা সংস্থা ফ্রাংকলিন বুক প্রোগ্রামস-এর বাংলা বিশ্বকোষ প্রকল্পে সম্পাদক হিসাবে। আব্দুল মালেক বয়সে আমার দশ বছরের ছোট। ঘটনাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে আমি এক সময় ফজলুল হক মুসলিম হলের যে ১১২ নং কক্ষে ছিলাম, আব্দুল মালেকও ছাত্র জীবনে সেই একই রুমে বাস করতেন। ছাত্র-জীবন শেষ হলে আমি ৩৪ নং আগা মসিহ লেনে কয়েক বছর একটি মেসে ছিলাম। আব্দুল

www.pathagar.com

মালেকও কয়েক মাস সেখানে ঠিক আমার পাশের রুমেই থাকতেন। ঐ সময় তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখার এবং জানার সুযোগ হয় আমার। তিনি আমাকে বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করতেন। আমিও তাঁর ব্যবহার, প্রতিভা ও অনন্যসাধারণ ইসলামী ব্যক্তিত্বের জন্য অন্তর দিয়ে স্নেহ ও সমীহ করতাম। সত্যি বলতে কি, তাঁর মত নিবেদিত প্রাণ ইসলামী আদর্শের মূর্ত প্রতীক তরুণকর্মী আমি আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তাই খবর শুনে ব্যাকুল হয়ে দৌড়ে গেলাম হাসপাতালে। সংজ্ঞাহীন আব্দুল মালেককে দেখে বাঁধভাঙ্গা অশ্রুর বন্যা নেমে এল আমার চোখে। গভীর আবেগে তাঁর পা দুটি স্পর্শ করলাম। প্রাণভরে আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম আমার প্রাণপ্রিয় ছোট ভাই হাজার, লক্ষ ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীর হৃদয়ের স্পন্দন আব্দুল মালেকের জন্য। হাসপাতালে সমাগত ইসলামী আন্দোলনের শত শত নেতা-কর্মী আমার মতই স্তব্ধ-নির্বাক-আবেগাকুল চিত্তে তাঁর জন্য দোয়া করছিল। সকলের মুখেই বিষাদের ঘন কালো ছায়া। চোখে অবিরল অশ্রুধারা।

১৫ আগস্ট শাহাদত লাভের পরের দিন সকাল আটটায় জানাজার জন্য তাঁকে নিয়ে আসা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা, স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক, অসংখ্য আলেম, রাজনৈতিক নেতাকর্মীসহ সর্বস্তরের হাজার হাজার জনতা শরীক হলো জানাযায়। জানাযায় ইমামতি করলেন আর এক মর্দে মু'মিন আওলাদে রাসূল (স) মওলানা সৈয়দ মোস্তফা আল-মাদানী। সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বজ্রনির্ঘোষ ঘোষণা দিলেনঃ "ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে সমাজতন্ত্রী-ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে আব্দুল মালেক শাহাদতের যে দৃষ্টান্ত রেখে গেল তা অনুসরণ করে এদেশের হাজার হাজার আব্দুল মালেক ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য শহীদ হতে কুণ্ঠা বোধ করবে না।"

বৃদ্ধ মওলানার কাঁধে তখন রাইফেল ঝুলছিল। রণাঙ্গনের সেনাপতির মত তেজদীপ্ত আওলাদে রাসূলের কণ্ঠে তীব্র অনুশোচনার সুর ঃ "হায়! আমি যদি আজ আব্দুল মালেক হতাম! তাহলে আল্লাহর দরবারে শহীদের মর্যাদা লাভ করে জীবন সার্থক করতাম।"

আল্লাহ আওলাদে রাসূলের সে দোয়া কবুল করেছিলেন। এর কিছুদিন পর এক ইসলামী মহফিলে বক্তৃতারত অবস্থায় তিনিও ইসলামের দুশমনের হাতে গুলীবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন।

শহীদ আব্দুল মালেকের পথ ধরে তাঁর আন্দোলনের সাথীরা অদম্য সাহসে এগিয়ে এসেছে। ইসলামী আন্দোলনে শরীক হয়ে তারা এ যাবত অনেকেই শাহাদতের নযরানা পেশ করেছে। শহীদ আব্দুল মালেকের পবিত্র রক্তে সিক্ত বাংলার যমীনে দ্বীন কায়েমের সংগ্রামে আজ লক্ষ জনতা তাদের জানমাল নিয়ে সদা প্রস্তুত। এ যুগে আমাদের দেশে দ্বীন কায়েমের সংগ্রামে আব্দুল মালেক প্রথম শহীদ। তার খুন-রাঙা পথে যুব-জনতার সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের মাধ্যমেই এদেশে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় অনিবার্য হয়ে উঠবে ইনশাল্লাহ। তাই এদেশে দ্বীন কায়েমের সংগ্রামে শহীদ আব্দুল মালেক ছাত্র-জনতার নিকট এক অফুরন্ত অনুপ্রেরণার উৎস। মহান আল্লাহ তাঁর শাহাদত কবুল করুন ও আখিরাতে তাঁকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন আর তাঁর খুন-রাঙা পথে এদেশে ইসলামী আন্দোলনকে তার মনযিলে মকসুদে পৌঁছে দিন। আমিন।

www.pathagar.com

বুলবুল ইসলামের স্মৃতি

বুলবুল ইসলাম এখন শুধুই স্মৃতি। এত অল্প বয়সে এমন প্রাণবন্ত, বুদ্ধিদীপ্ত, নিষ্ঠাবান, হাস্যোজ্জ্বল, মৃদুভাষী ব্যক্তিটি চিরতরে অকস্মাৎ সকলের আড়ালে চলে যাবে তা বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন।প্রত্যেক জীবিত প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে–মহান স্রষ্টার এ অমোঘ সত্য বাণী সকল প্রাণীর জন্যই সত্য। কিন্তু তবু যখন কোন প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটে তখন আমরা সেটাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারি না, প্রাণে বিষাদের করুণ রাগিণী বেজে ওঠে। আর সেই প্রিয়জন যখন হয় কোন এক যৌবনদীপ্ত প্রতিশ্রুতিশীল ব্যক্তি, তখন তাকে হারানোর বেদনা হয় আরো দুঃসহ–বেদনাঘন। শুধু ব্যক্তি নয়, পরিবার নয়, সমাজের একটি সংবেদনশীল অংশ সে মৃত্যুতে মুষড়ে পড়ে।

বুলবুল ইসলামকে আমি সে রকম একজন প্রতিশ্রুতিশীল যুবক হিসাবেই জানতাম। তাঁর ব্যবহার ও আচরণ ছিল অত্যন্ত মার্জিত, রুচিবান ও আন্তরিক। তাঁর বন্ধুবাৎসল্য ও সরলতাপূর্ণ জীবন ছিল অনুকরণীয়। তাঁর মাধুর্যময় স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখে সব সময় হাসির প্রলেপ মাখা থাকতো, তাঁর মায়াবী চোখ দুটিতে ছিল প্রতিভার দীপ্তি। সবাইকে আপন করে কাছে ধরে রাখবার মত এক আশ্চর্য সম্মোহনী শক্তি ছিল তাঁর। সে ছিল বিনয়ী কিন্তু নিজের মত ও আদর্শে ছিল অটল, শিলাদৃঢ়।

বুলবুলকে আমার বেশী জানার সুযোগ হয়নি। বিগত শতকের নয় দশকের শুরুতে বা আট দশকের শেষের দিকে 'দৈনিক সংগ্রামে' প্রখ্যাত 'আনোয়ারা' উপন্যাসের লেখক মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্নের উপর বুলবুলের লেখা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন আমি দুবাইতে প্রবাস-জীবন যাপন করছিলাম। লেখাটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার কারণ হলো, নজিবর রহমান ও আমার বাড়ী একই গ্রামে–সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার চর বেলতৈল গ্রামে। সম্পর্কে তিনি আমার আত্মীয়ও ছিলেন। এছাড়া, ১৯৫৮ ঈসায়ীর মে মাসে 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় আমি নজিবর রহমান সম্পর্কে প্রথম বিস্তারিতভাবে লিখেছিলাম। ঐ সময় আমি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডক্টর গোলাম সাকলায়েনকে (তখন তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে বাংলার অধ্যাপক, পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন) নজিবর রহমান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করেছিলাম এবং তিনি তার ভিত্তিতে বাংলা একাডেমী পত্রিকায় বিরাটাকার প্রবন্ধ লিখেছিলেন। নজিবর রহমান সম্পর্কে তাঁর এবং আমার এ দুটো লেখাই ছিল প্রথম, মোটামুটি নির্ভরযোগ্য তথ্যবহুল রচনা। এরপর নজিবর রহমান সম্পর্কে যাঁরাই লিখেছেন, তাঁরা সকলেই ঐ দুটো লেখার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছেন। এরপর নজিবর রহমানের উপর যথার্থ মৌলিক গবেষণা করেছেন বুলবুল

www.pathagar.com

ইসলাম। আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, বুলবুল ইসলাম আমার এবং ডক্টর সাকলায়েন কর্তৃক উত্থাপিত অনেক তথ্যাদির ত্রুটি নির্দেশ করেছেন এবং এক্ষেত্রে আমি বুলবুল ইসলামকেই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি।

গবেষণা-কর্মে বুলবুল ইসলাম অতিশয় নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও আন্তরিকতার পরিচয় প্রদান করেছে। নজিবর রহমানের উপর লিখতে গিয়ে সে নজিবর রহমানের জন্মভূমি চর বেলতৈল এবং তাঁর শেষ জীবনের নিবাস হাটিকুমরুলে গেছে। সেখানকার এবং তার আশেপাশের এলাকার বিভিন্ন লোক, বিশেষতঃ প্রবীণ ব্যক্তিদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে বিস্মৃতপ্রায় ঔপন্যাসিক এবং তাঁর কীর্তিরাজি সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধিৎসা ও আগ্রহ সহকারে বিভিন্ন মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করেছে। তার মুখেই শুনেছি, এ কাজটি তার জন্য খুব সহজ ছিল না। এ জন্য তাকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। এমন কি, এক পর্যায়ে তাকে শারীরিক নির্যাতন পর্যন্ত সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু সে রণে ভঙ্গ দেয়নি। নজিবর রহমানকে নিয়ে নিজে লিখেছে, অন্যদেরকে দিয়ে লিখিয়েছে, সেমিনার করেছে, পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা বের করেছে ইত্যাদি নানাভাবে সে বিস্মৃতপ্রায় বাংলা সাহিত্যের এ প্রবাদতুল্য অসাধারণ কথাশিল্পীকে বর্তমান বিদগ্ধ সমাজের নিকট তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছে। এতে তার অসাধারণ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও লক্ষ্যে পৌঁছবার অদম্য আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়।

আমার কর্ম-জীবনের একটা বিরাট অংশ কাটে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই নগরীতে (১৯৭৭-৯৭)। দুবাই থাকতে আমি বুলবুল ইসলামের লেখার সাথে পরিচিত হই, কিন্তু তখনো লেখকের সাথে পরিচয় হয়নি। প্রতি বছর ছুটিতে বাড়ি এলেও লেখককে খুঁজে পাই নি, বরং বলা চলে, খোঁজার কোন চেষ্টাও করিনি, কারণ ছুটিতে অতটা সময় আমার হাতে থাকতো না। কিন্তু তার প্রতি আমার একটি কৌতূহল ছিল।

আমি দুবাইতে বিশ বছর প্রবাস-জীবন কাটিয়ে ১৯৯৭ সালের জানুয়ারিতে দেশে ফিরে আসি। তারপর অকস্মাৎ একদিন একটি টেলিফোন কল পেলাম। তরুণ কবি মতিউর রহমান মল্লিকের নিকট থেকে টেলিফোন নম্বর সংগ্রহ করে বুলবুল ইসলাম আমাকে টেলিফোন করে। আমি তার টেলিফোন পেয়ে তাকে দেখার ব্যাকুলতা প্রকাশ করি। সেও প্রায় অনুরূপভাবেই আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল। একদিন পরেই সে তার বন্ধু আজাদ ইসলামকে সাথে নিয়ে আমার বাসায় এসে হাজির হয়।

তখন সে 'জাতীয় নজরুল সমাজ' গঠন করে সে প্রতিষ্ঠানের কাজে-কর্মে পাগলপারা। মূলতঃ কাজ-পাগল মানুষটি যে কাজেই মনোনিবেশ করতো সে কাজেই সে মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে, একরকম আহার-নিদ্রা ভুলে গিয়ে আত্মনিয়োগ করতো।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কিছুকাল কুমিল্লায় অবস্থান এবং নার্গিসের সাথে তাঁর বিয়ে এবং আকস্মিক রহস্যময় কারণে নার্গিসকে ছেড়ে আসা, কুমিল্লার এক হিন্দু পরিবারে প্রমীলার সঙ্গে কবির বিয়ে ইত্যাদি বিষয় ছিল তখন বুলবুল ইসলামের আলোচনা-সভা-সমিতি-গবেষণা ও লেখা-লেখির বিষয়বস্তু। দেশের প্রখ্যাত কবি, গবেষক-শিক্ষাবিদ-লোকসাহিত্যিক ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী 'জাতীয় নজরুল সমাজে'র সভাপতি। দেশের এ বরেণ্য পণ্ডিত ব্যক্তিকে আমি আগেই চিনতাম। আমি ১৯৭০-৭১ সালে যখন 'দৈনিক সংগ্রাম' পত্রিকার সাহিত্য-সম্পাদক ছিলাম তখন বিভিন্ন সময় লেখার জন্য ডক্টর সিদ্দিকীর নিকট যেতাম। তিনি লেখা দিতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। ষাটের দশকে আমি যখন বিভিন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনে কাজ

www.pathagar.com

করতাম, তখনো তাঁর সহযোগিতা, উপদেশ-পরামর্শ লাভ করেছি। এমন একজন দরদী নিষ্ঠাবান সমাজহিতৈষী পণ্ডিত ব্যক্তি যখন 'জাতীয় নজরুল সমাজে'র সভাপতি ও বুলবুল ইসলামের মত কর্মোদ্যোগী ব্যক্তি এর সম্পাদক, সর্বোপরি, জাতীয় কবির নাম যার সাথে সংশ্লিষ্ট সে প্রতিষ্ঠান একটি কর্মচঞ্চল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক।

বুলবুল ইসলাম যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন এ প্রতিষ্ঠান ছিল খুব তৎপর, তার সময়কার বিভিন্ন সভা-অনুষ্ঠান-সংকলন ইত্যাদি তারই প্রমাণ। বুলবুল ইসলাম মৃত্যুর পূর্বে 'জাতীয় নজরুল সমাজে'র পক্ষ থেকে নজরুল-এর উপর একটি বিরাটায়তন সংকলন প্রকাশের কাজ হাতে নিয়েছিল। এ কাজে পেছনে বুলবুল ইসলামের যে কত কঠোর, নিরলস প্রচেষ্টা ছিল তা বলে শেষ করা যাবে না। বহু বিদগ্ধজনকে বুলবুল ইসলাম 'জাতীয় নজরুল সমাজে'র ব্যানারে একত্র করতে সক্ষম হয়েছিল। এটা তার দক্ষ সাংগঠনিক শক্তি, কর্মনিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচয় বহন করে।

সেদিন আমার বাসায় বুলবুল ইসলামের সাথে দীর্ঘ আলোচনা হলো। তার সাথে আমার বয়সের যথেষ্ট ব্যবধান ছিল। তাই প্রথম সাক্ষাতেই সে তাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করার অনুরোধ জানালো। আমি দ্বিধা-সংকোচ বোধ করলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার পীড়াপীড়িতে তাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে শুরু করলাম। এতে তার সাথে ঘনিষ্ঠতা আরো বেড়ে গেল। তার সারল্য ও আন্তরিকতায় আমি অভিভূত হলাম।

নজিবর রহমানের প্রতি সে কীভাবে আকৃষ্ট হলো, কীভাবে, কী কী কাজ তাঁর উপর সে করেছে এবং সে সব কাজ করতে গিয়ে সে কী কী বাধার সম্মুখীন হয়েছে সবই সে অবলীলাক্রমে বর্ণনা করে গেল। আমি সাগ্রহে তা শুনলাম। তারপর আমার প্রসঙ্গেও সে বললো। আমিই প্রথম নজিবর রহমান সম্পর্কে বিস্তারিত লেখার প্রয়াস পেয়েছি, আমার গ্রামে গিয়েও আমার সম্পর্কে সে নানাজনকে প্রশ্ন করেছে, আমাকে খোঁজার অনেক চেষ্টা করেও সে ব্যর্থ হয়েছে। অতঃপর কবি মতিউর রহমান মল্লিকের নিকট থেকে আমার ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর পেয়েই আমাকে টেলিফোন করেছে ইত্যাদি।

তার সাথে আলাপের পর নজিবর রহমান সম্পর্কে নতুনভাবে আমার মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হলো। আমি দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হলাম। সেদিন আমার বৈঠকখানায় বসেই আমরা 'নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন স্মৃতি পরিষদ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তার কাজ শুরু হয়ে গেল। বুলবুল ইসলাম আমাকে আহ্বায়ক ও আমি বুলবুল ইসলামকে সদস্য-সচিব হওয়ার প্রস্তাব দিলে উপস্থিত সকলেই তাতে একমত হলো। অনুপস্থিত আরো কয়েকজনকে সদস্য করে তাৎক্ষণিকভাবে স্মৃতি পরিষদ গঠিত হলো। প্রতিষ্ঠানের প্যাড ছাপা, গঠনতন্ত্র তৈরি, পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন ইত্যাদি ব্যাপারে আমরা তৎপর হয়ে গেলাম।

এরপরও বুলবুল ইসলাম বেশ কয়েকবার তার বন্ধু আজাদকে সঙ্গে করে আমার বাসায় এসেছে ততদিনে সে সকলের অলক্ষ্যে চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তার চেহারায় কেমন একটি অবসাদ ও ক্লান্তির বিষণ্ন ছায়া। শুনেছি, তখন নাকি তার কোন রোজগারের ব্যবস্থা ছিলনা, থাকা-খাওয়ারও কোন নির্দিষ্ট সংস্থান ছিলনা। তার নিজের সম্পর্কে সে ছিল খুবই উদাসীন। তার অসুবিধার কথাও সে কাউকে কিছু বলতো না। আমার সঙ্গে তার স্বল্প পরিচয়। তার সম্পর্কে সবকিছু জানার সুযোগ আমার হয়নি দেখা হলে শুধু নজিবর রহমান ও নজরুল ইসলাম পর্যন্তই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকতো। তার সংসারের অবস্থাও তেমন ভাল ছিল না। ভাইদের মধ্যে সে ছিল সবার

www.pathagar.com

বড়। তাই সংসারের প্রতিও তার একটা কর্তব্য ছিল। অথচ তখন সে নিজেই ছিল বেকার। শুনেছি, সে তখন তার বন্ধু শফিকুল ইসলামের সাথে একটি পত্রিকা বের করার চেষ্টা করছিল। আমি সবকিছু জানি না, সেও বলেনি, আমিও সবকিছু জানার চেষ্টা করিনি। আমাদের সম্পর্ক তেমন ঘনিষ্ঠ হবার মত পুরনো ছিল না। বয়সের পার্থক্যও এক্ষেত্রে কিছুটা বাধার সৃষ্টি করেছিল বৈকি।

আর্থিক দুরবস্থা, থাকা-খাওয়ার অনিশ্চয়তা, নানা কাজে সর্বক্ষণ ব্যস্ততা ইত্যাদি কারণে তার শরীর তখন ভেঙ্গে পড়েছিল। বাড়িতেও ছিল সমস্যা। ফলে মাঝে মধ্যে সে পারিবারিক কারণে প্রায়ই কুমিল্লা তার বাড়িতে চলে যেত। যখন ফিরে আসতো তখন তাকে আরো ক্লান্ত-শ্রান্ত-অবসন্ন মনে হতো। এসব কারণে 'নজিবর রহমান স্মৃতি পরিষদ' গঠনের পরিকল্পনা আর খুব বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে নি।

কিন্তু আমি বুলবুল ইসলামের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৯৭ সনে তৎকালীন তথ্য প্রতিমন্ত্রীর অনুমতি নিয়ে বেতার ও টেলিভিশনে নজিবর রহমানের ৭৪তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ১৮ অক্টোবর অনুষ্ঠান করি। বিটিভি-তে অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রখ্যাত কবি, গীতিকার, গবেষক ও শিক্ষাবিদ ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। আমি একটি নিবন্ধ পাঠ করি এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন কবি ও সব্যসাচী লেখক আব্দুল মান্নান সৈয়দ ও কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন।

বেতারে ঐদিন আমি দশ মিনিটের একটি আলোচনা রেখেছিলাম। বেতার ও টেলিভিশনে বাংলা কথা-সাহিত্যে এককালের জনপ্রিয় লেখক নজিবর রহমানের উপর ওটাই ছিল প্রথম অনুষ্ঠান। ঐ বছর আমি দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংগ্রাম, মাসিক অগ্রপথিক, নতুন কলম, বেতার বাংলা ইত্যাদি পত্রিকায় নজিবর রহমানের উপর প্রবন্ধ লিখে এবং নজিবর রহমানের নিজ গ্রাম চর বেলতৈল, শাহজাদপুর ডিগ্রী কলেজ এবং ঢাকাতে 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ' ও 'স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদ'-এ দুটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নজিবর রহমানের ৭৪তম মৃত্যুবার্ষিকী পালনের ব্যবস্থা করে বাংলা সাহিত্যের এ মহান ব্যক্তিত্বকে নতুনভাবে তুলে ধরার প্রয়াস নাই। আমার এ প্রচেষ্টা কম বেশি এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং আমি অকপটে একথা স্বীকার করছি যে, বুলবুল ইসলামের অনুপ্রেরণায়ই আমি এ কাজে অগ্রসর হয়েছিলাম এসব কাজে সে প্রত্যক্ষভাবে আমাকে তেমন কোন সহযোগিতা দিতে পারেনি কিন্তু সে আমাকে এ পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে বুলবুল ইসলাম তার বন্ধু আজাদকে নিয়ে আমার বাসায় এসেছিল। পলিথিনের ব্যাগে কয়েকটি পুরনো, জীর্ণ পুস্তক আব একটি ফাইল। নজিবর রহমানের দুষ্প্রাপ্য কয়েকটি বই এবং নজিবর রহমানের উপব বুলবুল ইসলাম ও অন্যান্যদের লেখা কিছু প্রবন্ধ আমি আবেগতাড়িত হয়েছিলাম। তার বহু দিনের বহু কষ্টের সংগৃহীত ও বহু যত্নে সংরক্ষিত ঐ অমূল্য সম্পদ সে আমার নিকট আমানত হিসাবে রাখতে এসেছিল। ভাবাবেগের সাথে সে বলেছিল : "এগুলো নিয়ে আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে, আপনার মত যোগ্য লোকের হাতে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিত হতে চাই আশা করি, আপনি নিশ্চয়ই এব সদ্ব্যবহার করবেন।" সেদিন কে জানতো, তার ঐ কথাগুলো অমোঘ ভবিষ্যত বাণী হয়ে উঠবে তার বয়স তো এমন কিছু নয়, বিয়ে-শাদীও করেনি, অমন একজন আপনভোলা সনিষ্ঠ সাহিত্য-সংস্কৃতিকর্মী এত তাড়াতাড়ি সকলের অলক্ষ্যে নীরবে ঝরে পড়বে, তা কে ধারণা করেছিল

www.pathagar.com

ঐ দিনের পর বুলবুল ইসলাম আর কখনো আমার বাসায় আসে নি। নজিবর রহমান সম্পর্কিত তার আরো কয়েকটি লেখা আমাকে দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু সে আর আসেনি। হয়ত সে লেখাগুলো সে আর খুঁজে পায়নি তাই আর আসেনি, হয়ত অন্য ব্যস্ততাও ছিল। আমি নিজেই কয়েকবার ফকিরেরপুল তার কর্মস্থলে তার খোঁজ করেছি। যত বার গেছি, শুনেছি, ঢাকায় নেই, বাড়িতে কি একটা সমস্যা, অথবা অসুস্থ ইত্যাদি। কয়েকবার যাবার পর একদিন পেয়ে গেলাম, তার দেয়া ঠিকানায় নয়; সেখান থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে ফকিরেরপুলের একটি প্রেসে গিয়ে তাকে পেলাম। সে তখন প্রুফ দেখায় ব্যস্ত, নজরুলের উপর উল্লিখিত বড় আকারের সংকলনের কাজ। আমাকে খুব আদর-যত্ন করলো। প্রেসের লোকজনদের ডেকে তাদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। চা-নাস্তা খাওয়ার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করলো, কিন্তু আমি ব্যস্ত ছিলাম, তাই তাকে সে সুযোগ দিতে পারি নি।

সেদিনও সে নজিবর রহমানের উপর তার ও অন্যান্যদের লেখা আরো কয়েকটি প্রবন্ধের কপি নিয়ে আমার বাসায় আসার আগ্রহ ব্যক্ত করলো। সেটাই ছিল আমাদের শেষ দেখা। বিদায়ের সময় সে রাস্তা পর্যন্ত এসে বড় করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার স্বভাবসুলভ বিনয়ী ভঙ্গীতে আমাকে সালাম জানালো। উষ্ণ আন্তরিকতায় ভরা সে সালাম করুণ রাগিণীর মত মৃদু গুঞ্জরিত হলো আমার কর্ণ-কুহুরে। সেদিন তার মুখাবয়ব কেমন যেন ফাকাশে ও দৃষ্টির মধ্যে উদাস উদাস ভাব লক্ষ করেছিলাম। আমি তার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। কিন্তু সে বিদায়ই যে শেষ বিদায় ছিল তা কি কেউ ধারণা করেছিলাম! হয়তো সে জানতো, চিরবিদায়ের অভিযাত্রীরা তাদের বিদায়ের ইঙ্গিত অনেক সময় অনুভব করে থাকে। কিন্তু আমি তার সম্পর্কে এটা কীভাবে অনুভব করব? এর কয়েকদিন পরেই তার মৃত্যুর খবর শুনলাম। সত্যি বলতে গেলে, ১৯৯৮ ঈসায়ীর ১৫ ফেব্রুয়ারিতে তার মৃত্যুর দু'দিন পর ১৭ ফেব্রুয়ারি আমি তার মৃত্যুর খবর শুনলাম। তার বন্ধু আজাদই এ শোকাবহ খবরটি আমাকে জানাল টেলিফোনে। শুনে হতবাক হলাম। মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ এমন প্রাণবন্ত মানুষটিকে অকস্মাৎ প্রাণহীন নিশ্চল পদার্থে পরিণত করে দেবে তা কে ধারণা করেছিল?

বুলবুল ইসলাম আজ শুধু স্মৃতি। আমার সাথে তার স্বল্প দিনের পরিচয়, কিন্তু সে পরিচয় ছিল আবেগ ও আন্তরিকতায় অকৃত্রিম, অমলিন। আমার জীবনে ঝড়ের মত আসা তার ক্ষণিক অথচ সজীব অস্তিত্ব গভীর মমতা ও ভালবাসায় চির ভাস্বর হয়ে আছে। তার স্মৃতির প্রতি জানাই আন্তরিক স্নেহার্ঘ ও তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাতের জন্য রাহমানুর রাহিমের নিকট জানাই প্রার্থনা।

কিন্তু আমার নিকট রাখা তার মহামূল্যবান সংগ্রহগুলো' সেগুলো আমাকে এখনো তাড়া করে ফেরে, আমাকে অনুপ্রাণিত করে, তার শেষ কথাগুলো এখনো আমার কানে বাজে। এর মাধ্যমে আমি বুলবুল ইসলামকে স্মরণ করি, অনেক সময় অব্যক্ত বেদনায় বিহ্বল হয়ে পড়ি। এরপর নজিবর রহমানের উপর আমি আরো লিখেছি, বুলবুল ইসলামের অমূল্য সংগ্রহ সে কাজে আমাকে বিপুলভাবে সাহায্য করেছে। নজিবর রহমানের উপর আমার একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা আছে। বইটি যখন ছাপা হবে তখন সেটি বুলবুল ইসলামকেই উৎসর্গ করবো বলে ঠিক করেছি। কেননা, এ বইটি লেখার পেছনে সেই হলো প্রকৃত অনুপ্রেরণাদাতা।

www.pathagar.com

ফররুখ বিষয়ক সেমিনার ও একদিনের চট্টগ্রাম সফর

১৯৯৮ সনের ছয় নভেম্বর রাত সাড়ে দশটায় টেলিফোনে ক্রিং ক্রিং আওয়াজ শুনে ধরতেই অপারেটর বিনয়ের সাথে বললো, 'দৈনিক সংগ্রামের বার্তা সম্পাদক জয়নুল আবেদীন আজাদ আপনার সাথে কথা বলবেন, একটু ধরুন।'

ক্ষণকাল পরেই জয়নুল আবেদীন আজাদের আওয়াজ শোনা গেল: 'মতিউর রহমান ভাই, চট্টগ্রাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আ.জ.ম. ওয়ায়দুল্লাহ্ ভাইকে চেনেন?' বললাম: 'চিনি এবং খুব ভাল করেই চিনি।' 'আচ্ছা, তাহলে তো পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই, ওর সঙ্গে কথা বলুন।' একথা বলেই ওয়ায়দুল্লাহকে টেলিফোন দিলেন।

আমার পরম স্নেহভাজন ওবায়েদ যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং একটি প্রধান ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি তখন থেকেই তার সাথে আমার পরিচয়। সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাঁর প্রচণ্ড উৎসাহ এবং লেখালেখিরও হাত আছে। ওবায়েদ টেলিফোন ধরে সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর সরাসরি বলে ফেললো ঃ 'মতি ভাই, আপনাকে একটু কষ্ট দেব। আগামী কাল বিকেল পাঁচটায় চট্টগ্রাম সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত ফররুখ আহমদের উপর আয়োজিত সেমিনারে আপনাকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকতে হবে। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ স্যারের, কিন্তু উনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আপনাকে স্মরণ করলাম। আগামীকাল সকাল সোয়া দশটায় ফ্লাইট, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র গোলাম রসূল সকালে আপনাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে, আপনার কষ্ট হবে, কিন্তু 'না' করতে পারবেন না।' ওবায়েদ এক নিঃশ্বাসে তাঁর বক্তব্য শেষ করে আমার সম্মতির অপেক্ষা করতে লাগলো।

'না' করা সত্যিই কঠিন ছিল দুটি কারণে। প্রথমতঃ কবি ফররুখ আহমদের উপর সেমিনার, দ্বিতীয়তঃ 'চট্টগ্রাম সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে'র আয়োজনে। প্রায় এক দশক কাল থেকে আমি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কার্যক্রমের সাথে পরিচিত এবং গভীর উৎসাহের সাথে কেন্দ্রের কর্মকাণ্ড দেখে আসছি। কেন্দ্র কর্তৃক ১৯৯১ সন থেকে প্রতি দু'বছর অন্তর 'ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান, এর মুখপত্র হিসাবে 'নোঙর' পত্রিকা প্রকাশ এবং আরো কিছু প্রকাশনা আমি সেই সুদূর দুবাই থেকেও নিয়মিত পেয়ে আসছিলাম। গত বছর ঢাকায় আমি এক সেমিনারে বক্তৃতা দিলাম, সেখানে কেন্দ্রের সভাপতি জনাব আমিরুল ইসলামও বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সে সময় সদা

www.pathagar.com

লাস্যময় আমিরুল ইসলামের সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ও আলাপ আলোচনা হয়। অতএব আমি দ্বিরুক্তি না করে ওবায়েদের প্রস্তাবে সহজেই রাজী হয়ে গেলাম।

টেলিফোন ছেড়ে কথাটা আমার স্ত্রীকে বললাম। তিনিও আপত্তি করলেন না। কিন্তু মনের মধ্যে কিছুটা দ্বিধা ছিল। আমার শ্রদ্ধেয় স্যার খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ-ভাষাতত্ত্ববিদ-সাহিত্যিক ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদের সেখানে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদানের কথা, সেখানে তাঁর পরিবর্তে শ্রোতারা আমার মত একজন অখ্যাত ব্যক্তির উপস্থিতিকে কীভাবে গ্রহণ করবে? এসব নানা কথা চিন্তা করে রাত তিনটা পর্যন্ত চোখে নিদ্রার কোন অস্তিত্বই অনুভব করলাম না।

ভোর পাঁচটায় এ্যালার্মের কড়া আওয়াজে নিদ্রা ভঙ্গ হলো। মসজিদ থেকে তখন ফজরের সুরেলা আওয়াজ ভেসে আসছিল-'আস্‌সালাতু খায়রুম মিনান্নায়ুম'-নিদ্রা থেকে সালাত উত্তম। অজু করে নামায পড়ে নিয়মিত অভ্যাস অনুযায়ী কিছুক্ষণ কালামুল্লা শরীফ অধ্যয়নের পর আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। কিন্তু ঘুমে চোখ বুঁজে আসার আগেই টেলিফোনের শব্দে উঠতে হলো। গোলাম রসূলের কণ্ঠ। এয়ারপোর্টে কখন কীভাবে পৌছাব সেসব বিষয়ে তার সাথে কথা হলো।

আমার স্ত্রী ব্যস্ত হয়ে গেলেন ভ্রমণ-সামগ্রী গুছাতে। এসব ব্যাপারে আমি কখনো মাথা ঘামাই না, স্ত্রী খালেদা বেগমই সব সময় সবকিছু ঠিকঠাক মত গুছিয়ে দেয়। এবারেও কোন ত্রুটি হলো না। সকাল সাড়ে সাতটায় নাস্তা সেরে প্রস্তুত হয়ে ছোট ছেলে আবিদকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আবিদই আমার গাড়ীর চালক, অতএব, তাকে নিতে হলো। একটু উল্টো পথে শাহবাগ পর্যন্ত গিয়ে গোলাম রসূলকে তুলে নিয়ে এয়ারপোর্ট যাত্রা। নয়টা পনের মিনিটে পৌছে গেলাম এয়ারপোর্ট। গোলাম রসূল আরবী বিষয়ে অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে বর্তমানে এম.এ. শেষ বর্ষের ছাত্র, বেশ ভদ্র, অমায়িক ও কর্তব্য-কর্মে সচেতন। আমার বোর্ডিং কার্ড, লাগেজের ব্যবস্থা সম্পন্ন হলে সে এয়ারপোর্ট থেকে চট্টগ্রামে আমার মেজবানদেরকে টেলিফোনে আমার যাত্রার খবরাদি দিয়ে আমার পরবর্তী করণীয় বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে সব বলে সবিনয়ে আমার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে গেল। আমি ব্রীফিং কলের প্রতীক্ষায় লাউঞ্জে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম। যথাসময়ে মাইকে ঘোষণা হলো। আমরা যাত্রীরা বিমানের গাড়ীতে চড়ে প্লেনে যার যার সীটে বসে পড়লাম। ঠিক সময় মত সোয়া দশটায় প্লেন নড়াচড়া শুরু করলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হেমন্তের মেঘমুক্ত মিষ্টি রোদে ডানা মেলে আমাদের ছোট্ট বিমানটি নীল আকাশে ভাসতে লাগলো। পাশের জানালা দিয়ে নীচে ঢাকা শহরের দিকে তাকালাম, রাজপথ, অট্টালিকা, বাস্তুহারাদের সারি সারি দীর্ণ কুটির, গাছপালা-লতা-গুল্ম বেষ্টিত এক কোটি মানুষের আশা-আনন্দ, দুঃখ-বেদনা পরিপূর্ণ রাজধানী শহরের সীমা অতিক্রম করে নদী-নালা, সবুজ ক্ষেত-খামার ও অসংখ্য মানুষের জীর্ণ কুটিরের দৃশ্যপট একে একে দৃষ্টিপথে ভেসে ভেসে এসে দ্রুত মিলিয়ে যেতে লাগলো। মাত্র পোনে এক ঘন্টার মধ্যে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে পতেঙ্গার উষর সৈকত-ভূমি আমাদের চোখে পড়লো। ধীরে ধীরে প্লেন মাটি স্পর্শ করলো। সাগর-সন্নিহিত, মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য পরিবেষ্টিত সুন্দর অতি ক্ষুদ্র একটি বিমান বন্দর। এত ক্ষুদ্র ও সাদামাটা হবে আমার ধারণা ছিল না। লন্ডন, প্যারিস, সুইজারল্যান্ড, মিউনিখ, জেদ্দা, আবুধাবী, দুবাই, সিঙ্গাপুর, বোম্বাই, করাচী, ব্যাঙ্কক, কুয়ালালামপুর প্রভৃতি অনেক বড় বড় বিমান বন্দর

www.pathagar.com

দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, সেগুলোর সাথে তুলনা করার তো প্রশ্নই ওঠে না, পার্শ্ববর্তী রেঙ্গুন, কাটমুন্ডুর দীন-হীন বিমান বন্দরের সাথেও এর কোন তুলনা চলে না। অথচ চট্টগ্রামের লক্ষ লক্ষ লোক মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চাকুরী-বাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রতি বছর শত শত কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠায়। প্রতি বছর তারা ছুটিতে দেশে আসে। চট্টগ্রাম বিমান বন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পরিণত করার দাবী তাদের দীর্ঘ দিনের। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকার তাদের দাবী পূরণের আশ্বাসও দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়িত করার কোন লক্ষণই আমার চোখে পড়লো না।

এয়ারপোর্ট থেকে বেবী ট্যাক্সি নিলাম। ঢাকার তুলনায় চট্টগ্রাম শহর বেশ পরিচ্ছন্ন মনে হলো। লোকজন কম, গাড়ী-ঘোড়া কম। ঢাকার মত অতটা যানজট চোখে পড়লো না। ঢাকা শহরের যত্রতত্র যেমন ঠেলাগাড়ী-ভ্যানরিক্সা, ওখানে তেমনটি চোখে পড়লো না। ঢাকা শহরের দুরবস্থার মূলে যে দুটি জিনিসকে দায়ী করা যায়, তার মধ্যে একটি হলো রিক্সা, অন্যটি অসংখ্য বস্তি ও রাস্তার দু'পাশে গজিয়ে ওঠা বেআইনী ঘর-বাড়ী, দোকান-পাট, হকারদের উৎপাত ইত্যাদি। চট্টগ্রামে ওগুলির অনুপস্থিতি বা স্বল্প উপস্থিতি শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। আর একটি জিনিস বেশ চোখে পড়ার মত। ঢাকা শহরে যত্রতত্র যেমন ময়লা-আবর্জনা চোখে পড়ে, চট্টগ্রামে তেমনটি চোখে পড়েনি। সব মিলিয়ে চট্টগ্রাম শহর আমার নিকট মোটামুটি ভালই লাগলো। অবশ্য প্যারিস, মিউনিখ, সিঙ্গাপুর, দুবাই, আবুধাবী শহরগুলোর সাথে এর কোন তুলনা চলে না, তবে ঢাকার তুলনায় চট্টগ্রাম কিছুটা ভাল এমনকি, লন্ডনের তুলনায়ও একে একেবারে খারাপ বলা যায় না। বলা প্রয়োজন, আমার এ তুলনা আপাতঃ দৃশ্যপট অবলোকনে, সামগ্রিক বিচারে নয়।

১৯৬১ সনে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. শেষ বর্ষের ছাত্র, তখন শিক্ষা সফরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর ও দর্শনীয় এলাকার মধ্যে চট্টগ্রামও সফর করেছিলাম। ছিলাম সরকারী কলেজ হোস্টেলে। সেখান থেকে সকলে দলবদ্ধভাবে বাসে করে চট্টগ্রাম শহর, পতেঙ্গা সমুদ্র-সৈকত, বাটালী হিল, চন্দ্রঘোনা, কাপ্তাই প্রভৃতি স্থান দর্শন করেছিলাম। খরস্রোতা কর্ণফুলির পাশ ঘেঁষে দীর্ঘ আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে চন্দ্রঘোনা, কাপ্তাই যাতায়াত করতে ভালই লেগেছিল। একদিকে সমুদ্র, অন্যদিকে ঘন বনবীথিপূর্ণ অনুচ্চ পাহাড়, সবুজ শষ্য ক্ষেত, মাঝখানে আঁকাবাঁকা সরু পথ। কখনো নদীর পাশ ঘেঁষে, কখনো পাহাড়ের পা ছুঁয়ে আবার কখনো পাহাড় ফুঁড়ে রাস্তা চলে গেছে দূরান্তরে, রাস্তা কখনো উঁচু হয়ে আবার সমান্তরালে গিয়ে পড়েছে, বেশ ভালই লেগেছিল। বাংলাদেশে এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ, সৌন্দর্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশ রয়েছে তা ১৯৬১ সনেই প্রথম প্রত্যক্ষ করি। জামার্নী ও অস্ট্রিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আরো অনেক বেশী বৈচিত্র্যময়। তাছাড়া, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে তারা যেভাবে অপরূপ আকর্ষণীয় করে দেশী-বিদেশী ভ্রমণকারীদের জন্য সাজিয়ে রেখেছে তা বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে কেবলই প্রত্যক্ষ করার মত। ওদের পাশের দেশ যুগস্লাভিয়াও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বৈচিত্র্যে ভরপুর। কিন্তু জামার্নী-অস্ট্রিয়া, বিশেষভাবে জার্মানী থেকে এর পার্থক্য সুস্পষ্ট। কমিউনিস্ট-শাসিত অন্যান্য সকল দেশের মত যুগশ্লাভিয়ার দারিদ্র্য ও

www.pathagar.com

অনগ্রসরতাই এ পার্থক্যের মূল কারণ। যে কমিউনিজম এক সময় মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়ে পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ অধিকার করে নিয়েছিল মাত্র পোনে এক শতাব্দী কালের মধ্যে কমিউনিস্ট-শাসিত পূর্ব ইউরোপের কী দুরবস্থা যুগশ্লাভিয়ার দিকে তাকালে তা কিছুটা আন্দাজ করা যায়।

সে যাইহোক, এয়ারপোর্ট থেকে বেবী ট্যাক্সিতে চট্টগ্রাম বন্দর এলাকা, হালিশহর, আগ্রাবাদ ইত্যাদি অতিক্রম করে প্রায় পনর কিলোমিটার এসে ষোল শহরের কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স ইসলামী ব্যাংকে পৌঁছলাম। ব্যাংকের ম্যানেজার আমিরুল ইসলাম সাহেব দূর থেকে আমাকে দেখে ছুটে এলেন, উষ্ণভাবে করমর্দন করলেন তারপর নিয়ে বসালেন তাঁর রুমে। 'নোঙর' সম্পাদক ডা. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনকে এবং আরো দু'এক জায়গায় টেলিফোন করে আমার পৌঁছার খবর দিয়ে সবাইকে আশ্বস্ত করলেন। 'ঢাকার মেহমান' এসে গেছে শুনে সবাই খানিকটা উৎফুল্ল হলো বলে মনে হলো। চট্টগ্রাম একটি মফঃস্বল শহর, তাই রাজধানী ঢাকার মেহমানের কদর আছে এখানে। নামকরা মেহমান হলে তো কথাই নেই, তাঁর নামে অনুষ্ঠান নাকি জমজমাট হয়ে ওঠে। এর আগে বিভিন্ন সময় চট্টগ্রাম সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের আমন্ত্রিত মেহমান হয়ে গিয়েছিলেন সাহিত্যিক আবু রুশদ, অধ্যাপক শাহেদ আলী, নজরুল-ফররুখ-গবেষক শাহাবুদ্দিন আহমদ, কবি আল মাহমুদ, কবি-সমালোচক আব্দুল মান্নান সৈয়দ প্রমুখ। এবারে তারা দাওয়াত করেছিল ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ স্যারকে।

জনাব শামসুল ইসলাম দুপুর একটায় আমাকে নিয়ে পৌঁছলেন ডা. নাসিরউদ্দিনের বাসায়। নাসিরউদ্দিন সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। জোহরের নামায পড়ে তাঁর ওখানেই দুপুরের খানা খেলাম। নাসিরউদ্দিন সাহেব পেশায় ডাক্তার, সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা তাঁর নেশা। আজকের সেমিনারে 'ফররুখ আমাদের' শীর্ষক প্রবন্ধ তিনিই পাঠ করবেন। 'নোঙর' সম্পাদনা করা ছাড়াও 'বিশ্বসাহিত্যে দ্বাদশ নক্ষত্র' বই প্রণয়ন, একাধিক ছড়া সংকলন করা ছাড়াও চট্টগ্রাম সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তিনি একজন বিশেষ সক্রিয় ও সুপরিচিত ব্যক্তি। তাঁর চার ছেলের মধ্যে জ্যৈষ্ঠ ফররুখ মাহমুদ এবারে এস.এস.সি. পরীক্ষায় মেধা তালিকায় উনিশতম স্থান অধিকার করেছে। তাঁর স্ত্রীও খুব অতিথি-বৎসল একজন সরলমতি মহিলা। সব মিলিয়ে ডা. নাসিরউদ্দিনকে একজন সুখী, সম্পন্ন ও ঋদ্ধ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বলে মনে হলো।

আছরের নামায পড়ে চা খেয়ে ডা. নাসিরউদ্দিনের গাড়ীতে করে ঐতিহাসিক 'জিয়া স্মৃতি যাদুঘরে' উপনীত হলাম। যাদুঘরের পাশে ছোট্ট ছিমছাম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি হল রুম। সেখানেই সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। শিশু পার্ক ও স্টেডিয়াম-সংলগ্ন টিলার উপরে সুন্দর সুদৃশ্য বিল্ডিং। আগে এটা ছিল সরকারী সার্কিট হাউস, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এখানে শহীদ হবার পর এটাকে 'জিয়া স্মৃতি যাদুঘরে' পরিণত করা হয়েছে। যাদুঘরের সামনে প্রশস্ত সবুজ চত্বর। শহীদ জিয়ার স্মৃতি বিজড়িত এ স্থানে এলে স্বাভাবিকভাবেই বিষাদের ঘন কালো ছায়া মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

শুরুতে দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতি স্বল্প এবং নিমন্ত্রিত অতিথি সকলে না এলেও পূর্ব-ঘোষিত সময় ঠিক পাঁচটায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। এটা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। অবশ্য অনুষ্ঠান শুরুর সাথে সাথে নির্ধারিত অতিথিগণ এসে উপস্থিত হন এবং শ্রোতার সংখ্যাও বাড়তে বাড়তে হল প্রায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠান-সূচি ঘোষণা করেন দৈনিক কর্ণফুলির

www.pathagar.com

সম্পাদনা বিভাগের মোহাম্মদ সেলিম। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন ক্বারী রেজাউল করিম। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন অধ্যক্ষ আবুল হাসান। স্বাগত ভাষণ দেন কেন্দ্রের সভাপতি আমিরুল ইসলাম। স্বাগত ভাষণের পর মাগরিবের বিরতি। বিরতির পর পোনে ছয়টায় অনুষ্ঠান পুনরায় শুরু হয়। প্রবন্ধ-উপস্থাপক ডা. নাসিরউদ্দিন তাঁর স্বভাবসূলভ সুন্দর ভঙ্গীতে প্রবন্ধ পাঠ শেষ করলেন। ক্রমান্বয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেন তরুণ কবি তমিজউদ্দিন লোদী, অধ্যাপক এ.কে.এম. মনজুরুল হক ও অধ্যাপক কে.এম. আমির খসরু। আমির খসরুর বাড়ি নোয়াখালী। শরীর শুকনো পাতলা এবং মাথায় চুলের অস্তিত্ব বিরল হলেও খুব রসিক প্রকৃতির লোক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আমার সহপাঠি ছিলেন। অনেক দিন পর তাকে পেয়ে ভালই লাগল। তারপর প্রধান অতিথি হিসাবে আমার ও সভাপতি হিসাবে অধ্যক্ষ আবুল হাসানের বক্তৃতা শেষে ফররুখের কবিতা আবৃত্তির পালা। আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন ফরিদ আহমদ, আজিজুর রহমান ও মনজুর আহমদ। অনুষ্ঠান শেষে ডা. নাসিরউদ্দিনের বাসায় ফিরে এলাম। ফেরার পথে অবশ্য বাসের টিকেট কিনে নিয়ে এলাম।

পরের দিন সকালে ফজরের নামাযের পরপরই নাস্তা খেয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতেই দেখি জনাব আমিরুল ইসলাম সেদিনের চট্টগ্রাম শহরের সবগুলো দৈনিক পত্রিকার কয়েকটি করে কপি নিয়ে হাজির। সাগ্রহে একটা একটা করে পত্রিকাগুলো চোখের সামনে মেলে ধরলাম। গুরুত্ব সহকারে সচিত্র খবর ছেপেছে সবাই। খবরের শিরোনামগুলো এ রকম ঃ

'সেমিনারে অভিমতঃ বাঙালী মুসলমানদের স্বপ্ন-কল্পনা যথার্থভাবে ফুটে উঠেছিল ফররুখের শিল্পচর্যায়'-দৈনিক কর্ণফুলি।

'সেমিনারে আলোচকগণঃ ফররুখ রচনায় বাঙালী মুসলমানদের স্বপ্ন ফুটে উঠেছিল'- দৈনিক ঈশান।

'ফররুখ কোন বিশেষ সম্প্রদায় ও ভাবাদর্শের কবি ননঃ মতিউর'-দৈনিক পূর্বকোণ।

খবরে আমার অর্থাৎ প্রধান অতিথির বক্তব্য এভাবে ছাপা হয় ঃ "ফররুখ আহমদ কোনো বিশেষ সম্প্রদায় ও ভাবাদর্শের কবি নন, তিনি নির্যাতিত মানুষের জন্য স্বপ্নময়, কল্যাণময় পৃথিবী গড়ার জন্য শব্দ সাজিয়েছিলেন মানবিক চেতনায় তাই তাঁর কবিতা এখনো সকল শ্রেণীর পাঠককে মোহিত করে। তাঁর শিল্প চর্চার উন্মেষকালে প্রমথনাথ বিশী তাঁকে 'তরুণ শেক্সপীয়র' বলে অভিহিত করেন। পরিণত পর্যায়ে তিনি বাংলা কবিতায় ফলিয়েছিলেন সোনালী শষ্য, যা আজো স্পর্শ করে যায় সমস্ত শিল্পীত হৃদয়ে শব্দে শব্দে চেতনার ঐশ্বর্যে। "

সকাল সাড়ে সাতটায় ডাক্তার পরিবারের নিকট থেকে বিদায় নিলাম। জনাব আমিরুল ইসলাম আমাকে নিয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে রওয়ানা হলেন। বাস ছাড়ার টাইম আটটা। বিরাট বিলাসবহুল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হিনো বাস। যাত্রী মাত্র পনর জন। সোয়া আটটায় গাড়ী ছাড়লো। খুব আরামেই এলাম। খুব ভাল লাগলো, যাত্রী কম হলেও বেশী যাত্রীর আশায় বাস দেরী করলো না, পথেও কোন যাত্রী তুললো না। মাঝখানে কুমিল্লার কাছাকাছি একটি রেস্টহাউসে কিছুক্ষণের যাত্রা-বিরতি। পথের পাশের সুন্দর আধুনিক রুচিসম্মত রেস্তোঁরায় চা-নাস্তা খেয়ে সফরের ক্লান্তি কিছুটা দূর হলো।

www.pathagar.com

অথচ এর বিপরীত অভিজ্ঞতাও রয়েছে এবং বলতে গেলে, এটাই বাংলাদেশের সাধারণ চিত্র। এই মাত্র ক'দিন আগে, ২৬ অক্টোবর, সস্ত্রীক শাহজাদপুর থেকে ঢাকা এলাম। কোচে আগের দিন টিকিট করা ছিল। সকাল আটটার আধ ঘন্টা আগেই বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে হাজির হলাম। বাস ছাড়ার টাইম ছিল আটটা। 'শাহজাদপুর ট্রাভেল্‌স'-এর বিরাট যাত্রীবাহী কোচে ছাদে বিশালাকার বিশটি কাপড়ের গাঁইট তোলা হলো, এক একটি গাঁইটের ভাড়া আড়াইশো টাকা, ছাদের উপর মাল তুলতে কুলিরা নিল বস্তাপ্রতি ৭৫/১০০ টাকা। এর উপর শাহজাদপুর-উল্লাপাড়া থেকে সীট ছাড়াও ভিতরে ও ছাদে ঠেসে ঠেসে লোক ভর্তি করা হলো। বাস ছাড়তেই দেরী হলো প্রায় এক/দেড় ঘন্টা। তারপর গজগতিতে কড়কড় মড়মড় শব্দ তুলে বিশালকার কোচটি যখন যমুনা সেতু পার হলো, সেতুর পূর্বপাড়ে তখন ওভারলোডিং-এর অভিযোগে বাসকে পাকড়াও করা হলো। ভাবলাম বেশ হয়েছে এবার উপযুক্ত শাস্তি হবে, ভবিষ্যতে হয়ত আর এ রকমটি হবে না। দেশে আইনের শাসন যে এখনো আছে একথা ভেবে মনে একটা আনন্দ-পুলক খেলে গেল। কিন্তু সে আনন্দ স্থায়ী হলো না। আমাদের আনন্দ-পুলক ততক্ষণে গাড়ীর ড্রাইভার-কণ্ডাক্টরের মুখে ট্রান্সফার হয়েছে, মুহূর্তের মধ্যে আমাদের বাস আবার কড়মড় মচ্‌মচ্‌ শব্দে চলতে শুরু করলো। শুনলাম, মাত্র দু'শো টাকা উৎকোচের বিনিময়ে সব দফা রফা হয়েছে। বুঝলাম, মাত্র দু'শো টাকার বিনিময়ে (কখনো তারও অনেক কমে) আইন ও আইনের লোকজন রাস্তায় ও অন্যত্র কেনাবেচা হয়। ফলে যাদের জন্য আইন সেই নিরীহ জনগণের ভোগান্তি ও দুর্দশার শেষ থাকে না।

আমাদেরও ভোগান্তি হলো। বাস টাঙ্গাইল ছাড়িয়ে, মীর্জাপুর পৌঁছার পূর্বেই অতিরিক্ত বোঝার ভারে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ড্রাইভার অতি কষ্টে গাড়ীটা রাস্তার পাশে দাঁড় করালো। ব্রেক বিকল হয়ে গেছে, আরো কী কী সব ছিড়ে ফুঁড়ে গেছে। আমরা কোন রকমে মরতে মরতে বেঁচে গেলাম। গাড়ী ঠিক করতে সোয়া দু'ঘন্টা, তারপর আবার ঢিমেতালে চলা। মীরপুর ব্রীজের নিকট এসে যানযটে আরো সোয়া ঘন্টা কেটে গেল। এভাবে চার ঘন্টার রাস্তা পাড়ি জমালাম সাড়ে নয় ঘন্টায়। বাসায় এসে দেখি স্ত্রী খালেদা বেগম বিষণ্ন বদনে বসে আছেন। আমার ঘরে ফেরায় দীর্ঘ বিলম্ব ঘটায় নিদারুণ পেরেশান। নানা দুর্ভাবনায় ও অজানা আশংকায় তার মন শংকাকুল। অবশেষে দেরীতে হলেও আমাকে দেখে তার মনের কালো মেঘ কেটে সূর্যের হাসি ফোটে। এই অনিশ্চয়তা ও অযাচিত-অপ্রত্যাশিত আশংকার নিস্তরঙ্গ অভিঘাতে আমাদের জন-জীবন কি সর্বদাই এরকম বিপর্যস্ত?

সে তুলনায় চট্টগ্রামের কোচের সার্ভিস বিস্ময়কর মনে হলো। সারা পথ এক গণ্ডা ম্যাগাজিন আর সেদিনের দৈনিক পত্রিকার পাতায় চোখ বুলাতে বুলাতে আর রাস্তার দু'পাশে নতুন ফসলে ভরা হেমন্তের সবুজ মাঠের মনোহর দৃশ্য দেখতে দেখতে দুপুর দেড়টায় মতিঝিল ব্যাঙ্কের সামনে এসে পৌঁছলাম। সীট থেকে উঠে আশে-পাশের যাত্রী ও কোচের হেলপার-সুপারভাইজারকে ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে পড়লাম।

ফররুখ বিষয়ক সেমিনার, সেমিনারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি ও আমার কদিনের আকস্মিক চট্টগ্রাম সফরের সুখকর স্মৃতি দীর্ঘকাল আমার মানসপটে জাগরূক করে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com